ISSN 1813-0372

বর্ষ : ৮ সংখ্যা : ৩১
জুলাই-সেপ্টেম্বর ঃ ২০১২

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৮ সংখ্যা : ৩১

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১২

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮, ০১৭১২-০৬১৬২১
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
web: www.ilrcbd.org

বিপণন বিভাগ : ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : আন-নূর

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স
দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 100 US $ 5

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহ রব্বুল আলামীন সৃষ্টি করেছেন। মানুষের সৃষ্টিকর্তা তিনিই। তিনি মানুষকে বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা দান করেছেন। সেই আশরাফুল মাখলুকাত যাতে এ পৃথিবীতে জীবন যাপন করতে গিয়ে পথ হারিয়ে না ফেলে সেজন্য তিনি যুগে যুগে নবী ও রসূল পাঠিয়ে সত্য-সঠিক পথ দেখিয়েছেন। তাঁরা মানুষের চলার যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তার নামই ইসলাম। মহান আল্লাহ সর্বশেষ নবী ও রসূল মুহাম্মদ স. এর মাধ্যমে সেই ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধানে পরিণত করেছেন। জীবনের অতি ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বৃহৎ অঙ্গন পর্যন্ত এমন কোন বিষয় নেই যে সম্পর্কে ইসলামের দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে না। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলিম উম্মাহ ইসলামের আলোকে তাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনার চেষ্টা করেছে। সেই ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

সমস্যা সঙ্কুল এই আধুনিক বিশ্বে মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতি এক জটিল রূপ ধারণ করেছে। বিভিন্ন ধর্ম ও জাতি-গোষ্ঠীর জীবনাচার ও জীবন যাপন পদ্ধতি দেখে মনে হয় তারা যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছে। অতীতের মত বর্তমানেও ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিশ্ববাসীকে ইসলামের আলোকিত পথ দেখানোর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তারই ধারাবাহিকতায় "ইসলামী আইন ও বিচার" শীর্ষক জার্নালটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের নিকট জীবন সমস্যার বিভিন্ন দিক বিশেষত ইসলামী আইন ও বিচার সম্পর্কে তার সমাধান তুলে ধরার কাজটি করে যাচ্ছে।

জার্নালটির বর্তমান সংখ্যায় আটটি গবেষণা প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে; যার প্রত্যেকটিতে ইসলামের আলোকে জীবনঘনিষ্ঠ আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসার কিছু জবাব উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন, রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক সম্পাদিত 'মদীনা সনদ' যে বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তেমনিভাবে আলোচনা করা হয়েছে, 'ইসলামী আইনে তাযীর : ধরন ও প্রকৃতি', 'ব্যভিচার প্রতিরোধে প্রচলিত ও ইসলামী আইন', 'অংশীদারি ব্যবসায়ে অর্থায়নে ইসলামী দৃষ্টিকোণ', 'ইসলামী মুদ্রার উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস, নারী-পুরুষের বিবাহে ধর্ম প্রসঙ্গ, মালিকানা বিহীন ভূমির ইসলামী বন্টননীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্যে মজুদদারি ইত্যাদি বিষয়।

উল্লেখিত বিষয়গুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্তমান সময়ে খুবই আলোচিত। প্রবন্ধকারগণ কুরআন-হাদীসের আলোকে অত্যন্ত তথ্যভিত্তিক প্রবন্ধসমূহ উপস্থাপন করেছেন। আমরা আশা করি পাঠকবর্গ তাদের অনেক প্রশ্নের জবাব এই প্রবন্ধগুলোতে পেয়ে যাবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

-ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮ সংখ্যা-৩১
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১২

মদীনা সনদ : বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান

ড. আ ক ম আবদুল কাদের*

[সারসংক্ষেপ : ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর মুতাবেক ৮ রবিউল আউয়াল সোমবার শেষ নবী মুহাম্মদ স. আল্লাহর নির্দেশে মক্কা হতে ইয়াসরিবে (পরবর্তীতে মদীনাতুন্নবী সংক্ষেপে 'মদীনা') হিজরত করেন। তাঁর হিজরতের পূর্বে মক্কার অধিকাংশ মুসলিম পরিবার মদীনায় আগমন করেন। মক্কা হতে আগত এই সব মুসলিম 'মুহাজির' নামে পরিচিত। মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রভুক্ত মুসলিমগণ মুহাজিরদেরকে সর্ব প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেন। ফলে তারা 'আনসার' নামে পরিচিত লাভ করেন। মহানবী স. হিজরতের প্রথম বর্ষে মদীনায় বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত যে ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন করেন এ প্রবন্ধে এর প্রামাণিকতা ও তাৎপর্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।]

মদীনার সমকালীন পরিস্থিতি : মহানবী স. মদীনায়[১] আগমনের[২] সমসাময়িককালে এখানে তিন শ্রেণীর জনগোষ্ঠী বাস করতো। এক : মদীনার প্রাচীন পৌত্তলিক সম্প্রদায়, দুই : বাইর থেকে আগত ইহুদী সম্প্রদায় এবং তিন : নব-দীক্ষিত মুসলিম

---

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

১. আবদুল কুদ্দুস হাশিমী, *তাকভীম-ই-তারীখী*, করাচী : মারকাযী ইদারা-ই-তাহকীকাত-ই-ইসলামী, ১৯৬৫, পৃ. ১; মহানবীর স. হিজরাতের দিন-তারিখ নিয়ে একাধিক অভিমত রয়েছে। ইবনে হিশামের মতে, তিনি ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার প্রায় মধ্যাহ্নে কুবায় বনূ আমর ইবনে আউফের এখানে এসে পৌঁছেন (আবদুস সালাম হারুন (সম্পা.) তাহযীব সীরাতু ইবনে হিশাম, কুয়েতঃ দার আল-বহূছ আল-ইসলমিয়াহ, ১৯৮৪, পৃ. ১১৮; মহানবীর স. সমসাময়িক কালের দিনপঞ্জি হিসেব করলে দেখা যায়, ১২ রবিউল আউয়াল ছিল ৬২২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর। এ দিনটি ছিল জুমাবার, সোমবার নয়। সোমবার হল ৮ রবিউল আউয়াল তথা ১৩ সেপ্টেম্বর। Watt এর মতে- মহানবী স. ৬২২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২ রবিউল আউয়াল মদীনার অন্তর্গত কুবা পৌঁছেন। (W. Montgomery Watt, Muhammed at Medina, Oxfood : Oxfood University Press, 1956. P-1.) উক্ত সময়ের দিনপঞ্জিতে দেখা যায়, ৪ সেপ্টেম্বর ছিল শনিবার, তা ছাড়া এটি রবিউল আউয়াল মাসে নয়, সফর মাসে পড়ে। সুতরাং আমরা উক্ত ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহকে নয় বরং ইবনে হিশাম বর্ণিত সোমবারটি মানদণ্ড হিসেবে ধরে উক্ত সময়ের দিনপঞ্জি অনুযায়ী ৬২২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ৮ রবিউল আউয়ালকে মহানবীর স. মদীনা পৌঁছার তারিখ হিসেবে উল্লেখ করেছি।

২. আবদুস সালাম হারুন (সম্পা.), *তাহযীব সীরাতু ইবনে হিশাম*, পৃ. ১০৩-১১০

সম্প্রদায়। মহানবীর স. মদীনায় আগমনের পর ১০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাভুক্ত মদীনায়[৩] মুহাজির ও আনসার মিলে মোট মুসলিম জনসংখ্যা ছিল মাত্র কয়েকশ[৪]। এ সময় নগরীর মোট জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক ১০ হাজার, যার অর্ধেকই ছিল ইহুদী[৫]। এখানে বসবাসকারী আরবগণ ১২টি গোত্রে এবং ইহুদীগণ ১০টি গোত্রে বিভক্ত ছিল।[৬] এই সব গোত্র অধিকাংশ সময় দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত থাকতো। প্রত্যেক গোত্রের ছিল স্বতন্ত্র গোত্রপতি। ফলে মদীনা নগরীতে যেমন কোন সুসংবদ্ধ প্রশাসনিক কাঠামো ছিল না অনুরূপ এখানে কোন কেন্দ্রীয় প্রশাসনও ছিল না। এমতাবস্থায় মদীনায় হিজরত করে মহানবী স. নিম্নোক্ত সমস্যাবলির সম্মুখীন হন :

এক : মক্কা হতে আগত মুহাজিরদের পানাহার ও আবাসন সমস্যা;

দুই : নিজেদের ও স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ;

তিন : মদীনায় বসবাসকারী আরব ও ইহুদীদের মাঝে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা;

চার : মদীনায় প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও এখানকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং

পাঁচ : মুহাজিরগণ মক্কা হতে চলে আসার কারণে তাঁদের অর্থনৈতিক যে ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার ধকল কাটিয়ে ওঠা।[৭]

উপরোক্ত সমস্যাবলি সামনে রেখে মহানবী স. হিজরতের কয়েকমাস পর মদীনার বিভিন্ন গোত্র, মুহাজির, কুরাইশ সম্প্রদায়, মদীনার আনসার সম্প্রদায় এবং মদীনায় বসবাসকারী ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে একটি লিখিত দলীল সম্পাদন করেন। ইতিহাসে এটি 'কিতাব আল-রাসূল বা মদীনা সনদ' নামে পরিচিত।

মদীনা সনদের পূর্ণ বিবরণ : পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। এটি নবী মুহাম্মদ স.-এর পক্ষ হতে জারীকৃত একটি লিখিত ফরমান, কুরাইশ, ইয়াসরিবের মুমিন-মুসলমান এবং যারা তাদের অনুগামী হয়ে তাদের সাথে সংযুক্ত হবে ও

---

৩. M. A. Wahhab. *Lessons from the Constitution of Madinah,* Journal of Islamic Administration, University of Chittagong Department of Public Admmintntion. Vol-2, 1996. P. 60

৪. M. Hamidullah, *The First Written Constitution in the World*, Lahore : sh. Muhammad Ashraf. 1981, p. 9

৫. Ibid. PP. 9-10

৬. Ibid. P. 13

৭. Ibid. PP. 14-15

তাদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করবে (তাদের জন্য) :

১. অন্য লোকজন হতে তারা একটি স্বতন্ত্র উম্মাহ্ বা জাতি।

২. কুরাইশ মুহাজিরগণ তাদের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী তাদের সদস্যদের জন্য রক্তমূল্য পরিশোধ করবে এবং তারা তাদের বন্দীদেরকে মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত দয়া ও ন্যায়বিচার মোতাবেক উপযুক্ত মূল্য দিয়ে মুক্ত করবে।

৩. বনু আওফ তাদের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী তাদের সদস্যদের জন্য রক্তপণ আদায় করবে এবং প্রত্যেক গোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত দয়া ও ন্যায়বিচার মোতাবেক উপযুক্ত মূল্য দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করবে।

৪. বনু সায়িদাহ তাদের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী তাদের সদস্যদের জন্য পূর্ব প্রদত্ত হারে রক্তপণ আদায় করবে এবং প্রত্যেক গোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত দয়া ও ন্যায়বিচার মোতাবেক উপযুক্ত মূল্য দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করবে।

৫. বনু হারিছ তাদের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী তাদের সদস্যদের জন্য পূর্ব প্রদত্ত হারে রক্তপণ আদায় করবে এবং প্রত্যেক গোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত দয়া ও ন্যায়বিচার মোতাবেক উপযুক্ত মূল্য দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করবে।

৬. বনু জুশম তাদের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী তাদের সদস্যদের জন্য তাদের পূর্ব প্রদত্ত হারে রক্তের মূল্য দেবে এবং প্রত্যেক গোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত দয়া ও ন্যায়বিচার মোতাবেক উপযুক্ত মূল্য দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করবে।

৭. বনু নাজ্জার তাদের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী তাদের সদস্যদের জন্য তাদের পূর্ব প্রদত্ত হারে রক্তের মূল্য দেবে এবং প্রত্যেক গোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত দয়া ও ন্যায়বিচার মোতাবেক উপযুক্ত মূল্য দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করবে।

৮. বনু আমর ইবনে আউফ তাদের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী তাদের সদস্যদের জন্য তাদের পূর্ব প্রদত্ত হারে রক্তের মূল্য দেবে এবং প্রত্যেক গোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত দয়া ও ন্যায়বিচার মোতাবেক উপযুক্ত মূল্য দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করবে।

৯. বনু নাবীত তাদের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী তাদের সদস্যদের জন্য পূর্ব প্রদত্ত হারে রক্তের মূল্য পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক গোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত দয়া ও ন্যায়বিচার মোতাবেক উপযুক্ত মূল্য দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করবে।

১০. বনু আউস তাদের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী তাদের সদস্যদের জন্য পূর্ব প্রদত্ত হারে রক্তের মূল্য পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক গোত্র মুমিনদের মধ্যে

প্রচলিত দয়া ও ন্যায়বিচার মোতাবেক উপযুক্ত মূল্য দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করবে।

১১. মুমিনরা তাদের নিজেদের ঋণগ্রস্ত কাউকে ছেড়ে দিবে না বরং মুক্তিপণ ও রক্তমূল্য আদায়ের জন্য সাহায্য করবে।

১২. কোন মুমিন অপর মুমিনের মাওলা বা আশ্রিতের সাথে চুক্তি করবে না।

১৩. ধর্মভীরু মুমিনগণ তাদের নিজেদের কেউ বিদ্রোহী হলে বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে থাকবে। তারা মুমিনদের মধ্যে অত্যাচার, পাপাচার, শত্রুতা ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধাচরণ করবে। প্রত্যেকের হাত তার বিরুদ্ধে থাকবে, যদিও অন্যায়কারী তাদের কারো সন্তান হয়।

১৪. কোন মুমিন কাফিরের বদলায় কোন মুমিনকে হত্যা করবে না এবং মুমিনের বিরুদ্ধে কাফিরকে সাহায্য করবে না।

১৫. আল্লাহর যিম্মা বা নিরাপত্তা একই। তা হলোঃ সর্বাপেক্ষা দুর্বলকে (অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে) আশ্রয় দেয়া। মুমিনরা অন্যদের মুকাবিলায় একে অপরের বন্ধু।

১৬. ইহুদীদের মধ্য হতে যারা আমাদের অনুসরণ করবে তাদের সাহায্য করা হবে এবং তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হবে। তাদের উপর অত্যাচার করা হবে না এবং তাদের শত্রুদের সাহায্য করা হবে না।

১৭. মুমিনদের চুক্তি একটাই। কোন মুমিন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য মুমিন ছাড়া অন্য কারো সাথে চুক্তি করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ চুক্তি সমতা ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে না হয়।

১৮. যে সব যোদ্ধা আমাদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করবে তারা একে অন্যের পিছনে থাকবে।

১৯. মুমিনরা একে অন্যের সাথে যুক্ত হয়ে আল্লাহর রাস্তায় দেয়া রক্তের শোধ নেবে।

২০. নিঃসন্দেহে ধর্মভীরু মুমিনগণ সর্বোৎকৃষ্ট এবং সত্য ও সঠিক পথপ্রাপ্ত।

২১. কোন মুশরিক (পৌত্তলিক) কোন কুরাইশের জান-মালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারবে না এবং কোন মুমিনের বিরুদ্ধে গিয়ে কুরাইশদের পক্ষাবলম্বন করতে পারবে না।

২২. যদি কেউ অন্যায়ভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে এবং তা প্রমাণিত হয়, তবে তার প্রতিদানে সেও নিহত হবে, যদি না নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী

(দেয় অর্থের বিনিময়ে) সন্তুষ্ট হয়। মুমিনরা সকলে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে থাকবে। হত্যাকারীর বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া মুমিনদের জন্য অন্য কিছু বৈধ নয়।

২৩. মুমিনগণ যারা এই সনদের সাথে একমত হয়েছে এবং যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের জন্য কোন অন্যায়কারীকে সাহায্য কিংবা আশ্রয় প্রদান বৈধ হবে না। যদি কেউ অন্যায়কারীকে সাহায্য করে বা আশ্রয় দেয় তাহলে কিয়ামতের দিন তার উপর আল্লাহর লানত ও গযব পড়বে। তার কাছ থেকে কোন প্রকার অনুতাপ কিংবা বদলা গ্রহণ করা হবে না।

২৪. যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় তবে আল্লাহ এবং মুহাম্মদ স.-এর মতামতের প্রতি তা সমর্পণ করবে।

২৫. যত দিন যুদ্ধ চলবে ইহুদীরা মুমিনদের সাথে যুদ্ধের ব্যয় বহন করবে।

২৬. বনু আউফের ইহুদীরা মুমিনদের সাথে একই উম্মাহ। ইহুদীদের জন্য তাদের ধর্ম এবং মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্ম। তারা মাওয়ালী হোক বা নিজেরা হোক। যদি কেউ অন্যায় কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে সে তার নিজের ও পরিবারের জন্য ক্ষতি করে।

২৭. বনু নাজ্জারের ইহুদীরা সেই অধিকার ভোগ করবে যা বনু আউফের ইহুদীরা ভোগ করবে।

২৮. বনু হারিছের ইহুদীরা সেই অধিকার ভোগ করবে যা বনু আউফের ইহুদীরা ভোগ করবে।

২৯. বনু সায়িদার ইহুদীরা সেই অধিকার ভোগ কবে যা বনু আউফের ইহুদীরা ভোগ করবে।

৩০. বনু জুশমের ইহুদীরা সেই অধিকার ভোগ কবে যা বনু আউফের ইয়াহুদীরা ভোগ করবে।

৩১. বনু আউসের ইহুদীরা সেই অধিকার ভোগ কবে যা বনু আউফের ইহুদীরা ভোগ করবে।

৩২. বনু সালাবার ইহুদীরা সেই অধিকার ভোগ করবে যা বনু আউফের ইহুদীরা ভোগ করবে। কিন্তু যদি কেউ অন্যায় কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে সে তার নিজের এবং পরিবারের জন্য ক্ষতি করে।

৩৩. সালাবা গোত্রের শাখা জাফনার ইহুদীরা সেই অধিকার ভোগ করবে যা বনু সালাবা ভোগ করবে।

৩৪. বুন শুতাইবার ইহুদীরা সেই অধিকার ভোগ করবে যা বনু আউফের ইহুদীরা ভোগ করবে। বিশ্বাসঘাতকতার পরিবর্তে সততা কাম্য।

৩৫. সালাবার মাওয়ালী বা আশ্রিতরা সালাবা গোত্রের মতই অধিকার ভোগ করবে।

৩৬. ইহুদী গোত্রের শাখা-প্রশাখাগুলো ইহুদীদের মতই অধিকার ভোগ করবে।

৩৭. তাদের কেউ মুহাম্মদ স.-এর অনুমতি ছাড়া যুদ্ধের জন্য বের হবে না।

৩৮. কারো ক্ষতির প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কাউকে বাধা দেয়া যাবে না। কেউ যদি হাঙ্গামা সৃষ্টি করে তা হলে সে এবং তার পরিবার দায়ী হবে। যদি কেউ অত্যাচারিত হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। আল্লাহ এই সনদের সর্বাধিক হিফাযতকারী।

৩৯. ইহুদীরা নিজেদের খরচ বহন করবে এবং মুসলমানরা নিজেদের খরচ বহন করবে।

৪০. এই সনদে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করবে তাদের বিরুদ্ধে ইহুদী এবং মুসলমানরা একে অপরকে সাহায্য করবে। তাদের একের সাথে অন্যের সম্পর্ক হবে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও কল্যাণকামিতা মূলক এবং বিশ্বাসঘাতকতার পরিবর্তে সম্মানজনক ব্যবহার।

৪১. বন্ধুর দুষ্কর্মের জন্য কেউ দায়ী হবে না এবং অত্যাচারিতদের সাহায্য প্রদান করা হবে।

৪২. যতদিন যুদ্ধ চলবে ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের খরচ বহন করবে।

৪৩. এই সনদপত্রে অঙ্গীকারাবদ্ধ লোকদের জন্য ইয়াসরিবের উপত্যকা পবিত্র।

৪৪. আশ্রিতরা যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রকার অন্যায় কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আশ্রয়দানকারীদের মত অধিকার ভোগ করবে।

৪৫. কোন স্ত্রীলোককে তার পরিবারের অনুমতি ছাড়া আশ্রয় দেয়া যাবে না।

৪৬. যদি এই সনদে অঙ্গীকারাবদ্ধ লোকদের মধ্যে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাতে শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে তা আল্লাহ এবং তাঁর রসূল মুহাম্মদ স.-এর প্রতি (মীমাংসার জন্য) সমর্পণ করা হবে। এই সনদে যা কিছু আছে তার জন্য আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ যত্নবান।

৪৭. কুরাইশদেরকে এবং তাদের সাহায্যকারীদের কোন ক্রমেই আশ্রয় দেয়া যাবে না।

৪৮. ইয়াসরিবের উপর অতর্কিত হামলাকারীদের বিরুদ্ধে তারা (ইহুদী ও

মুসলমানগণ) একে অপরকে সহযোগিতা করবে।

৪৯. যদি তাদেরকে চুক্তি করার এবং তা মেনে নেয়ার আহবান জানানো হয়, তবে তারা চুক্তি করবে এবং তা মেনে নিবে। যদি মুমিনদেরকেও অনুরূপ বিষয়ে আহবান জানানো হয় তাহলে তাদের দায়িত্ব হবে সেটা মেনে নেয়া। যদি কেউ ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে তবে তা আলাদা ব্যাপার।

৫০. যে যে দিকে থাকবে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তার ভাগে সে দিক পড়বে।

৫১. বনু আউসের ইহুদীরা এবং তাদের আশ্রিতরা এই সনদের শরীক দলের মত অধিকার ভোগ করবে, যদি তারা সনদের শরীকদলের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করে। বিশ্বস্ততা বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। যে তা আয়ত্ত করে সে নিজের জন্য করে। এই সনদে যা কিছু আছে আল্লাহ তার সত্যতার সাক্ষী এবং রক্ষাকারী।

৫২. অত্যাচারী কিংবা পাপী ছাড়া এই সনদ বাস্তবায়নে কেউ বাধা প্রদান করবে না। যে কেউ যুদ্ধের জন্য বের হবে সে নিরাপদে থাকবে। আর যে মদীনায় বসে থাকবে সে নিরাপদে ও শান্তিতে থাকবে। যারা অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতা করবে তারা এর ব্যতিক্রম।

৫৩. নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎ ও ধর্মভীরুদের রক্ষাকারী এবং মুহাম্মদ স. আল্লাহর রসূল।[৮]

মদীনা সনদের যথার্থতা ও বিশুদ্ধতা নিরূপণ : আধুনিক গবেষকদের মধ্যে ইউসুফ আল-আইশ মনে করেন, মদীনা সনদটি যথার্থ ও বিশুদ্ধ নয়। তার মতে ধর্মীয় দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিশুদ্ধ হাদীসের গ্রন্থসমূহে এটি বর্ণিত হয়নি। উপরন্তু মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (৮৫ হি.-১৫১হি./৭০খ্রি.-৭৬৮খ্রি.) কোন সূত্র (সনদ) উল্লেখ না করে মদীনা সনদটি বর্ণনা করেন এবং ইবনে সায়্যিদ আন-নাস তাঁর কাছ থেকেই এটি বর্ণনা করেন। আল-আইশ বলেন, কাছীর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর আল-মুজানী তাঁর পিতা আবদুল্লাহ এবং পিতামহ আমর সূত্রে মদীনা সনদ রিওয়ায়াত করেন। উক্ত বর্ণনাধারা সম্পর্কে ইবনে হিব্বান আল-বুস্তী বলেন, কাছীর তাঁর পিতা ও পিতামহ সূত্রে একটি জাল সনদ রিওয়ায়াত করেছেন যা কোন কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করা কিংবা রিওয়ায়াত করা সঙ্গত নয়।[৯] আল-আইশের মতে, ইবনে ইসহাক মদীনা সনদ বর্ণনার ক্ষেত্রে কাছীর ইবনে আবদুল্লাহর উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারেই এর সূত্রটি এড়িয়ে গেছেন।[১০]

---

[৮]. আবদুস সালাম হারুন (সম্পা.), *তাহযীব সীরাতু ইবনে হিশাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪-১২৬

[৯]. ইবনে হাজার আল-আসকালানী, *তাহযীব আল-তাহযীব*, লাহোর : নশর আল-সুন্নাহ, খ. ৮, পৃ. ৪২২

[১০]. Wellhausen, *আল-দাওলাহ আল-আরাবিয়্যাহ ওয়া সুকূতুহা*, ইউসুফ আল-আইশ অনূদিত আরবী সংস্করণ, দামিস্ক : ১৯৫৬, পৃ. ২০, পাদটীকা-৯

ইবনে ইসহাক তাঁর সীরাত গ্রন্থে কোন সূত্র উল্লেখ না করে মদীনা সনদ বর্ণনা করার কারণে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলীলকে জঈফ প্রতিপন্ন করেছেন সত্য; কিন্তু একে জাল কিংবা বিশুদ্ধ নয় বলে বিবেচনা করাও যথার্থ নয়। কারণ এটি কাছীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুজানীর সূত্র ছাড়াও আবু উবায়দ আল-কাসিম ইবনে সাল্লাম ইমাম ইবনে শিহাব আল-যুহরী (১২৪হি./৭৪২খ্রি.) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইবনে ইসহাক ছিলেন ইমাম আল-যুহরীর বিশিষ্ট শিষ্যদের অন্যতম।

মদীনা সনদের বর্ণনাধারা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে শিহাব আল-যুহরী পর্যন্ত প্রসারিত এবং ইমাম আল-যুহরী একজন তাবিঈ হওয়ার কারণে এ বর্ণনাটি একটি মুরসাল বর্ণনা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। আর ইমাম আবু হানীফা (১৫০হি./৭৬৭খ্রি.), ইমাম মালিক (১৭৯হি./৭৯৫ খ্রি.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (২৪১হি./৮৫৫ খ্রি.)-এর মতে, মুরসাল হাদীস বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য এবং দলীল হিসেবে উপস্থাপনের উপযোগী।[১১] ইমাম আল-যুহরী ছিলেন প্রাথমিক পর্যায়ে মহানবীর স. সীরাত রচয়িতাদের অগ্রণী। এ ছাড়াও অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থে মদীনা সনদটি লিখিত চুক্তি হিসেবে বর্ণিত হয়েছে[১২]। সনদের রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহের দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যায় যে, এটি একটি বিশুদ্ধ সনদ। ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসেন নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করে সনদটির মৌলিকত্ব ও অকৃত্রিমতা প্রমাণ করেছেন-

ক. এ সনদে মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়কে একই 'উম্মাহ'য় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি বিকৃত কিংবা জাল করা হলে উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে অমুসলিমদেরকে একই উম্মাহয় গণ্য করা হতো না;

খ. এটি বিকৃত করা হলে কুরাইশদের বিরুদ্ধে যে সব ধারা বিদ্যমান বিকৃতকারীগণ সেই সব ধারা বাদ দিয়ে দিতো;

গ. এটি বিকৃত করা হলে মহানবীকে স. আরো অধিক ক্ষমতা প্রদান করে এতে নতুন ধারা সংযোজন করা হতো;

ঘ. এর অনুচ্ছেদসমূহ সহজ-সরল ও জটিলতামুক্ত এবং রচনারীতি (style) অতি প্রাচীন (archaic);

---

[১১]. উবাদুল্লাহ আল-আসআদী, উলূম আল-হাদীস, লক্ষ্ণৌ : মাকতাবা-ই-হিরা, ১৪০৬ হি., পৃ. ১৩৫-১৩৬

[১২]. আবুল হাসান আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া আল-বালাযুরী, *আনসাব আল-আশরাফ*, মিসর : দার আল-মাআরিফ, ১৯৫৯, খ. ১, পৃ. ২৮৬-৩০৪; আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আল-তাবারী, *তারীখ আল-উমাম ওয়াল-মলূক*, মিসর : দার আল ইস্তিকামাহ, খ. ২, পৃ. ৪৭৯; আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে উমর আল-কাছীর, *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, আল-কাহেরা : মাকতাবাহ আল-সাআদাহ, ১৩৫১হি:, খ. ৩, পৃ. ২২৪-২২৬

৬. এই সনদে 'মুসলিম' শব্দের পরিবর্তে 'মুমিন' (believers) শব্দের ব্যবহার প্রমাণ করে যে, এটি মহানবীর স. মদীনা যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রণীত। সুতরাং দেখা যায় যে, মদীনা সনদ একটি মৌলিক, অকৃত্রিম, বিশুদ্ধ ও যথার্থ সনদ।[১৩]

মদীনা সনদের মূল পাঠ অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, এতে ভাষাগত অনেক পুনরুক্তি রয়েছে এবং এতে মহানবীর স. সময়ে প্রচলিত শব্দ ও প্রকাশভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে। এতে কোন গোত্র বা গোষ্ঠীর প্রশংসা কিংবা নিন্দা স্থান পায়নি।[১৪] ইবনে ইসহাক যখন মদীনা সনদ রিওয়ায়াত করেন তখন অনেক বিশিষ্ট তাবিঈ জীবিত ছিলেন। কিন্তু সমকালীন যুগে কেউ এর যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি। সুতরাং এটি একটি বিশুদ্ধ ও যথার্থ সনদ, কোন জাল সনদ নয়।

সনদ প্রণয়নের সময়কাল : ঐতিহাসিক আবদুল মালিক ইবনে হিশাম (২১৮ হি./ ৮৩৩ খ্রি.) মহানবীর স. সীরাত রচনার ক্ষেত্রে ইবনে ইসহাক প্রণীত সীরাত গ্রন্থকে প্রধান উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেন। ইবনে ইসহাক মহানবীর স. মদীনায় হিজরতের পর প্রাথমিক পর্যায়ে মদীনায় তাঁর কর্মতৎপরতা বিষয়ে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেন। সেগুলো হলো :

১. মহানবী স. ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার প্রায় মধ্যাহ্নে কুবায় বনু আমর ইবনে আওফের এখানে এসে পৌঁছেন।[১৫]
২. তিনি সোমবার হতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই ৪ দিন সেখানে অবস্থান করেন।[১৬]
৩. এই সময় তিনি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন।[১৭]
৪. জুমার দিন জুমার সময় তিনি বনু সালিম ইবনে আওফের এখানে এসে পৌঁছেন এবং রানুনা উপত্যকায় জুমার নামায আদায় করেন। মদীনায় এটি তার প্রথম জুমার নামায।[১৮]
৫. এ দিন তাঁর উট আবু আইয়ুব আনসারীর এখানে এসে বসে পড়ে এবং তিনি এখানে অবতরণ করেন। অত:পর সাহল ও সুহাইল নামক বনু নাজ্জার গোত্রের দু'জন এতিম বালক হতে জমি ক্রয় করে মসজিদ আল-নববী এবং তদসংলগ্ন তাঁর জন্য আবাস নির্মাণ করেন।[১৯]

---

[১৩]. W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina,* p. 225

[১৪]. ড. সালিহ আহমদ আল-আলী, *তানযীমাত আল-রাসূল আল-ইদারিয়্যাহ ফী আল মাদীনাহ,* বাগদাদ : আল-মাজমা আল-ইলমী আল-ইরাকী, ১৯৬৭, সংখ্যা-১৭, পৃ. ৪-৫

[১৫]. আবদুস সালাম হারুন (সম্পা.), *তাহযীব সীরাতু ইবনে হিশাম,* পৃ. ১১৮, ১৩০

[১৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

[১৭]. প্রাগুক্ত

[১৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯-১২০

[১৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-১২১

৬. পরবর্তী বছরের সফর মাস পর্যন্ত তাঁর মদীনা অবস্থানকালীন সময়ের মধ্যেই মসজিদ আল-নববী ও তার আবাস নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়।[২০]

৭. এ সময়ের মধ্যে অধিকাংশ আনসার পরিবার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।[২১]

৮. উপরোক্ত বর্ণনার সাথে সংযুক্ত করে ইবনে হিশাম মহানবী স. কর্তৃক মদীনায় প্রদত্ত দু'টি খুৎবার উল্লেখ করেন।[২২] এর পরই তিনি কিতাব আল-রাসূল তথা মদীনা সনদটি উদ্ধৃত করেন।[২৩]

৯. এর সাথে সন্নিহিত করে ইবনে হিশাম মহানবী স. কর্তৃক মুহাজির ও আনসারের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়টি উল্লেখ করেন।[২৪]

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের ধারাবাহিকতা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উল্লেখিত বিষয়গুলো মহানবীর স. মদীনায় হিজরতের প্রথম বর্ষেই সম্পাদিত হয়। সুতরাং বলা যায়, মহানবী স. মদীনায় পৌঁছার পর এখানকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় রূপরেখা প্রণয়ন করে মদীনার অধিবাসীদের মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আইনগত কাঠামো গঠন করার লক্ষ্যেই তিনি হিজরতের প্রথম বর্ষে 'কিতাব আল-রাসূল' তথা মদীনার সনদ জারী করেন। আল-বালাযুরী বলেন, মহানবী স. মদীনায় আগমনের পর এখানকার ইহুদীদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এতে তিনি শর্তারোপ করেন যে, তারা তাঁর শত্রুদেরকে সাহায্য করতে পারবে না। যুদ্ধে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করবে এবং তিনি আহল আল-যিম্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না। আল-কুরআনের জিহাদের অনুমতি প্রদান সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর[২৫] মহানবী স. 'সীফ আল-বাহর' নামক স্থানে হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম ৩০ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাহিনী প্রেরণ করেন।[২৬] আল-বালাযুরী আরো উল্লেখ করেন, মহানবী স. মদীনায় আগমনের পর এখানকার সকল ইহুদী গোত্রের সাথে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন যা একটি দলীলে লিপিবদ্ধ করা হয়। বদর যুদ্ধ শেষে মহানবী স. মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর ইহুদী বনু কায়নুকা চুক্তিভঙ্গ করে। ফলে মহানবী স. তাদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[২৭] উক্ত বর্ণনা দ্বারাও

---

[২০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

[২১]. প্রাগুক্ত

[২২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩

[২৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-১২৬

[২৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭

[২৫]. আল-কুরআন, ২২ : ৩৯ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

[২৬]. আবুল হাসান আল-বালাযুরী, *আনসাব আল-আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮৬

[২৭]. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০৮

প্রতীয়মান হয় যে, মহানবীর স. মদীনায় হিজরতের প্রথম বর্ষে মদীনা সনদ জারী করা হয়। আকরাম জিয়া আল-উমরীর মতে, মদীনা সনদ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সম্পাদন করা হয়। পরবর্তীতে ঐতিহাসিকগণ এই সব চুক্তিকে একটি দলীলে সন্নিবেশিত করেন।[২৮] প্রমাণ হিসেবে তিনি আমর ইবনে শুয়াইব হতে বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতটি উপস্থাপন করেন : "মহানবী স. আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে একটি লিখিত দলীল প্রণয়ন করেন। এতে বলা হয়, তাদেরকে রক্তমূল্য পরিশোধ, যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ প্রদান এবং মুসলমানদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে হবে"।[২৯] এ বর্ণনায় ইহুদীদের কোন প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়নি।

মদীনা সনদের পরিধি : মদীনা সনদের প্রস্তাবনা বা ভূমিকায় বলা হয়েছে, এ সনদ ইয়াসরিবে অবস্থানকারী তিন প্রধান জনগোষ্ঠীর প্রতি জারী করা হয়েছে। এরা হল : ক. মক্কার কুরাইশ গোত্রভুক্ত (মুহাজির সম্প্রদায়) ও ইয়াসরিবের মুমিন ও মুসলমান (আনসার সম্প্রদায়), খ. যারা তাদের অনুসরণ করে তাদের সাথে সংযুক্ত হবে ও গ. যারা তাদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করবে।[৩০]

এখানে ক. শ্রেণীর জনগোষ্ঠী বলতে মক্কা হতে আগত মুহাজির এবং মদীনা আনসার সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে যদিও সুস্পষ্ট রূপে 'মুহাজির' ও 'আনসার' শব্দ দু'টি উল্লেখ করা হয়নি। খ. শ্রেণীর জনগোষ্ঠী দ্বারা মদীনা সনদ জারী করার পরেও যে সব কুরাইশ কিংবা মদীনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করবে এবং তাদের অনুসরণ করবে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে সনদের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সনদের ব্যাপ্তি ও পরিধিকে ব্যাপকতর করা হয়েছে। তৃতীয় প্রকারের জনগোষ্ঠী দ্বারা যুদ্ধ-বিগ্রহে মিত্র পক্ষের কথা বলা হয়েছে। এই সনদে অমুসলিমদেরকেও উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত করে উম্মাহর ধারণাকে অনেক প্রসারিত করা হয়েছে।[৩১] এতে মদীনার তিন প্রধান ইহুদীগোত্র যথাক্রমে বনু নযীর, বনু কুরায়যা ও বনু কায়নুকা সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই, যদিও এতে ৯ টি ইহুদী গোত্র কিংবা তাদের শাখা গোত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু এর দ্বারা একথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই যে, এই সনদে মদীনার সকল গোত্রের নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বরং দেখা যায়, এতে যে সব গোত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার সাথে তাদের মাওয়ালী (আশ্রিত) এবং হালীফকেও (মিত্র) অন্তর্ভুক্ত করা

---

[২৮]. ড. আকরাম জিয়া আল-উমরী, *রাসূলের যুগে মদীনা সমাজ*, মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম অনূদিত, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১৯৯৮, খ. ১, পৃ. ১৩৪

[২৯]. ইবনে কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, তা. বি., খ. ৩, পৃ. ২২৪

[৩০]. আবদুস সালাম হারুন (সম্পা.), *তাহযীব সীরাতু ইবন হিশাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

[৩১]. প্রাগুক্ত

হয়েছে। ইহুদী বনু নযীর ও বনু কায়নুকা ছিল মদীনার আওস গোত্রের হালীফ, অপর দিকে বুন কায়নুকা ছিল খাযরাজ গোত্রের হালীফ।[৩২] সুতরাং প্রাসঙ্গিকভাবে এদের নাম এসে গেছে। আর এই সনদ প্রয়োগ কিংবা কার্যকর করার বিষয়ে কোন ভৌগোলিক সীমারেখা নির্দেশ করা হয়নি। সুতরাং বলা যায়, এই সনদের প্রয়োগ ক্ষমতা শুধু মদীনায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী নয়, ইসলামের ভৌগোলিক প্রসারের পরেও এর প্রয়োগ ও কার্যকর ক্ষমতা অক্ষুণ্ন থাকার ব্যবস্থা রাখা হয়।[৩৩]

মদীনা সনদের বিশ্লেষণ : মদীনা সনদ ইসলামের প্রাথমিক যুগের এক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দলীল। এতে 'তাসমিয়াহ' (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম) ও প্রস্তাবনা বা ভূমিকা ছাড়া মোট ৫৩ টি ধারা বিদ্যমান। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, এটি একটি 'কিতাব' বা লিখিত দলীল। মুহাম্মদ স.-এর পক্ষ হতে এটি জারী করা হয়েছে।[৩৪] ৫২ তম ধারায়ও একে পুনরায় 'কিতাব' বলা হয়েছে। এ ছাড়াও এর ২৩ তম ধারা, ৪০ তম ধারা, ৪৩ তম ধারা, ৪৬ তম ধারা এবং ৫১ তম ধারায় মোট ৭ বার একে 'সহীফা' তথা পুস্তিকা বলা হয়েছে। সনদের ১ম ধারায় এই সনদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জনগোষ্ঠীকে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর চাইতে স্বতন্ত্র একটি 'উম্মাহ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।[৩৫] মদীনার ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে একই উম্মাহভুক্ত কিনা সনদের এই ধারা হতে এটি পরিষ্কার নয়। কিন্তু এর ২৬ তম ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, "বনু আওফের ইহুদীরা মুমিনদের সাথে একই উম্মাহ"।[৩৬] এখানে উম্মাহ ধর্মীয় বিষয়ে নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়। আরবদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যকাণ্ড পরিচালিত হতো গোত্র ভিত্তিক। সনদের এই ধারার মাধ্যমে মহানবী স. আরবদের গোত্রভিত্তিক কর্মকাণ্ডে আমূল সংস্কার সাধন পূর্বক একে জাতিগত পর্যায়ে নিয়ে আসেন। সুতরাং মহানবী স. সনদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায় নয় বরং তিনি মদীনার সকল জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে এখানে একটি বৃহত্তম জাতি গঠন করেন।[৩৭]
ইয়াসরিবে আগত মুহাজিরগণ সংখ্যায় অল্প হওয়ার কারণে মদীনা সনদের ২য় ধারায় এদেরকে 'মুহাজির'দল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মদীনার আনসারগণ

---

[৩২]. আবদুল করিম, *কিতাব আল-রসূল (ইসলামের ইতিহাসের প্রথম সংবিধান)*, ইসলামী ঐতিহ্য চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৮৫, পৃ. ১৪

[৩৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩

[৩৪]. আবদুস সালাম হারুন (সম্পা.), *তাহযীব সীরাতু ইবন হিশাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

[৩৫]. প্রাগুক্ত

[৩৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

[৩৭]. Watt. *Muhammad at Medina*, P. 139-141

সংখ্যায় অধিক হওয়ার কারণে সনদের ৩য় ধারা হতে ১০ম ধারা পর্যন্ত তাদেরকে গোত্রভিত্তিক উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে গোত্রভিত্তিক উল্লেখ করার মাধ্যমে গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থার স্বীকৃতি দেয়া হয়নি বরং এর মাধ্যমে তাদের সামাজিক নিরাপত্তার দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।[৩৮]

সনদের ১১শ ধারা হতে ২৩ তম ধারা পর্যন্ত মুমিনদের অধিকার, কর্তব্য, পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের সীমারেখা, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত আচরণ ও ব্যবহার, যুদ্ধ-বিগ্রহে সাহায্য-সহযোগিতার মানদণ্ড প্রভৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। এর ১৬ তম ধারায় ইহুদী সম্প্রদায়ের অনুপস্থিতিতেই তাদের সাথে ন্যায়ানুগ ও সদয় আচরণের উল্লেখ করার মাধ্যমে ইসলামে রাজনৈতিক মিত্রপক্ষের সাথে নৈতিকতাপূর্ণ আচরণ করার এবং তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতার কোন প্রকার প্রশ্রয় কিংবা স্বীকৃতি প্রদান না করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর ২৪ তম ধারায় মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে কোন প্রকার মতপার্থক্য দেখা দিলে তার নিষ্পত্তির ভার মহানবীর স. উপর অর্পণ করা হয়।

সনদের ২৫তম ধারা হতে ৪২ তম ধারা পর্যন্ত ইহুদীদের সাথে কৃত চুক্তির খুঁটিনাটি দিকগুলো আলোকপাত করা হয়েছে। এতে গোত্রভিত্তিক মদীনার ইহুদীদের বিবরণ প্রদানপূর্বক তাদের অধিকার ও কর্তব্য, মুমিনদের সাথে তাদের সম্পর্ক, যুদ্ধ-বিগ্রহে মুমিনদেরকে সাহায্য-সহযোগিতার সীমারেখা নির্ধারণ এবং ইহুদীদের জন্য আচরণবিধির বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। এর ৪৩ তম ধারায় ইয়াসরিবের মর্যাদা সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং এই নগরীকে পুত-পবিত্র নগরী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর ৪৪-৪৫ ধারায় আশ্রয়দানকারী ও আশ্রিতের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে। ৪৬ তম ধারায় কাউকে আশ্রয়দানের আওতাভুক্ত গোষ্ঠীসমূহের মাঝে শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে তা নিরসনের উপায় বলে দেয়া হয়েছে। ৪৭ তম ধারায় মদীনার বাইরের লোকজন বিশেষ করে মক্কার কুরাইশদেরকে এবং তাদের সাথে সম্পৃক্ত লোকজনকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়ার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ৪৮ তম ধারায় ইয়াসরিবের উপর আক্রমণ করা হলে ইহুদী-মুসলিম মিলে সম্মিলিতভাবে তা প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ৪৯ তম ধারায় সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করলে তা মান্য করার বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা হয়। ৫০তম ধারায় বহি:শত্রু দ্বারা মদীনা আক্রান্ত হলে এখানে বসবাসকারী গোত্রসমূহ নিজ নিজ এলাকার দিকটি রক্ষা করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। ৫১ তম ধারায় একটি ইহুদী গোত্রকে

---

৩৮. ড. আকরাম জিয়া আল-উমরী, *রাসূলের স. যুগে মদীনার সমাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৮

সনদের শরীক দলগুলোর সমমর্যাদা পাওয়ার ক্ষেত্রে শরীক দলগুলোর সাথে সম্মানজনক ব্যবহার এবং বিশ্বস্ততাপূর্ণ আচরণের শর্তারোপ করা হয়। ৫২ তম ধারায় এই সনদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সকল অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয়েছে এবং ৫৩ তম তথা সর্বশেষ ধারায় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং মহানবীর স. নেতৃত্বের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ৪৬ তম ধারায় ও অনুরূপ ঘোষণা বিদ্যমান।

মদীনা সনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এই সনদে অনেক ক্ষেত্রে ইয়াসরিবে পূর্ব হতে প্রচলিত অনেক রীতি ও সামাজিক প্রথাকে আইনের মর্যাদা দেয়া হয়েছে. যা সনদের ২য় ধারা হতে ১০ম ধারা পর্যন্ত রক্তপণ আদায় বিষয়ক আলোচনায় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এ সনদের ৩৯ তম ধারা হতে ৪৫ তম ধারা, ৪৭ তম ধারা হতে ৫০ তম ধারা এবং ৫২তম ধারা এর অন্তর্গত সকল শরীকদলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এর ২১ তম ধারায় মক্কার কুরাইশদের সাথে সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতার পথ রুদ্ধ করে মূলত: শত্রুর সাথে হাত মিলিয়ে মদীনার মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকল হীন চক্রান্তের পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে মদীনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত হয় এবং এর অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হাত হতে রক্ষা পায়।

মদীনা সনদে মহানবীর স. পদমর্যাদা : মদীনা সনদের কোথাও মহানবীর স. পদমর্যাদা সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু এই সনদের প্রস্তাবনা বা ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, "এটি নবী মুহাম্মদ স. এর পক্ষ হতে জারীকৃত একটি লিখিত সনদ"।[৩৯] এতে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী স. মদীনায় আগমনের পর মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্র এবং প্রধান প্রধান ইহুদী গোত্রের পক্ষ হতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে তিনি এই সনদ জারী করেন। যদি তিনি মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হিসেবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হন তা হলে এই সনদ জারী করার তার কোন আইনগত কর্তৃত্ব থাকে না এবং তা মান্য করার বিষয়ে সনদের শরীক দলগুলোর কোন বাধ্যবাধকতাও থাকে না। সুতরাং বুঝা যায়, এই সনদ জারীর পূর্বেই সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো তাঁর কর্তৃত্বের বিষয়টি মেনে নিয়েছিল।

মদীনা সনদের ২৪ ও ৪৬ তম ধারা দু'টিতে শরীক দলগুলোর পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে মহানবী স. কে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।[৪০] কিন্তু এতে কোন পর্যায়ে কোন প্রকার আপীলের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। অর্থাৎ তাঁর প্রদত্ত ফয়সালাকে চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করা হয়েছে। এই সনদে বিভিন্ন শরীক দলের অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার নির্ধারণের জন্য নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী কোন ব্যক্তি বা সংস্থার প্রয়োজন। আর এ

---

[৩৯]. আবদুস সালাম হারুন (সম্পা.), *তাহযীব সীরাতু ইবন হিশাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

[৪০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫-১২৬

ক্ষেত্রে উক্ত পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন নবী মুহাম্মদ স.।

মদীনা সনদের ৩৭ তম ধারায় মহানবী স. কে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ স.-এর কাছ থেকে পূর্ব অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত সনদে শরীক দলগুলোর মধ্য হতে কেউই যুদ্ধের জন্য বের হতে পারবে না।[৪১] এতেও বুঝা যায়, মদীনা সনদ জারীর মাধ্যমে মহানবী স. মদীনার সর্বময় শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী হন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য চারটি উপাদান প্রয়োজন। এগুলো হলো: ১. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Territory) ২. একটি জনগোষ্ঠী (Population), ৩. সরকার (Government) এবং ৪. সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)। মহানবী স. যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন মদীনায় রাষ্ট্র গঠনের প্রথম দুটি উপাদান বিদ্যামান ছিল। কিন্তু গোত্রভিত্তিক শাসন পরিচালিত হওয়ার কারণে এখানে সরকার ও সার্বভৌমত্ব ছিল অনুপস্থিত। মদীনা সনদ জারীর মাধ্যমে এখানে তাদের প্রাচীন গোত্র প্রথা বিলুপ্ত হয় এবং তারা একটি 'উম্মাহ' বা জাতিসত্তায় পরিণত হয়। বিবদমান বিষয়ে ফয়সালাদানের বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যার্পণের মাধ্যমে প্রকারান্তরে এখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মহানবী স. সরকার প্রধান রূপে আবির্ভূত হন। একটি আদর্শ সরকারের জন্য প্রয়োজন প্রশাসন, আইন প্রণয়ন ক্ষমতা এবং একটি বিচার বিভাগ। সনদের ২৪ ও ৪৬ তম ধারা অনুযায়ী আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে মহানবী স. আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অধিকারী হন এবং এর দ্বারা তিনি বিচার বিভাগীয় বিষয়াদিরও দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। অপর দিকে, এই সনদটি মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম লিখিত আইন বা সংবিধানের মর্যাদা লাভ করে।[৪২]

মহানবী স. মদীনায় আগমনের পর মদীনায় শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা, এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং একে বহি:শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা করা অপরিহার্য ছিল। তাই মহানবী স. অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে মদীনা সনদ জারীর মাধ্যমে মদীনার সকল অধিবাসীর জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করেন এবং এই সনদ অনুযায়ী তাঁকে মদীনা রাষ্ট্র ও উম্মাহর প্রশাসন এবং আইন ও বিচার বিষয়ক সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তিনি মদীনায় আগমন করার পর এখানে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত জনগোষ্ঠী মহানবীর স. আদর্শ এবং তাঁর জারীকৃত

---

৪১. وانه لايخرج منهم احد الا باذن محمد عليه السلام প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

৪২. M. Hamidullah, *The First Written Constitution in The world.* P. 4

সনদের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করে প্রমাণ করে যে, একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতি ও সম্প্রদায় নিজেদের ধর্ম, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করে ও ঐক্যবদ্ধভাবে রাষ্ট্র গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং দেশের সকল নাগরিক একটি রাজনৈতিক উম্মাহয় পরিণত হতে পারে।[৪৩]

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায় যে, মদীনা সনদ জারীর মাধ্যমে মহানবী স. প্রথমবারের মত মদীনাকে একটি নগররাষ্ট্রে পরিণত করেন এবং তিনি নিজে বিচারব্যবস্থা, প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। এ সনদের মাধ্যমে আইনের শাসন তথা ন্যায়বিচারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়। ফলে কেউই আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার সাহস পায়নি। এর মাধ্যমে আরবের চিরাচরিত গোত্রীয় প্রথা চিরতরে বিলুপ্ত হয়, যুদ্ধরত গোত্রগুলো ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ লাভ করে এবং একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। এই সনদের মাধ্যমে মদীনার সকল গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-কলহের অবসান ঘটে এবং একটি 'উম্মাহ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ভাবে এ সনদ বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান এবং সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার মর্যাদা লাভ করে।

---

[৪৩]. ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী ও মোঃ মফিজ উদ্দিন, *মদীনার সনদ পর্যালোচনা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭, ৩৬ বর্ষ, সংখ্যা, ৩. পৃ. ১৭

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮ সংখ্যা-৩১
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১২

ইসলামী আইনে তাযীরঃ ধরন ও প্রকৃতি

মোঃ আমিরুল ইসলাম*

[সারসংক্ষেপ : ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত এক অনন্য জীবন ব্যবস্থা। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা, অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন এবং অপরাধ প্রবণতা থেকে মুক্তির জন্য ইসলাম মানবতাকে সন্ধান দিয়েছে এক শ্রেষ্ঠ পথ-নির্দেশনার। ইসলামের এ পথ-নির্দেশনায় সমাজ থেকে অপরাধ দূরীকরণের জন্য বৈষয়িক বা পারলৌকিক শাস্তির বিধান-ই শুধু বর্ণিত হয়নি; বরং মানব সমাজকে অপরাধমুক্ত করার জন্য দণ্ডবিধি কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলামের এ দণ্ডবিধি অপরাধ প্রতিরোধক। আল্লাহ এ দণ্ডবিধি প্রবর্তন করেছেন তাঁর ঘোষিত নিষিদ্ধ কাজ ও আদিষ্ট কাজ না করা থেকে মানুষকে বিরত রাখার মহান লক্ষ্যে। এজন্য আল-কুরআনে কিছু কিছু অপরাধের হদ্দ বা সুনির্দিষ্ট শাস্তি ঘোষিত হয়েছে। যেমন ব্যভিচার, ব্যভিচারের মিথ্যা দোষারোপ, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি। আবার কিছু কিছু অপরাধের কিসাস গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন, হত্যা, অঙ্গহানি ইত্যাদি। আর যে সমস্ত অপরাধের শাস্তি আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি কিন্তু ইজতিহাদের মাধ্যমে অপরাধ প্রতিরোধের জন্য বিচারক যে শাস্তি নির্ধারণ করে থাকেন তাকে-ই-তাযীর বলা হয়। অপরাধ দমনে এ ধরনের শাস্তিরও বেশ প্রভাব রয়েছে। এ প্রবন্ধে তাযীর-এর পরিচয় তাযীর ও হদ্দ এর মধ্যে পার্থক্য, তাযীর-এর প্রকারভেদ, তাযীরী শাস্তির ধরন ও প্রকরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।]

তাযীর-এর পরিচয়

আরবী অভিধানে তাযীর শব্দ তিরস্কার করা, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া, সংস্কৃতিবান বানানো, ভদ্র বানানো, সংশোধন করা, সুশৃংখল বানানো ইত্যাদি অর্থে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এছাড়া সাহায্য-সহযোগিতা করা, বারণ করা ও ফিরিয়ে রাখা অর্থেও শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।[১] ইসলামী আইনের পরিভাষায়- যে সব অপরাধের জন্য ইসলামী শরীয়ত নির্দিষ্ট কোন শাস্তি কিংবা কাফ্ফারা নির্ধারণ করেনি সে সব অপরাধের শাস্তিকে

---

* গবেষক ও প্রাবন্ধিক

১. ইবনে মানযূর আল-আফরীকী, *লিসানুল আরাব*, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা.বি, খ. ৪, পৃ. ৫৬১-৫৬২; আল-জুরজানী, *কিতাবুত তারীফাত*, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ২০০৫, পৃ. ৪৫; আবু বকর আল-জাযায়িরী, *কিতাবুল ফিকহ আলাল-মাযাহিবিল-আরবায়াহ*, আল-কাহেরাঃ দারুল আফাক, ২০০৫, খ. ৫, পৃ. ২৯

তাযীর বলা হয়।[২] সুতরাং স্থান, কাল ও অবস্থাভেদে কল্যাণের দাবির প্রেক্ষিতে এ ধরনের শাস্তি নির্ধারিত হয়ে থাকে। বিখ্যাত ইসলামী আইনজ্ঞ আল-মাওয়ার্দী লিখেছেন, ইসলামী শরীয়তে শাস্তি নির্ধারিত নেই- এমন সব অপরাধের বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তিকে তাযীর বলা হয়।[৩] তাযীরের সংজ্ঞা সম্পর্কে মুসলিম আইনবিদগণের মতামত বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, যে সব অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে ইসলামী শরীয়তে সুনির্দিষ্টভাবে কোন ধারণা দেয়া হয়নি এসব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচারক তার বিবেচনা দ্বারা যে শাস্তির নির্দেশ দেন সে শাস্তিকে তাযীর বলা হয়।[৪] প্রখ্যাত মিসরীয় আইনবিদ আব্দুল কাদির আওদাহ্ বলেন, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য কৃত এমন অপরাধের শাস্তি বিধান সুনিশ্চিত করাকে তাযীর বলা হয় যে অপরাধগুলোর শাস্তি শরীয়তে নির্দিষ্ট করা হয়নি।[৫] কোর্ট বা আদালতের বিচারক ছাড়াও সর্বজনীনভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান শরীয়তের রীতি-নীতি বিশ্লেষণ করে এসব অপরাধের শাস্তির বিধান চূড়ান্ত করতে পারেন।[৬] যেমন জাতীয় সংসদের মাধ্যমে দণ্ডবিধি নির্ধারণ করা হয় এবং বিচারক ও জজগণ সে মতে দণ্ডবিধির ধারা

---

[২]. *আল-ফাতাওয়া আল-হিনদিয়্যাহ,* বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০০, খ. ২, পৃ. ১৮৪; আল-জাযায়িরী, *কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবায়াহ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪; সুন্নী আইন অনুযায়ী তাযীর হলো, Tazir in its primitive sense means prohibition and also instruction in Law it signifies and infication undermined in its degree by the Law on account of the right either of God or of the individual. Cf. Thomas patrick Hugghes, Dictionary of Islam (Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1976), p. 632.

[৩]. আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ,* আল-কাহেরা : দারুল হাদীছ, ২০০৬, পৃ. ৩৪৪; Tazir in defined as a sentence or punishment whose crime is not fixed by the Shar'iah, for doing disobediene or offence whihch is not inflicted by the hadd and kaffarah punishment. CF. (http://www.sunniforum.com).

[৪]. আল-জাযায়িরী, *কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবাআহ,* খ. ৫, পৃ. ২৯৫

[৫]. التعزير هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود وهو عقوبة على جرائم لم تضع الشريعة لايهاعقوبة مقدرة. দ্রষ্টব্যঃ আব্দুল কাদির আওদাহ্, *আত-তাশরীউল জিনাঈ,* খ. ১ বৈরূতঃ দারুল কিতাব আল-আরাবী, তা.বি., পৃ. ৬৮৫

[৬]. The Islamic government has the right to impose this tazir rule with its detailed relevant facts fixed, including the rate of punishment to be received by the criminals, which must be in accordance with the degree of offence done. CF. Mahfodz Bin Mohamed, *The Concept of Ta'zir in the Islamic Criminal Law* (http:www.sunniforum.com). *আল-মাওসুআহ আল-ফিকহিয়্যাহ,* কুয়েতঃ ওযারাতুল আওকাফ ওয়াল শুয়ূন আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫, খ. ১২, পৃ. ২৫৭

অনুযায়ী মামলার রায় দিয়ে থাকেন। হুদূদ ও কিসাস জাতীয় নির্দিষ্ট কিছু অপরাধ ছাড়া অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে এরূপ শাস্তির বিধান সুনিশ্চিত করা যেতে পারে।[৭]

তাযীর ও হদ্দ-এর মধ্যে পার্থক্য

শব্দঅর্থ এবং মানগত দিক দিয়ে *হদ্দ* ও তাযীরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাযীর হলো, উপযুক্ত শিক্ষাদান, চরিত্র সংশোধন এবং অপরাধ প্রতিরোধক ব্যবস্থা। অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রার পার্থক্যের কারণে তাযীরী শাস্তি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কিন্তু *হদ্দ* এরূপ নয়। এর শাস্তি নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত। উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:[৮]

১. *হদ্দ* নির্ধারিত এবং তাযীর অনির্ধারিত শাস্তি। *হদ্দ* শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি যার কোন কমবেশি করার সুযোগ নেই। আর তাযীর হলো বিচারক কর্তৃক সুচিন্তিত রায়। এর শাস্তি কম বেশি করার সুযোগ রয়েছে।[৯]

২. অপরাধ প্রমাণে কিংবা অপরাধের শর্তাবলীর মধ্য থেকে কোন একটিতে সামান্যটুকু সন্দেহ দেখা দিলে *হদ্দ* অকার্যকর হয়ে পড়ে কিন্তু তাযীর এরূপ নয়। সন্দেহের সৃষ্টি হলেও তাযীর কার্যকর হয়ে থাকে। কেননা হদ্দ অপেক্ষা তাযীরের শাস্তি লঘু।[১০]

৩. বিধিসম্মত পন্থায় *হদ্দ* প্রমাণিত হওয়ার পর তা রহিতকরণের উদ্দেশ্যে আপীল করার সুযোগ বলবৎ থাকে না এবং কোন বিচারক বা জজ তা রহিত করার ক্ষমতা রাখেন না। কিন্তু তাযীর এরূপ নয়। সেখানে রায় পছন্দ না হলে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা তার পক্ষ উচ্চ আদালতে আপীল করতে পারবে। এক কথায় হদ্দজনিত অপরাধের শাস্তি কারো মওকূফ করার অধিকার নেই।

---

[৭]. ড. আহমাদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, ঢাকা: ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯, পৃ. ২৯

[৮]. ইবনে আবিদীন আশ-শামী, *রাদ্দুল মুহতার*, বৈরূত: দারুল ফিকর, ২০০৬, খ. ৪, পৃ. ৬১-৬২; *আল-মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ১২, পৃ. ২৫৭; মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ২০৭-২০৮; আল-জাযায়িরী, *কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবাআহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৯-৩০

[৯]. ড. আব্দুল আযীয আমির, *আত-তাযীর ফীশ শারীয়তিল ইসলামিয়্যাহ*, আল-কাহেরা : দারুল ফিকর আল-আরাবী, ২০০৭, পৃ. ৬২; العقوبات المقررة لجرائم الحدود وجرائم القصاص والدية هى عقوبات مقدرة معينة فهى عقوبات لازمة ليس للقاضى أن يستبدل بها غيرها وليس له ان ينقص او يزيد فيها وأما التعزير فهى عقوبات غيرمقدرة فللقاضى ان يختار من بينها العقوبة الملائمة দ্রষ্টব্য: *আল-তাশরীউল জিনাঈ*, খ. ১, পৃ. ৬৮৬-৬৮৭

[১০]. সাইয়েদ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, *সুবুলুস সালাম*, আল-কাহেরা : মাতবাআতুল হালাবী, ১৩৪৯, খ. ৪, পৃ. ৫৪

আর তাযীরী অপরাধের শাস্তি বিচারক ইচ্ছে করলে ব্যক্তি বিশেষে মওকূফ করতে পারেন। এটি তার উপর নির্ভর করবে।[১১]

৪. *হদ্দ* এর ক্ষেত্রে আসামী তার স্বীকারোক্তি বা জবানবন্দী ফিরিয়ে নিতে পারে। এটি বিধিসম্মত। কিন্তু তাযীরের ক্ষেত্রে আসামী তার স্বীকারোক্তি ফিরিয়ে নিলেও তাযীরের বিধান বলবৎ থাকে। শাস্তি মওকূফ হবে না।[১২]

৫. *হদ্দ* অপ্রাপ্ত বয়স্কদের উপর প্রযোজ্য হয় না। আর তাযীর অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগলের উপরও কার্যকর হয়ে থাকে। এমনকি আসামীর সামান্যতম হুঁশ বা জ্ঞান আছে অর্থাৎ পুরোপুরি পাগল নয় এমন আসামীর উপরও তাযীর প্রয়োগ করা যাবে। কেননা তাযীরের অর্থ হলো, শিষ্টাচার শিক্ষাদান। আর আসামীকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য যে কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।[১৩]

৬. মানুষের শ্রেণীভেদে তাযীরের শাস্তির মধ্যে তারতম্য ও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে *হদ্দ* এর ক্ষেত্রে বেশ-কম করা সম্ভব নয়। *হদ্দ* কার্যকর করার ব্যাপারে আশরাফ-আতরাফ, উচু-নিচু, আমীর-ফকীর, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, রাজা-প্রজা, আরব-অনারব সবাই সমান।[১৪]

৭. তাযীরের মামলা জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারকের নিকট পৌঁছার পরও সুপারিশ করা অথবা ক্ষমা করার অবকাশ থাকে। কিন্তু হদ্দের বিষয়টি এ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কেননা *হদ্দ* সংক্রান্ত অপরাধের মামলা দায়ের করার পর এতে কোন সুপারিশ বা ক্ষমা করার কোন অবকাশ থাকে না।[১৫]

৮. হদ্দ নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে কেবল উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ও স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়ে থাকে কিন্তু তাযীর সাক্ষ্য-প্রমাণ ও স্বীকারোক্তি ব্যতীত শপথ, ও গণসাক্ষ্য দ্বারাও প্রমাণ করা যায়।[১৬]

প্রকারভেদ

অপরাধ হিসেবে তাযীর সাধারণতঃ দুইপ্রকার। যেমনঃ

(এক) **আল্লাহর অধিকার লংঘনজনিত অপরাধের তাযীরঃ** আল্লাহর অধিকার লংঘনজনিত অপরাধ বলতে বুঝায়, যেমন সুস্থ সবল হওয়া সত্ত্বেও নামায না পড়া।

---

[১১]. *আত-তাশরীউল জিনাঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৮৭; *হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৮৪

[১২]. ড. আব্দুল আযীয আমির, *আত-তা'যীর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫

[১৩]. প্রাগুক্ত

[১৪]. প্রাগুক্ত

[১৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

[১৬]. *আল-ফাতাওয়া আল-হিনদিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬৫; ড. আহমাদ আলী, ইসলামের শাস্তি আইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

বিনা কারণে রমযানের রোযা না রাখা, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ ও যাকাত আদায় না করা অথবা এমন কোন অশ্লীল কাজ করা ইসলামী শরীয়তে যার কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান নেই। এক্ষেত্রে বিচারক অপরাধীকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শাস্তি প্রদান করবেন। আল্লাহর বিধান লংঘনজনিত অপরাধে যে অপরাধী হবে জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট তার তাযীরকে মওকূফ করবেন না। তবে বিচারক যদি মনে করেন, অপরাধী তাযীর ছাড়াই সংশোধিত হয়ে যাবে তাহলে তাকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমাও করতে পারেন।[১৭]

(দুই) বান্দার অধিকার ক্ষুণ্ণকরণজনিত অপরাধের তাযীরঃ বান্দার অধিকার ক্ষুণ্ণকরণ অপরাধ বলতে বুঝায় মানহানি করা বা কাউকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে আদালতে মামলা দায়ের না হওয়া পর্যন্ত বিচারক অপরাধীকে কোনরূপ শাস্তি দিতে পারবেন না। এ প্রকারের তাযীর মূলতঃ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ইচ্ছা করলে মামলা দায়ের করতে পারে, এমনকি মামলা দায়ের করার পরও তা প্রত্যাহার করতে পারে অথবা অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতে পারে।[১৮]

উল্লিখিত দুই প্রকার তাযীর ছাড়া অপরাধীর অবস্থাভেদে তাযীর আবার বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমনঃ ১. সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর জন্য তাযীর ২. উচ্চ শ্রেণীর লোকদের জন্য তাযীর এবং ৩. সাধারণ মানুষের জন্য তাযীর।

১. সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর জন্য তাযীর

সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর তাযীর বলতে বুঝায় 'আলিম, ফকীহ্ ও সাইয়্যিদ বংশীয় লোকজন। এ শ্রেণীর লোক যদি *হদ্দ* জনিত অপরাধ ব্যতিরেকে অন্য কোন অন্যায় বা অপরাধ করে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে তাযীরী শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে। তাদের ক্ষেত্রে তাযীর হলো, বিচারক ডেকে অথবা নোটিশ দিয়ে উক্ত কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিবেন। এ নির্দেশ হবে শুধু সতর্কীকরণ। আর এটিই হবে তাদের ক্ষেত্রে তাযীর।[১৯]

২. উচ্চ শ্রেণীর লোকদের জন্য তাযীর

আমীর-উমারা, ধনী, বণিক, নেতা-সরদার, চৌধুরী, জমিদার এক কথায় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তারা যদি *হদ্দ* জনিত অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন অপরাধ করে তাহলে তাদের তাযীর হলো, বিচারক তাদেরকে নোটিশ করবেন এবং আদালতে তলব করে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ না করার জন্য সতর্ক করবেন।[২০]

---

[১৭]. ড. আব্দুল আযীয আমির, *আত-তাযীর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

[১৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

[১৯]. *ফাতাওয়া ওয়া মাসাইল*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৪৫

[২০]. *প্রাগুক্ত*

৩. সাধারণ মানুষের জন্য তাযীর

সাধারণ মানুষ যদি হদ্দ জনিত অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন অপরাধ করে তাহলে তাদের উপর তাযীরী শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। তাদের তাযীর হলো, বিচারক তাদেরকে নোটিশ করে আদালতে তলব করবেন, বন্দী করবেন এবং শাস্তির বিধান করবেন।[২১]

তাযীর পর্যায়ের অপরাধ

ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে হদ্দ ও কিসাস ভুক্ত নির্দিষ্ট অপরাধ ব্যতীত অবশিষ্ট সব অপরাধই তাযীরী অপরাধ। এ অপরাধগুলোর কয়েকটি ধরণ রয়েছে। যেমন, ক. কর্তব্য পালন কিংবা ওয়াজিব আদায়ে অবহেলা।[২২] যেমন, সালাত পরিত্যাগ করা, যাকাত আদায় না করা, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পাওনা পরিশোধ না করা, আমানত আদায় না করা, অপহৃত সম্পদ ফিরিয়ে না দেয়া, পণ্যের ক্রুটি প্রকাশ না করা। খ. অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ ও গালিগালাজ করা।[২৩] যেমন, কোন মুসলিমকে কাফির ও ফাসিক বলে গালিগালাজ করা, অথচ সে কাফিরও নয় এবং ফাসিকও নয়। কোন মুসলিমকে ইহুদী ও খ্রিষ্টান বলে সম্বোধন করা, হিজড়া বলে কাউকে গালি দেয়া, হে পাপী, হে মুনাফিক, হে মদখোর, হে দাইউস, হে আত্মসাৎকারী ইত্যাদি ভাষায় গালি দেয়া অথবা কাউকে বলদ, জুয়াড়ী, বেনামাযী বলা এবং সর্বপ্রকার অশ্লীল ভাষায় গালি দেয়া। গ. নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া।[২৪] যেমন, বেগানা মহিলাকে চুম্বন করা, পর-নারীর সাথে নির্জনে সময় কাটানো, প্রাণীর সাথে সংগম করা, খাদ্যে ভেজাল দেয়া, মাপে কম দেয়া, খাদ্য দ্রব্য গুদামজাত করা, প্রতারণা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, দুর্নীতি করা, দায়িত্ব পালনে ফাঁকি দেয়া, সুদ খাওয়া, ঘুষ দেয়া, ঘুষ খাওয়া, সমকামিতা, মদ ও জুয়ার আসরে যোগদান করা, নৈতিকতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করা, ব্যভিচার ব্যতিরেকে কাউকে অন্য কোন অপরাধের অপবাদ দেয়া, বিনা কারণে কাউকে অপমান ও অপদস্ত করা, মিথ্যা মামলা করা, গোয়েন্দাগিরী করা, অন্যায়ভাবে মামলায় জড়িয়ে মানহানী করা, আদালত অবমাননা করা, কাউকে অন্যায়ভাবে মারধর করা, ন্যায় কাজে বাধা দেয়া, অধিকার খর্ব করা, ন্যায়পন্থী সরকারের ন্যায় সংগত কাজে বাধা সৃষ্টি করা, কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা। এক কথায় হদ্দ ও কিসাসজনিত অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট সকল ধরনের অপরাধ তাযীর পর্যায়ের অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।[২৫]

---

[২১]. *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৪-১৮৮

[২২]. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬; ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২-৩১৩

[২৩]. *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৫-১৮৬

[২৪]. প্রাগুক্ত; ড. আহমদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২-৩১৩

[২৫] Mahfodz Bin Mohamed, *The Concept of Tazir in the Islamic Criminal Law* (http:www.sunniforum.com).

তাযীরী শাস্তির ধরণ ও প্রকরণ

তাযীর যেহেতু অনির্ধারিত শাস্তি সেহেতু বিজ্ঞ বিচারক সুবিবেচনার দ্বারা এ শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। কেননা তাযীর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অন্যায় অপকর্ম থেকে অপরাধীকে বিরত রাখা এবং অপকর্মকে প্রতিহত করা।[২৬] মানুষ সৃষ্টিগতভাবে সকলে একই স্বভাবের নয়। কেউ কোমল, আবার কেউ কঠোর। কেউ মৃদু ধমক অথবা তিরস্কারে সংশোধন হয়। আবার কেউ কঠোর ধমক অথবা মারধরে সংশোধিত হয়। এ পর্যায়ে কাউকে আবার ধমক তিরস্কারের পরিবর্তে সংশোধনের জন্য শাস্তির নিমিত্তে বন্দী করতে হয়। তাই সব তাযীরের নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। অপরাধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞ বিচারক তার সুবিবেচনার আলোকে যে দণ্ডবিধান সুনিশ্চিত করবেন অথবা যে শাস্তি নিরূপণ করবেন মূলত: তাই তাযীর বলে গণ্য হবে।[২৭] তাই তাযীরের শাস্তি বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু তাযীরী শাস্তির বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. মৃত্যুদণ্ড

ইসলামী শরীয়তের সাধারণ বিধি অনুযায়ী তাযীরের আওতায় কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া বৈধ নয়। কেননা আল-কুরআনে কেবল খুনের পরিবর্তে খুন বৈধ করা হয়েছে।[২৮] রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন মুসলিমের রক্ত হালাল নয়। এরা হলো, অন্যায়ভাবে অপরকে হত্যাকারী, বিবাহিত ব্যভিচারী এবং মুসলিম দল ও ধর্মত্যাগকারী"।[২৯] এ তিন ব্যক্তি ছাড়াও কতিপয় বড় বড় অপরাধে তাযীর স্বরূপ অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে বলে বিপুল সংখ্যক ইসলামী শরীয়ত বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে কোন মারাত্মক অপরাধ বারবার করলে

---

[২৬] এ প্রসংগে The Concept of Tazir in the Islamic Criminal Law GK গবেষণাধর্মী নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, Tazir penalty for committing sinful acts which its qadar (rate) is not determined by the Shar'. The punishments can range from just given advice or warning to being jailed, tortured or to the extreme of being sentenced to death for major offences http:www.sunniforum.com.

[২৭]. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, কোয়েটা: আল-মাকতাবাতুল হাবিবিয়্যাহ, তা. বি., খ. ৫, পৃ. ২৫৭

[২৮]. আল-কুরআন, ২ : ১৭৮ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

[২৯]. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদ : কওলুল্লাহি তাআলা-আন্নান-নাফসা বিন-নাফসি ওয়াল আইনা বিল-আইনি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩

জাতীয় ঐক্য ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনের তাকিদে তাযীর স্বরূপ অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া বৈধ।[৩০] এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের মূলনীতি হলো, যে সমস্ত অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয় সে সমস্ত অপরাধ যদি কোন ব্যক্তি বারবার করে তাহলে বিচারক তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবেন। অনুরূপভাবে কোন নির্দিষ্ট শাস্তি বা *হদ্দ* এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হলে বা তাতে কল্যাণ নিহিত মনে করা হলে বিচারক অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবেন। কেননা নবী স. ও সাহাবীগণ কর্তৃক এ ধরনের অপরাধে দোষী ব্যক্তিদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার অনেক দৃষ্টান্ত হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। এ ধরনের মৃত্যুদণ্ডকে *রাজনৈতিক হত্যা* হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।[৩১] অনুরূপভাবে চুরির শাস্তি হলো, হাতকাটা। কিন্তু চোর যদি একাধিকবার চুরি করে তাহলে একাধিকবার তার হাত কাটা সম্ভব নয়। এজন্য বিচারক সামাজিক প্রয়োজনে বারবার চুরি করার কারণে চোরকে সর্বোচ্চ তাযীর হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবেন। অথবা কোন সন্ত্রাসীর বারবার সন্ত্রাসের ফলে সমাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে থাকে তাহলে তাকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেতে পারে।[৩২]

২. নির্বাসন দেয়া

তাযীরী অপরাধের কারণে বিচারক অপরাধী বা দোষী ব্যক্তিকে তাযীর হিসেবে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত দেশ থেকে বহিষ্কার অথবা নির্বাসন দিতে পারেন। কেননা রসূলুল্লাহ স. তাযীরী অপরাধের কারণে বেশ কিছু লোককে নির্বাসন দিয়েছিলেন। তিনি মেয়েদের বেশধারী নপুংসকদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেছিলেন এবং তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন, "তোমরা তাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও।" অনুরূপভাবে উমর রা. মহিলাদেরকে ফিতনায় ফেলার কারণে নাসর ইবনে হাজ্জাজকে বসরায় নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন।[৩৩] এছাড়া তিনি সুবাইগ নামক জনৈক ব্যক্তিকে *আল-কুরআনের সূরা আল-জারিয়াত, আল-মুরসালাত* ও *আল-নাযিয়াত* সম্পর্কে উদ্ভট প্রশ্ন করার কারণে কারাগারে বন্দী করেছিলেন এবং পরপর বেত্রাঘাত করেন। অবশেষে তিনি তাকে ইরাকে নির্বাসন দেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি তাকে

---

[৩০]. ইবনুন নুজাইম, *আল-বাহরুর রায়েক*, তা. বি., খ. ৫, পৃ. ১২৩; ড. আহমদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪

[৩১]. ইমাম ইবনে তায়মিয়্যা, *আস-সিয়াসাহ আশ শারইয়্যাহ*, বৈরুতঃ দারুল কিতাব আল-আরাবী, ২০০১, পৃ. ১১৪; *আত-তাশরীউল জিনাঈ*, খ. ১, পৃ. ৬৮৮

[৩২]. *আত-তাশরীউল জিনাঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৮৯; হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন, তা. বি., খ. ৩, পৃ. ২৬০; আবুল আব্বাস আর রামলী, *নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ*, খ. ৮ (মিসরঃ মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী, তা.বি.), পৃ. ২০

[৩৩]. ইবনে হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, তা. বি., খ. ১২, পৃ. ১৬০

বসরায় নির্বাসন দিয়েছিলেন এবং তার সাথে উঠাবসা করতে জনগণকে নিষেধ করেন।[৩৪] অপরাধীকে নির্বাসন স্থলে কারারুদ্ধ করে রাখতে হবে কিনা- এ বিষয়ে মুসলিম আইনবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। একদল ফিকহবিদের মতে এ ধরনের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাসন স্থলে বন্দী করে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। তবে তার উপর সার্বক্ষণিক নজরদারী করতে হবে, যাতে সে নিজ দেশে ফিরে আসতে না পারে। এটি শাফিঈ ও হাম্বলীদের অভিমত। মালিকী মাযহাব মতে উক্ত অপরাধীকে নির্বাসনস্থলে বন্দী করে রাখতে হবে।[৩৫]

৩. কারারুদ্ধ করা

তাযীরী অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক অপরাধীকে কারাদণ্ড দিতে পারেন। কখনো এই কারাদণ্ড বিনাশ্রম হতে পারে অথবা সশ্রমও হতে পারে। আবার এ কারাদণ্ড যাবজ্জীবন অথবা মেয়াদীও হতে পারে।[৩৬] যদি অপরাধীকে কারাগারে বন্দী করে না রাখা হয় তাহলে সমাজে আরো বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে অথবা তার কার্যকলাপে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠতে পারে। এক্ষেত্রে বিচারক তাকে জেল হাজতে পাঠাতে পারবেন। ফলশ্রুতিতে অপরাধী কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সে কারাজীবনের দুঃসহ কষ্টের কথা স্মরণ করে কোন অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকবে। এ জন্য কারাগারের অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যে, যাতে কয়েদীরা সেখানে অবস্থান করে তাদের অপরাধী জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে বিশুদ্ধ জীবনের প্রতি ধাবিত হয়। সুতরাং কারাগারে বন্দী করা অথবা আটকাদেশ হিসেবে তাযীরী শাস্তিকে কার্যকর শাস্তি হিসেবে ইসলামী আইনজ্ঞগণ মনে করেন। আর এ বিষয়ের উপর আলিমগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রসূল স. মদীনায় কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীকে তাদের অর্থনৈতিক কাজের জন্য আটকাদেশ দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে উমর রা.ও হুতাইয়াকে তার উপহাস ও তিরস্কারের জন্য কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন।[৩৭] তবে এ বন্দিত্বের সময় কত হবে এ নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলেন, অপরাধ খুব লঘু হলে সর্বনিম্ন কারাবাসের সময় হবে একদিন। আর সর্বোচ্চ পরিমাণ ৬ মাসের বেশি যেন না হয়। কেউ কেউ বলেন, ১ বছর। তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো, কত সময় কারাদণ্ড হবে তা কৃত অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনায় এনে বিজ্ঞ বিচারক নির্ধারণ করবেন।[৩৮]

---

[৩৪]. ড. আব্দুল আযীয আমির, *আত-তাযীর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮

[৩৫]. *আত-তাশরীউল জিনাঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৯৬

[৩৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮৯

[৩৭]. ড. আব্দুল আযীয আমির, *আত-তা'যীর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮

৩৮. *আত-তাশরীউল জিনাঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৯৪

৪. তিরস্কার ও ভর্ৎসনা

সাধারণ অপরাধ তথা গালি-গালাজ, অশালীন ও অভদ্রোচিত আচরণের জন্য কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তাহলে বিচারক এ মামলায় তাযীরী শাস্তি হিসেবে অপরাধীকে আদালতে তলব করে তিরস্কার ও ধমক দিতে পারবেন। তবে এ ধরনের ভর্ৎসনা বা তিরস্কারের শর্ত হলো, তা অবশ্যই কথাসর্বস্ব না হয়ে অর্থবহ হতে হবে। এ ধরণের কৃত অপরাধের মাত্রা বুঝে বিচারক তার সুবিবেচনায় অন্য শাস্তিও দিতে পারবেন।[৩৯] তবে এ ধরণের মামলার আসামী যদি সমাজের উচ্চপদস্থ গণ্য-মান্য ব্যক্তির সাথে অসৎ আচরণ করে তাহলে বিচারক অপরাধীকে তিরস্কারের পরিবর্তে কঠিন শাস্তি দিবেন, যাতে অপরাধী পরবর্তীকালে এধরণের কাজে লিপ্ত না হয়। তবে এ ক্ষেত্রে লঘু শাস্তি দেয়াই সমীচীন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ একব্যক্তির সাথে ঝগড়া করতে গিয়ে এক পর্যায়ে 'হে কৃষ্ণাঙ্গের ছেলে, বলে গালি দিলেন। এতে রসূলুল্লাহ স. রাগান্বিত হয়ে বললেন, কৃষ্ণাঙ্গের ছেলের উপর শ্বেতাঙ্গের ছেলের কোন অসংগত অধিকার নেই।[৪০] একবার আবূ যার রা. জনৈক ব্যক্তিকে তার মায়ের নাম ধরে গালি দিচ্ছিলেন, রসূল স. তা শুনে তাকে বললেন, হে আবূ যার! তুমি অপমান করছো। তোমার মধ্যে তো দেখছি জাহিলিয়াতের আচরণ রয়ে গেছে। এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অপরাধীকে শাস্তি হিসেবে তিরস্কার অথবা ধমক প্রদান করা যেতে পারে।

৫. মালামাল ক্রোক ও বাজেয়াপ্তকরণ

তাযীরী শাস্তি হিসেবে বিচারক অপরাধীর অর্থ-সম্পদ এক নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত আটক করার নির্দেশ দিতে পারেন, যাতে আসামী সংশোধন হওয়ার সুযোগ পায়। সে সংশোধিত হলে বিধান অনুযায়ী তার সম্পদ তাকে ফেরত দিতে হবে। এই সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়া যাবে না। তবে অপরাধীর সংশোধন হওয়ার ব্যাপারে প্রশাসন নিরাশ হলে তার আটককৃত মাল জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যাবে বলে অনেক ইসলামী আইনজ্ঞ অভিমত দিয়েছেন।[৪১] যেমন ইমাম আবূ ইউসুফ র. এর মতে, বিচারক তাযীরী শাস্তি হিসেবে অপরাধীর সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে পারেন।[৪২]

---

৩৯. প্রাগুক্ত

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৩

৪১. *আল-বাহরুর রায়িক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪২; ড. আহমদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

৪২. ইবনে কাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ, আত-তুরুকুল হুকুমিয়্যাহ, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি, পৃ. ২৯১

৬. চাকুরিচ্যুতি

আসামীর কৃত অপরাধ গুরুতর হলে বিচারক আসামীকে ক্ষেত্রভেদে সাময়িক ভাবে চাকুরিচ্যুত করতে পারেন।[৪৩] যেমন ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ, রাষ্ট্রদ্রোহী অথবা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় ব্যত্যয় সৃষ্টিকারী অপরাধীর বিরুদ্ধে বিচারক এ ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। অনুরূপভাবে কোন বিচারক যদি পক্ষপাতমূলক বিচার করেন অথবা ন্যায়ের পরিপন্থী রায় প্রদান করেন তাহলে তাকেও পদচ্যুত করা যাবে।[৪৪] ইমাম শাফিঈর মতে, বিচারক যদি ফাসিক হয় তাহলে তাকে পদচ্যুত করা হবে। এমনকি তাঁর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে না। হানাফীদের মতে, এরূপ ফাসিক বিচারকের বিচারকার্য বৈধ হবে না।[৪৫] এ প্রসংগে ইমাম ইবনে তায়মিয়া লিখেছেন, চাকুরিচ্যুতি অথবা সাময়িক বরখাস্তের মাধ্যমে অপরাধীকে তাযীরী শাস্তি দেয়া যেতে পারে। রসূলুল্লাহ স. ও সাহাবীগণ বিচারের ক্ষেত্রে অপরাধীকে এরূপ তাযীরী শাস্তি, দিয়েছেন।[৪৬] এ মর্মে উমর রা.-এর খিলাফতকালের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। উমর রা.-কে জানানো হলো, তাঁর নিয়োগকৃত একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা মদ উত্তেজক কবিতা আবৃত্তি করে উল্লাস করেন। এ খবর পেয়ে উমর রা. তাকে তার পদ থেকে বরখাস্ত করলেন।[৪৭]

৭. আর্থিক জরিমানা

বিচারক তাযীরী শাস্তি হিসেবে কোন আসামীকে তার কৃত অপরাধের জন্য আর্থিক জরিমানাও করতে পারবেন। ইসলামী শরীয়া বিশেষজ্ঞগণ তাযীরী শাস্তি হিসেবে আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করা সংগত বলে মত দিয়েছেন।[৪৮] কী ধরনের অপরাধে আর্থিক জরিমানা করা যেতে পারে ফকীহগণ সে অপরাধগুলোকে চিহ্নিত করেছেন। যেমন, মদের আসরে যোগদান, হারানো সম্পদ চুরি করা, চতুষ্পদ জন্তু চুরি করা, ঝুলন্ত ফল পেড়ে খাওয়া ইত্যাদি।[৪৯] এ মতের সমর্থনে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একদা

---

[৪৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৪

[৪৪]. *প্রাগুক্ত*

[৪৫] আল-মারগিলানী, *আল-হিদায়াহ,* তা. বি., খ. ৩, পৃ. ১০১

[৪৬]. *আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়্যাহ,* পৃ. ৫৩

[৪৭]. ড. আব্দুল আযীয আমির, *আত-তাযীর,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

[৪৮] *আত-তাশরীউল জিনাঈ,* প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭০৪

[৪৯]. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৮১; In the early years of Islam, a man was fined for stealing a fruit which was hanging from a tree with double the value of the stolen fruit. CF. Mahfodz Bin Mohamed, *The Concept of Ta'zir in the Islamic Criminal Law* (http:www.sunniforum.com).

রসূল স. কে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, "যে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তা মুখের কাছে পেয়ে যায়, কোন উপায়ে তা পড়ে না, তা খেলে তাতে কোন অপরাধ হবে না। আর যে তা কোন জিনিসের সাহায্যে পাড়বে, তাকে তার দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে এবং সে সাথে তাকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে।"[৫০] রসূলুল্লাহ স. ও খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি হিসেবে অপরাধীকে আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। হাদীস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ রয়েছে।[৫১]

৮. প্রচার ও মাইকিং

তাযীরী শাস্তি হিসেবে বিচারক প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে আসামীর নাম জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করতে বলবেন।[৫২] প্রখ্যাত বিচারক কাযী শুরাইহ উমর রা. ও আলীর রা. খিলাফতকালে মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীর নাম ঢোল বাজিয়ে বাজারে প্রচার করাতেন।[৫৩] এক্ষেত্রে তিনি আসরের নামাযের পর বাজারে অথবা লোকালয়ে একজন ঘোষককে এমর্মে ঘোষণা দেয়ার জন্য পাঠিয়ে দিতেন যে, "হে মানবমণ্ডলী! অমুক ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তোমরা তার সম্পর্কে সাবধান হও। তোমরা তাকে পরিত্যাগ কর।" এ ঘোষণা শুনে লোকেরা তার ব্যাপারে সাবধান হয়ে যেত।[৫৪] আসামীর নাম শুধু প্রচার করেই বিচারক ক্ষান্ত হবেন না, তিনি ইচ্ছা করলে আসামীকে অন্য শাস্তিও দিতে পারবেন। শাফিঈ, হাম্বলী ও মালিকী মাযহাবের কতিপয় ইমামের মতে, মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীর বিষয়টি বিচারক কিংবা প্রশাসনের কাছেই ন্যস্ত হবে। তিনি চাইলে তাকে বেত্রাঘাতও করতে পারেন অথবা কারারুদ্ধও করতে পারেন।[৫৫] বিচারক তাযীরী শাস্তি হিসেবে পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে মিডিয়ার মাধ্যমে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করতে পারবেন, যাতে আসামীকে গ্রেফতার করে আইনের হাতে সোপর্দ করা যায়। হানাফী আইনবেত্তা আল-কাসানী এ পদ্ধতিকে *আল-ইলামুল* মুজাররাদ বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৬]

---

[৫০]. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : হাদীস নং- ১৭১০

[৫১]. আল-মাউসূ*আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ২৭১

[৫২] এ প্রসঙ্গে আব্দুল কাদির আওদাহ বলেন, واما فى عصرنا الحاضر فالتشهير ممكن بإعلان الحاكم فى الصحف أو لصقه فى المجلات العامة দ্রষ্টব্য: *আত-তাশরীউল জিনাঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭০৪

[৫৩]. ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ২০০৬ খ্রি., পৃ. ১১৬; ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০

[৫৪]. ইমাম আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, তা. বি., খ. ১৬ , পৃ. ১৪৫

[৫৫]. ড. আব্দুল আযীয আমির, *আত-তা'যীর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫-৪০৬

[৫৬]. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ১৪৫; আল-কাসানী, *আল-বাদাইউস সানাঈ*, তা. বি., খ. ৭, পৃ. ৬৪-৬৫

৯. বেত্রাঘাত

তাযীরী শাস্তি হিসেবে বিচারক আসামীকে বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিতে পারবেন। কেননা বেত্রাঘাত দ্বারা আসামীকে একমাত্র শিষ্টাচার শিখানো এবং সংশোধন করা উদ্দেশ্য। এটি কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত। যেমন আল্লাহ তাআলা স্ত্রী অবাধ্য হলে পুরুষদেরকে তাদের স্ত্রীদের শিষ্টাচার শেখানোর জন্য বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৫৭] এজন্য আসামীকে বেত্রাঘাত করার ব্যাপারে সকল ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেন। তবে তাকে কয়টি বেত্রাঘাত করতে হবে এ নিয়ে ইসলামী আইনবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তাদের কেউ কেউ তিনটি অথাব দশটি বেত্রাঘাত করার কথা বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, দশের উর্ধে বেত্রাঘাত করা যাবে না।[৫৮] তবে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফিঈর মতে, ৩৯টির উর্ধে বেত্রাঘাত করা যাবে না। কেননা হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "যে অপরাধে হদ্দ নেই, তাতে যে ব্যক্তি হদ্দ পরিমাণ শাস্তি দেবে সে সীমালংঘনকারী হিসেবে বিবেচিত হবে"।[৫৯] ফকীহগণের মতে, হদ্দের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো চল্লিশ বেত্রাঘাত। এজন্য বেত্রাঘাতের ক্ষেত্রে চল্লিশের নীচে ৩৯ বেত্রাঘাত তাযীরের সর্বোচ্চ সীমা। এটি ছড়ি, বেত্র, হাত ও জুতা দ্বারা মারা যেতে পারে।[৬০]

উপসংহার

ইসলামী শরীয়তে মানুষের দীন, বংশ, বিবেকবুদ্ধি, ধনমাল এবং ইজ্জত-আবরু-এ পাঁচটি মৌলিক বিষয় সংরক্ষণ ও এর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য কৃত অপরাধের বিরুদ্ধে শাস্তিদানের চূড়ান্ত বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। ইসলামী শাস্তি বিধানের মধ্যে তাযীর একটি অন্যতম অপরাধ প্রতিরোধক বিধান। তাযীর পর্যায়ের শাস্তিসমূহের ক্ষেত্র বিশাল। এটি নির্দিষ্ট কোন একক শাস্তির সাথে সম্পৃক্ত নয়। এক্ষেত্রে বিচারক আসামীকে যে কোন ধরনের শাস্তি দিতে পারেন। অবশ্য তা কৃত অপরাধের সাথে

---

৫৭. আল-কুরআন, ৪ : ৩

وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

৫৮. ইব কুদামা, *আল-মুগনী ফীল ফিক্হ*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০৩, খ. ১০, পৃ. ৩৪৭

৫৯. আল-বায়হাকী, *আস-সুনাতুল কুবরা*, তা. বি. খ. ......, পৃ. ......

৬০. ড. আহমাদ আলী, *ইসলামের শাস্তি বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫-৩১৬; *মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮; *আল-বাদাইউস সানাঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৬৪-৬৫; ইবনে কুদামা, *আল-মুগনী ফীল-ফিক্হ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩৪৭

সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। আর এ শাস্তির লক্ষ্য হবে সামষ্টিক কল্যাণ, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা কায়েম করা এবং সর্বপ্রকার জুলুম ও সামাজিক অনাচার প্রতিহত করা। সুতরাং অপরাধ প্রতিরোধে তাযীরী শাস্তির গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা, মানুষের মৌলিক বিষয় তথা জান-মাল, ইজ্জত-অবরু ও দীন সংরক্ষণ সুনিশ্চিত হয়ে থাকে।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮ সংখ্যা-৩১
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১২

ব্যভিচার প্রতিরোধে প্রচলিত ও ইসলামী আইন : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

ড. মো. শফিকুল ইসলাম*

[সারসংক্ষেপ: *ব্যভিচার একটি চরম ঘৃণিত সামাজিক অপরাধ। সমাজে নৈতিক বিপর্যয়, পারিবারিক ভাঙ্গন এবং চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। ব্যভিচার পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির কাছে অত্যন্ত কদর্য ও ঘৃণিত কাজ হিসেবে স্বীকৃত। সামাজিক সম্প্রীতি ও শৃংখলা বিনষ্টকারী এই জঘন্য অপরাধ হতে ব্যক্তি ও সমাজকে বাঁচানোর লক্ষ্যে যুগে যুগে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আইন রচনা করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজ থেকে এ হীন অপরাধ দূর করা সম্ভব হচ্ছে না; বরং অপরাধ দমনের জন্য যত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে, সমাজে অপরাধীর সংখ্যা যেন ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে । ইসলাম মানব কল্যাণের বিধান হিসাবে অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনের এক চমৎকার পদ্ধতি উল্লেখ করেছে । আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যভিচার প্রতিরোধের জন্য মানবরচিত প্রচলিত আইন এবং মহান স্রষ্টা আল্লাহর বিধানে ব্যভিচারের শাস্তির তুলনামূলক পর্যালোচনা করে ইসলামী আইন ও বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে ।]*

ব্যভিচার-এর সংজ্ঞা

ব্যভিচারের আরবী প্রতিশব্দ যিনা (زنا)। এর আভিধানিক অর্থ-অবৈধ যৌন সংযোগ, (اَلْفُجُوْرُ) পাপাচারিতা, اَلضَّيِّقُ সংকীর্ণতা, الرَّقِى على الشئ উপরে উঠা ইত্যাদি।[১] ব্যভিচার বা যিনা শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ- Adultery; Gooing astray; deviation from the proper cowrse; Transgression; exception to a rule.[২]

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর,* বৈরুতঃ দারুল ফিকর, খ. ৫, তা. বি., পৃ. ২৩১; ইবনে মানযূর, *লিসানুল 'আরাব*, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৩ খ্রি./১৪১৩ হি., খ. ৬, পৃ. ৮৭; আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-মাকরী আল-ফুয়ূমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি., খ. ১, পৃ. ২৫৭; আল-ফীরূযাবাদী, *আল্-কামূসুল মুহীত*, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৪১৩ হি./১৯৯১ খ্রি., খ. ১, পৃ. ২৩১; ড. যাইদ ইবনে আব্দুল করীম, আল-উফূ *আনিল উকূবাতি ফীল ফিকহিল ইসলামী* , রিয়াদঃ দারুল আসিমাহ, ১৪১০ হি., পৃ. ৩২০

২. Ashu Tosh Dev, *Students' Favourite Dictionary*, Bangala to English, Calcutta: Dev Sahitya Kutir Private Ltd. 1986, p. 973

পারিভাষিক অর্থঃ ইসলামী আইনের পরিভাষায়- যিনা-ব্যভিচার হলো অবৈধ সংগমের নাম, যা বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া নারী ও পুরুষ মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে।
ইবনে রুশদ আল-হাফীদ (মৃ. ৫৯৫ হি.) যিনার পারিভাষিক অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, "যিনা এমন যৌন মিলনকে বলা হয় যা বিশুদ্ধ বিবাহ বা রূপক বিবাহ ছাড়া এবং দাসত্বের মালিকানা ব্যতিরেকে সংঘটিত হয়"।[৩]

আমর ইবনে হাযম যিনার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, "যিনা হলো হারাম জেনে যার দিকে তাকানোও বৈধ নয়, তার সাথে সংগম করা, কিংবা যে প্রত্যক্ষভাবে হারাম তার সাথে সংগম করা"।[৪]

সাইয়্যিদ আবুল আলা বলেন, "একজন পুরুষ ও একজন নারীর বিবাহিত স্বামী স্ত্রী হওয়া ছাড়াই যৌন সংগমে লিপ্ত হওয়াকে যিনা বলে"।[৫]
অতএব ব্যভিচার বা যিনা হলো, বৈবাহিক কিংবা দাসত্বের মালিকানা সূত্র ছাড়া প্রাপ্ত বয়স্ক, বিবেক সম্পন্ন পুরুষ ও নারীর মাঝে যৌন সংগম হওয়া।

ক. ব্যভিচার প্রতিরোধে প্রচলিত আইন
বাংলাদেশে যিনা-ব্যভিচার তথা নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বৃটিশ শাসনামলের পূর্বে মোঘল আমলে ভারত উপমহাদেশে ইসলামী ফৌজদারি আইন দেশের সাধারণ আইন ছিল। বৃটিশ শাসনামলে বিভিন্নভাবে ফৌজদারি আইন সংস্কার সাধিত হয়েছে এবং সর্বশেষ The Indian Penal Code, ১৮৬০ প্রণীত হলে ইসলামী ফৌজদারি আইন দেশের সাধারণ আইনের মর্যাদা হারায়। পাকিস্তান আমলের পর বাংলাদেশের নতুন চাহিদায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নতুনভাবে আইন প্রণীত হয়ে আসছে। নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ দমনে বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে প্রথম পৃথক একটি আইন (The Cruelty to Women (Deterrent Punishment Ordinance, ১৯৮৩) পাশ হয়। নারী নির্যাতন দমন করার জন্য ফৌজদারি ব্যবস্থায় বাংলাদেশে এটি ছিল প্রথম পদক্ষেপ। নারীর সাথে শিশুর জন্যও ১৯৯৫ সালে ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এ জন্য পাশ করা হয় ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫। নারী ও শিশুর শরীর ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সংঘটিত

---

৩. أما الزنا فهو كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولاشبهة نكاح ولا ملك يمين ইবনে রুশদ আল-হাফীদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ফী নিহাইয়াতিল মুকতাসিদ*, বৈরুতঃ মা'রিফাহ, ১৯৭৮ খ্রি., খ. ২, পৃ. ৪৩৩

৪. فإنه وطئ من لا يحل النظر إلى مجردها مع العلم بالتحريم او هو وطئ محرمة العين আমর ইবনে হাযম, *আল-মুহাল্লা*, মিসরঃ আল-জমহুরিয়া 'আরাবীয়াহ, ১৯৭০ খ্রি./১৩৮৭ হি., খ. ১১, পৃ. ২২৯।

৫. *তাফহীমূল কুরআন*, অনুবাদ : মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৯ খ্রি., খ. ৯, পৃ. ৭০

বিভিন্ন অপরাধ দমনের জন্য ২০০০ সালে নতুন একটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন পাশ হয়।

সাধারণভাবে বিবাহ-বর্হিভূত দৈহিক মিলন তথা নারী ও পুরুষের যৌন সম্পর্ক শাস্তি যোগ্য অপরাধ। প্রচলিত আইনে এই অবৈধ সম্পর্ককে প্রকৃতিভেদে চারভাগে বিভক্ত করে তাদের সংজ্ঞা ও শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হলো :

১. ধর্ষণ (Rape)
২. ব্যভিচার (Adultery)
৩. প্রতারণামূলকভাবে বৈধ বিবাহের বিশ্বাসে প্ররোচিত করে দৈহিক মিলন।(Cohabition caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage)
৪.অজাচার (Incest)

১. ধর্ষণ (Rape)

সাধারণত বিবাহ বহির্ভূত নারী ও পুরুষের দৈহিক মিলনকে ধর্ষণ বলা হলেও প্রচলিত আইনে ধর্ষণের একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে। ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধিতে ধর্ষণকে নিম্নরূপে The Penal Code, 1860, Section-375 সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে– কোন পুরুষ নিম্নোক্ত পাঁচটির যে কোন অবস্থায় কোন স্ত্রীলোকের সাথে যৌনসঙ্গম করলে সে ধর্ষণ করেছে বলে গণ্য হবে। **প্রথমত** ঃ স্ত্রীলোকটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে; **দ্বিতীয়ত** ঃ স্ত্রীলোকটির সম্মতি ব্যতীত; **তৃতীয়ত** ঃ স্ত্রীলোকটির সম্মতিক্রমেই কিন্তু মৃত্যুর বা আঘাতের ভয় দেখায়ে তার সম্মতি আদায় করা হলে; **চতুর্থত** ঃ স্ত্রীলোকটির সম্মতিক্রমেই কিন্তু পুরুষটি জানে যে, সে স্ত্রীলোকটির স্বামী নয় এবং পুরুষ লোকটি এও জানে যে, স্ত্রীলোকটি তাকে এমন অন্য একজন পুরুষ বলে ভুল করেছে, যে পুরুষটির সাথে সে আইন সম্মতভাবে বিবাহিত হয়েছে বা বিবাহিত বলে বিশ্বাস করে; **পঞ্চমত** ঃ স্ত্রীলোকটির সম্মতিক্রমে কিংবা সম্মতি ব্যতীত, যদি স্ত্রীলোকটির বয়স ১৪ বছরের কম হয়। **ব্যতিক্রম** ঃ কোন পুরুষের নিজ স্ত্রীর সাথে যৌনসঙ্গম ধর্ষণ নয়, যদি স্ত্রী ১৩ বছরের কম বয়স্কা না হয়। [৬]

---

৬. A man is said to commit "Rape" who except in the case hereinafter excepted, has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the five following descriptions: First: Against her will. Secondly: Without her consent. Thirdly: With her consent, when her consent has been obtained by putting her in fear of death, or of hurt.Fourthly: With her consent, when the man knows that he is not her husband, and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married. Fifthly: With or without her consent, when she is under fourteen years of

ধর্ষণ বিষয়ক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যদি কোন পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত ১৪ বা তার অধিক বয়স্কা কোন নারীর সাথে তার সম্মতিতে যৌন সঙ্গম করে, তাহলে উক্ত নারীকে ধর্ষণ করেছে বলে গণ্য হবে না। তবে মহিলাটির স্বতঃপ্রবৃত্ত সম্মতি ছাড়া যৌন সঙ্গম করা হলে তা ধর্ষণের সামিল। ধর্ষণের এই সংজ্ঞায় বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্ষতিগ্রস্ত মহিলার বয়স যদি ১৪ বছরের কম হয় তাহলে সম্মতি প্রদান করলেও এর আইনগত কোন মূল্য নেই। এছাড়া বিবাহিতা স্ত্রীর বয়স যদি ১৩ বছরের কম হয় তবে তার সাথে স্বাভাবিক সহবাসও ধর্ষণ হিসেবে গণ্য হবে। এরূপ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুই বৎসরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।[৭]

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ৯ ধারায় বর্ণিত ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু ইত্যাদির দণ্ড নিম্নরূপ:

- ধর্ষণের শাস্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।
- ধর্ষণ বা ধর্ষণ পরবর্তী কার্যকলাপে মৃত্যু ও শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড।
- দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের ফলে মৃত্যুর শাস্তি প্রত্যেকের মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড।
- ধর্ষণে মৃত্যু ঘটানো বা আহত করার চেষ্টার শাস্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।
- ধর্ষণের চেষ্টার শাস্তি ৫-১০ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।[৮]

২.ব্যভিচার (Adultery)

The Penal Code, 1860, Section-497 এ ব্যভিচারেব সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি অন্যের স্ত্রীর সাথে তার স্বামীর সম্মতি তথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ব্যতীত যৌন সঙ্গম সম্পন্ন করে তবে তাকে ব্যভিচার বলা হবে।[৯] প্রচলিত

---

age. Explanation: Penetration is sufficient to constitute the sexual intercourse necessary to the offence of rape. Exception: Sexual intercourse by a man with his wife, the wife not being under thirteen years of age is not rape. *The Penal Code*, 1860, Section 375; মুহাম্মদ সাইফুল আলম, *দণ্ডবিধি*, ঢাকা : নয়া দুনিয়া পাবলিকেশন, তা. বি., পৃ.৩১২-৩১৩; অধ্যাপক এ.টি.এম. কামরুল ইসলাম, *দণ্ডবিধি*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, তা. বি., পৃ. ১৮৯-১৯০

[৭]. *The Penal Code*, 1860, Section 375; মুহাম্মদ সাইফুল আলম, *দণ্ড বিধি*, পৃ. ৩১৫-৩২০; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০, ধারা ৯

[৮]. প্রাগুক্ত

[৯]. *The Penal Code*, 1860, Section 497; মুহাম্মদ সাইফুল আলম, *দণ্ডবিধি*, পৃ.৪২৫-৪২৬; অধ্যাপক এ.টি.এম. কামরুল ইসলাম, *দণ্ডবিধি*, পৃ. ২৪৭

এই আইনে ব্যভিচারের জন্য পুরুষকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও মহিলাকে অপরাধী বলা হয়নি বা তার কোন শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এই আইনে শুধু পুরুষ লোকটির শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর শাস্তি সর্বাধিক ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়দণ্ড। ব্যভিচারে অংশগ্রহণকারীনি মহিলাকে ব্যভিচারের সহযোগী হিসেবে দণ্ডিত করা যায় না।[১০]

৩. প্রতারণামূলকভাবে বৈধ বিবাহের বিশ্বাসে প্ররোচিত করে কোন ব্যক্তি কর্তৃক দৈহিক মিলন (Cohabition caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage)

The Penal Code,1860, Section-493 -এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, কোন পুরুষ কর্তৃক প্রতারণামূলকভাবে কোন নারীকে তার সাথে বৈধ বিবাহের বিশ্বাসে প্ররোচিত করে তার সাথে স্বামী -স্ত্রী হিসাবে দৈহিক মিলন ঘটালে ঐ পুরুষটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটিত করে। এ অপরাধের শাস্তি সর্বাধিক ১০ বছর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।[১১]

৪.অজাচার (Incest)

মুসলিম পারিবারিক আইনে যে সকল নারীকে বিবাহ করা অবৈধ এমন নিকটাত্মীয়ের সাথে দৈহিক মিলনকে অজাচার বলে। ইসলামী আইনে এরূপ ব্যভিচার অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি অত্যন্ত ঘৃণিত অপকর্ম। কন্যা, পুত্রের কন্যা, বোন, বোনের কন্যা ইত্যাদির সাথে এরূপ ঘটনা একপাক্ষিক বা দ্বিপাক্ষিক হতে পারে। ইংল্যান্ডসহ অনেক পাশ্চাত্য দেশে এ ধরনের ঘটনা শাস্তিযোগ্য হলেও বাংলাদেশে তা শাস্তিযোগ্য নয়।

খ. ব্যভিচার প্রতিরোধে ইসলামী আইন

ইসলামী আইনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো মানব জাতিকে অন্যায়ের পথ থেকে ফিরানো। তাই যে সব কারণে ব্যভিচারের মত জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হয় ইসলাম প্রথমে সেগুলোকে বন্ধ করতে চায়। ইসলাম প্রথমে মানুষের প্রবৃত্তির সংশোধন করে তার হৃদয়ের মাঝে মহান আল্লাহর ভয় বসিয়ে দেয়। তার মধ্যে আখিরাতে জিজ্ঞাসাবাদের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। তার মধ্যে আল্লাহর আইনের আনুগত্য করার প্রেরণা সৃষ্টি

---

১০. *The Penal Code,* 1860, Section 497.

১১. "Every man who by deceit causes any woman who is not lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him and to cohabit or have sexual intercourse with him in that belief, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine." *The Penal Code,* 1860, Section 493.

করে। এরপর ইসলাম মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজন তথা জৈবিক চাহিদা পূরণের পথকে সুগম ও সহজ করেছে। ইসলাম মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন ও স্বাভাবিক ঝোঁক প্রবণতাকে অধিক গুরুত্ব দেয়। বরং মানব সমাজের প্রসার ও শান্তি-সমৃদ্ধির জন্য স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও মিলনকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছে। যিনি মানুষের মধ্যে জৈবিক প্রবণতা ও শক্তি দিয়েছেন, সেই মহান আল্লাহ তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান দিয়েছেন। এজন্য মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা দমন করা নয়, বরং সেগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করাই ইসলামের কাম্য। কেউ এক স্ত্রীতে তৃপ্ত না হলে চারটি পর্যন্ত বৈধ স্ত্রী রাখার সুযোগ রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মনের মিল না হলে স্বামীর জন্য তালাক ও স্ত্রীর জন্য 'খুলা'র সুযোগ রয়েছে। আর অমিলের সময় পারিবারিক সালিশ থেকে শুরু করে আদালত পর্যন্ত আপীল করার পথ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। এর ফলে দু'জনের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে, নয়তো স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের বন্ধন মুক্ত হয়ে নিজেদের ইচ্ছে মতো অন্য কোথাও বিয়ে করতে পারে। তারপর ইসলাম সমাজ থেকে এমন সব কার্যকারণ নির্মূল করে দেয় যেগুলো যিনার আগ্রহ ও সৃষ্টি করে। ফৌজদারী আইনে শাস্তি প্রদানের পূর্বে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ এবং নারীদের সাজ-সজ্জা করে বাইরে বের হওয়া বন্ধ করা হয়। ঘরের বাইরে চলার পথে নারী-পুরুষদেরকে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করার হুকুম দিয়ে চোখকে প্রহরাধীন রাখা হচ্ছে, যাতে দৃষ্টি বিনিময় সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি এবং সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ কামচর্চায় পৌঁছতে না পারে। ভিতর-বাইরের যাবতীয় সংশোধন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যেসব দুষ্ট প্রকৃতির লোক বৈধ সুযোগ বাদ দিয়ে অবৈধ পথ অবলম্বন করে নিজের প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করার উপর জোর দেয়, তাদেরকে চরম শাস্তি দেবার সাথে সাথে বহু সংখ্যক লোকের মানসিক অবস্থার সংশোধনের লক্ষেই এ শাস্তির বিধান দিয়েছে। এ শাস্তি নিছক একজন অপরাধীর শাস্তি নয় বরং এটি একটি কার্যকর ঘোষণা যে, মুসলিম সমাজ ব্যভিচারীদের অবাধ বিচরণস্থল নয়।

১. ব্যভিচারের ভয়াবহতা ও পরিণাম সম্পর্কে সতর্কীকরণ

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যভিচার কবীরা গুণাহসমূহের অন্যতম। আল্লাহ তাআলা ব্যভিচারকে অশ্লীল কাজসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন এবং একে অতি গর্হিত পন্থা আখ্যা দিয়েছেন, "তোমরা অবৈধ যৌন-সংযোগের কাছেও যেও না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।"[১২] এ আয়াতে বলা হয়েছে- যিনার কাছেও যেয়ো না। এর অর্থ হলো, যিনার প্রাক্কালীন কার্যাবলী এবং যিনা সহজ ও সম্ভব করে যে কার্যাবলী তা তোমরা নিজেও করো না এবং সমাজেও হতে দিও না।[১৩]

---

১২. আল-কুরআন,১৭:৩২ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

১৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, দিল্লী: ইতিকাদ পাবলিকেশন্স হাউজ, ১৯৯৩ খ্রি., খ. ৫,পৃ. ৪৬৩

আল্লাহ তাআলা যিনা-ব্যভিচারের নিষিদ্ধতার ভয়াবহতা উল্লেখ করার জন্য শিরক, নরহত্যা ও যিনাকে একই পর্যায়ের অপরাধরূপে চিহ্নিত করে বলেন, "আল্লাহর নেক বান্দা তারা, যারা আল্লাহর সাথে অপর কাউকে ইলাহ ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে"।[১৪] এ আয়াতে আল্লাহর সাথে শরীক, অবৈধ হত্যা ও যিনাকে একই পর্যায়ের জঘন্য অপরাধরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, রহমানের বান্দারা এ কাজগুলোর মধ্যে কোন একটিও করতে পারে না। করলে তাঁর অনুগত বান্দারূপে গণ্যই হতে পারে না।[১৫] যিনা-ব্যভিচারের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির লক্ষে মহান আল্লাহ আরো বলেন, "ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিনী নারী অথবা মুশরিক নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিনীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে এবং এদেরকে মুমিনদের জন্য হারাম করা হয়েছে।"[১৬]

আল্লাহ তাআলা ব্যভিচারের শাস্তি প্রকাশ্য ও মুমিনদের উপস্থিতিতে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "ব্যভিচারীদের শাস্তি দেবার সময় মুমিনদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে"।[১৭] মহান আল্লাহর এই নির্দেশের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ব্যভিচারের শাস্তি প্রকাশ্যে এবং মুমিনদের একটি দলের উপস্থিতে কার্যকর করলে সমাজের খারাপ প্রবণতার অধিকারী লোকদের অন্তরে এক প্রচন্ড ভীতির সঞ্চার করবে এবং তারা এ ধরনের আর কোন অপরাধ করার সাহসই পাবে না।[১৮]

রসূলুল্লাহ স.-এর হাদীসেও যিনা-ব্যভিচারের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অনেক সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। আমর ইবনুল আস রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি : "যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে, সেই জাতি দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনে পতিত হবে। আর যে জাতির মধ্যে ঘুষের প্রচলন হবে সেই জাতিকে ভীরুতা ও কাপুরুষতায় গ্রাস করবে"।[১৯] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স. কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! সবচেয়ে বড়

---

[১৪]. আল-কুরআন, ২৫: ৬৮ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

[১৫]. *মা'আরিফুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ.৫০৫

[১৬]. আল-কুরআন, ২৪: ৩ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

[১৭]. আল-কুরআন, ২৪: ২ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

[১৮]. সাইয়্যিদ আবুল আ'লা, *তাফহীমুল কুরআন*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী ১৯৯৩, খ. ৯, পৃ. ১১২-১১৩

[১৯]. مامن قوم يظهر فيهم الزنا الا اخزوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا الا اخذوا بالرعب
শায়খ ওয়ালীউদ্দীন আল্-খতীব তাবরীযী, *আল-মিশকাতুল মাসাবীহ* , দেওবন্দঃ মিরাজ বুক ডিপো, তা.বি., পৃ. ৩১০

পাপ কোনটি? তিনি বললেন, কাউকে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী (শরীক) সাব্যস্ত করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। পুনরায় আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, তুমি এ কারণে তোমার সন্তানকে হত্যা করেছ যে, সে খাদ্যে তোমার সাথে অংশীদার হবে। আবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! এরপর কোনটি ? তিনি বললেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা।[২০] রসূলুল্লাহ স. যিনা-ব্যভিচারের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন, "যতদিন আমার উম্মতের মধ্যে যিনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে না পড়বে, ততদিন তারা কল্যাণে-ই থাকবে। আর তাদের মধ্যে যিনা-ব্যভিচার প্রসার লাভ করলে আল্লাহ তাদের মধ্যে শাস্তি নাযিল করবেন।"[২১] হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ব্যভিচার ইহজগতেও শাস্তির কারণ হয়। রসূলুল্লাহ স. আরো বলেন, "সপ্ত আকাশ এবং সপ্ত পৃথিবী বিবাহিত যিনাকারদের প্রতি অভিছেম্পাত করে। জাহান্নামে এদের লজ্জাস্থান থেকে এমন দুর্গন্ধ ছড়াবে যে, জাহান্নামীরাও এর গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। আগুনের আযাবের সাথে সাথে জাহান্নামে তাদের লাঞ্ছনাও হতে থাকবে"।[২২]

কোন ব্যক্তির মধ্যে ব্যভিচার ও ঈমান একত্র হতে পারে না। আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "ব্যভিচারী ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না। আর চোর মুমিন অবস্থায় চুরি করে না, আর মদ্যপায়ী মুমিন অবস্থায় মদ্যপান করে না"।[২৩] মহান আল্লাহর অপছন্দনীয় ব্যক্তি কারা সেই সম্পর্কে মহানবী স. তাঁর সাহাবীগণের কাছে বর্ণনা দিয়ে বলেন, "চার শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ পছন্দ করেন না : ১. শপথকারী ব্যবসায়ী, ২. গরীব অহংকারী, ৩. বৃদ্ধ ব্যভিচারী, ৪. অত্যাচারী শাসক।"[২৪] ব্যভিচারীদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক পরিণতি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স. সতর্ক করে

---

২০. ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : আস-সারিকু হিনা ইয়াসরিকু আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ১৪২৯/২০০৮, পৃ. ৫৬৬

২১. لا تزال امتى بخير مالم يفش فيهم الزنا فاذا فشافيهم الزنا فاوشك ان يعمهم الله بعذاب আফীফ আবদুল ফাত্তাহ্ তাব্বারা, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, অনু. মু. রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ১১৩

২২. *মাআরিফুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৬৩

২৩. لاَ يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : ইসমুয যুনাহ ওয়া কওলিল্লাহি তাআলা : ওয়ালা ইয়ায়নূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮

২৪. আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রসূল স. বলেন, أَرْبَعَةٌ يَبْغَضُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالشَّيْخُ الزَّانِي وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ ইমাম নাসাঈ, *আস-সুনান* বৈরূত : দারুল মা'আরিফাহ, ১৪২০হি., হাদীস নং ২৫৭৫, খ. ৫, পৃ. ৯১; ইমাম বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, বৈরূত : দারুল কিতাবুল 'ইলমীয়াহ, ১৪১০ হি., হাদীস নং ৪৮৫৩, খ. ৪, পৃ. ২২০।

বলেন, "হে লোক সকল! তোমরা যিনাকে ভয় কর, কেননা যিনার মধ্যে ছয়টি মন্দ পরিণাম রয়েছে : তিনটি দুনিয়াতে এবং তিনটি আখিরাতে। দুনিয়াতে তিনটি হলো- ১. সৌন্দর্যহানি ২. দারিদ্র্য এবং ৩. অকালমৃত্যু। আর আখিরাতের তিনটি হলো- ১. আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি ২. হিসাবে মন্দ পরিণাম এবং ৩. জাহান্নামের শাস্তি।"[২৫] উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, যিনা-ব্যভিচারের কারণে মানবজাতির মূল ভিত্তিই বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই ইসলামী আইনে যিনাকে কবীরা গুনাহ ও 'হদ্দ' তথা বিধিবদ্ধ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অবৈধ যৌন সঙ্গম দাম্পত্য প্রেম ও পারিবারিক জীবনকে ধ্বংস করে। যিনা এমন এক ঘৃণ্য সামাজিক অপরাধ, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহেও তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

২. ইসলামী আইনে ব্যভিচারের শাস্তি

সামাজিক সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী এই জঘন্য অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম অত্যন্ত স্পষ্ট ও কঠোর শাস্তি আরোপ করেছে। ইসলামের এই বিধান যদি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে অবশ্যই সমাজ থেকে ব্যভিচারের মত নিকৃষ্ট অপরাধ উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে। অপরাধ হিসেবে ব্যভিচারের দু'টি স্তর রয়েছে। ব্যভিচারীরা হয় বিবাহিত হবে অথবা অবিবাহিত। বিবাহিতের ব্যভিচার অবিবাহিতের চেয়ে জঘন্য। বিবাহিত ব্যভিচারীদের শাস্তি অবিবাহিত ব্যভিচারীদের চেয়ে কঠোরতম করা হয়েছে, কারণ বিবাহিত ব্যক্তিদের দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতা থাকায় সে এই সব বিষয়ের স্বাদ পূর্বেই গ্রহণ করেছে এবং নিজের প্রবৃত্তির কামনা পূরণ করার জন্য একটি বৈধ মাধ্যম ছিল এবং এরপরও সে অবৈধ মাধ্যম অবলম্বন করেছে। অপরদিকে অবিবাহিত, তার জৈবিক চাহিদা পূরণের কোন উপায় নেই, সে যদি উত্তেজনা ও প্রবৃত্তির তাড়নায় বিপদগামী হয়, সে অবস্থায় মহান আল্লাহ তার জন্য লঘু শাস্তি প্রদান করে তাকে সংশোধনের সুযোগ দিয়েছেন।[২৬] এখানে ব্যভিচারের উভয় স্তরের শাস্তি বর্ণনা করে তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.১. অবিবাহিত ব্যভিচারীদের শাস্তি

যে নারী বা পুরুষ বিবাহিত নয়, তারা যদি যিনার অপরাধ করে তাদের শাস্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, "ব্যভিচারিনী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ এদের প্রত্যেককে

---

[২৫]. يا معشر المسلمين اتقوا الزنا فإن فيه ست خصال ثلاث فى الدنيا وثلاث فى الآخرة فأما التى فى الدنيا فيذهب ببهاء الوجه ويورث الفقر وينقص العمر وأما التى فى الآخرة فيورث السخط وسوء الحساب والخلود فى النار আস্-সুয়ূতী, *জামিউল কাবীর*, তা. বি., খ. ১, পৃ. ২৭৩৫৭; আবূ বকর বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*; আল্-খারায়িতী, *মাবাদিউল আখলাক*, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

[২৬]. সাইয়িদ কুতুব শহীদ, *তাফসীর ফী যিলালীল কুরআন*, তা. বি. খ. ১৪, পৃ. ৯১; *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৭৯

একশটি করে বেত্রাঘাত করো।"[২৭] আলিমগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী স্বাধীন, জ্ঞানী, বালেগ ও অবিবাহিত হলে আলোচ্য আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী তাকে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে। অবশ্য এরপরও শাস্তির অংশ হিসেবে অপরাধীকে একবছরের জন্য নির্বাসিত করা হবে কি না, এ বিষয়ে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি অভিমত দলীলসহ উল্লেখ করা হলোঃ

প্রথম অভিমতঃ অপরাধীকে শুধু একশ বেত্রাঘাত আর তাযির স্বরূপ নির্বাসনের শাস্তি

অবিবাহিত যিনাকারদের শাস্তি সম্পর্কে ইমাম আবূ হানিফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ ও যুফার র. বলেন,[২৮] "অবিবাহিত ব্যভিচারীদেরকে কেবল বেত্রাঘাত করতে হবে। আর তাদেরকে নির্বাসনে দেয়া বিচারকের মতামতের উপর নির্ভর করবে। বিচারক যদি মনে করেন তাদেরকে নির্বাসন দেয়া প্রয়োজন, তাহলে তা করতে পারেন। যেমনভাবে তাদেরকে বন্দী করে রাখা বৈধ যতক্ষণ না সে তাওবা করে।" হানাফী আলিমগণের মতে, অবিবাহিত যিনাকারদের নির্বাসনের শাস্তি হলো (تعزير) তাযীর[২৯] বা বিচারকের বিবেচনাধীন। এটি 'হদ্দ'[৩০] নয়। তাঁরা এ মতের সমর্থনে দলীল ও যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেছেন।

---

২৭. আল-কুরআন, ২৪: ২ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

২৮. ويجلد غير المحصن وليس نفيه بحد وانما هو موكول الى راى الامام ان راى نفيه للدعارة فعل كما يجوز حبسه حتى يحدث توبة *আহকামুল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ৩৩৩; *ফিকহুল ইসলামী*, খ. ৬, পৃ. ৩৯; *ফিকহুস সুন্নাহ*, খ. ২, পৃ. ৫৫৬; *আল-বাদাই আস্-সানাই*, খ. ৭, পৃ. ৩৯

২৯. তাযীর (تعزير) : এটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ তিরস্কার করা, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া, ভদ্র বানানো, নিবৃত্ত করা, সংস্কার করা, উপদেশ দেয়া, সংশোধন করা, শৃংখলা বিধান করা, ইজ্জত-সম্মান করা, সাহায্য-সহযোগিতা করা ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায়- এটা অনির্ধারিত শাস্তি যা আল্লাহর কিংবা মানুষের অধিকার সম্পর্কীয় প্রত্যেক পাপের কারণে ওয়াজিব হয়। তাযীর ইসলামী দণ্ড যা অনির্ধারিত প্রত্যেক অন্যায়ের জন্য, শরীয়ত তার কোন শাস্তি সুনির্দিষ্টভাবে রচনা করে না। সুতরাং ইসলামী শরীয়তে যে সব অপরাধে কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তি বা কাফফারার ব্যবস্থা নেই বরং ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান বা তাঁর মনোনীত বিচারক অপরাধ ভেদে শাস্তি নির্ধারণ করে থাকেন এমন শাস্তি কেই তাযীর বলা হয়। যেমন-ঘুষ গ্রহণ, সুদী কারবার করা, আমানতের খিয়ানত করা, ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা করা, অপরাধীদের আত্মগোপনে সাহায্য করা ইত্যাদি। এছাড়া যেসব অপরাধের 'হদ্দ' সুনির্দিষ্ট কিন্তু তার প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়নি তাও এ তাযীর হিসেবে গণ্য। দ্র. ইবনে মানযুর আল-আফ্রিকী আল-মিসরী, *লিসানুল আরব*, বৈরুতঃ দারু সাদির, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ৫৬১; ড. যায়িদ ইবনে আব্দুল করীম, *আল-আফউ আনিল ওকুবাত ফীল ফিকহিল ইসলামী* , রিয়াদঃ দারুল আম্মা, ১৪০০ হি., পৃ. ২৮২; *ফাতহুল কাদীর*, খ. ৪, পৃ. ৪১২; *কিতাবুল ফিকহি আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ*, তা. বি., খ. ৫, পৃ. ৩৪৯; *আল্-'উকূবাতু ফীল ফিকহিল ইসলামী*, তা. বি., পৃ. ১২৯; *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, খ. ৫, পৃ. ৩৪২

৩০. 'হদ্দ': এটি আরবী শব্দ। এর বহুবচন হুদূদ। আভিধানিক অর্থ-প্রতিরোধ, বাধাদান, চৌহদ্দী, দু'টি বিষয় বা বস্তুর মধ্যকার প্রতিবন্ধক, যা একটিকে অপরটি হতে পৃথক রাখে। শরীয়তের পরিভাষায়-

প্রথম দলীল: অবিবাহিত যিনাকারদের নির্বাসন করা 'হদ্দ' না হবার দলীল মহান আল্লাহর বাণী (ব্যভিচারিনী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ এদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত করো।)[৩১] এই আয়াতে যিনাকারীদের প্রাপ্য শরীয়ী শাস্তি এটাই অনিবার্য করে। আর এটাও প্রমাণ করে যে, এ শাস্তিই হচ্ছে পূর্ণ 'হদ্দ'। অতএব আমরা যদি বেত্রাঘাতের সঙ্গে নির্বাসনকে 'হদ্দ' ধরে নিই তাহলে তা হবে শরীয়তের অকাট্য দলীলের উপর খানিকটা বাড়াবাড়ি করা। কিন্তু তা বৈধ নয়। কারণ এতে পবিত্র কুরআনের উপর একটি অতিরিক্ত হুকুম চাপিয়ে দেয়া হয়। যার অর্থ হয়, "কুরআনের হুকুমকে হাদীস দ্বারা রহিত করা।" অথচ খবরে ওয়াহিদ (خبر واحد) দ্বারা কুরআনের হুকুম রহিত করা জায়েয নয়।[৩২]

দ্বিতীয় দলীল: একবার মদ্যপানের অপরাধে খলীফা উমর ইবনে খাত্তাব রা. রবীআ ইবনে উমাইয়া নামক এক ব্যক্তিকে খায়বারে নির্বাসিত করেছিলেন। তখন সে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং খৃস্টান হয়ে যায়। উমর রা. তখন এ সম্পর্কে অবগত হয়ে বললেন, "আল্লাহর শপথ! আমি আর কখনো কোন মুসলমানকে নির্বাসিত করবো না।"[৩৩]

তিনি যিনার শাস্তিকে পৃথকভাবে বর্ণনা করেন নি। বস্তুত: নির্বাসন যদি 'হদ্দ' বা শরীয়তের নির্ধারিত বিধান হতো তা হলে তা না করার জন্য উমর রা. এরূপ শপথ করতেন না।

তৃতীয় দলীল: আলী রা. অবিবাহিতদের যিনার শাস্তি প্রসঙ্গে বলেন, "তাদের দু'জনকে বেত্রাঘাত করা হবে, তবে নির্বাসিত করা হবে না। কেননা তাদেরকে নির্বাসিত করাতে ফেতনা আছে।"[৩৪]

আল্লাহর অধিকার লংঘনের দায়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে অথবা তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যে শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তা কম বেশী বা মাফ করার অধিকার কোন মানুষের নেই এমন শাস্তিকে 'হদ্দ' বলে। ইসলামী শরীয়তে হদ্দযোগ্য অপরাধ সাতটি। ১. ব্যভিচার ২. ব্যভিচারের অপবাদ ৩. চুরি ৪. ডাকাতি ৫. মদ্যপান ৬. ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ বা রাষ্ট্র দ্রোহিতা, ৭. মুরতাদ তথা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ। দ্র. *আল-'উকূবাতু ফীল ফিকহীল ইসলামী*, পৃ. ১২৩-১২৪; আব্দুর রহমান আল-জাযায়িরী, *কিতাবুল ফিকহি আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি., খ. ৫, পৃ. ১১-১২, সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১ খ্রি., খ. ৫, পৃ. ২৬৩-২৬৭; সম্পাদনা বোর্ড, গাজী শামছুর রহমান, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি., খ. ১, পৃ. ২৪২; *মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন*, পৃ. ৫৮-৬১; মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ২০৩-২০৪

৩১. আল-কুরআন, ২৪: ২ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

৩২. *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫০৬; *আল্-বাদাই আস্-সানাই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৯

৩৩. والله لا اغرب بعده مسلما *তাফসীরে মাযহারী*, তা. বি., খ. ৮, পৃ. ৫১০; *আহকামুল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ৩৩৪

৩৪. يجلدان ولا ينفيان وان نفيهما من الفتنة তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫০৯

চতুর্থ দলীল: উবায়দুল্লাহ নাফে র. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণনা করেন, "তাঁর এক দাসী যিনা করে, তাকে তিনি বেত্রাঘাত করেন কিন্তু নির্বাসনে পাঠান নি।"[৩৫]

পঞ্চম দলীল: আবূ হুরায়রা, শাবিল ও যায়িদ ইবনে খালিদ রা. দাসীদের যিনার শাস্তি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স. হতে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ স. বলেন, " তোমাদের কোন দাসী যদি ব্যভিচার করে, তখন তাকে বেত্রাঘাত করো। সে পুনরায় ব্যভিচার করলে তাকে আবারও বেত্রাঘাত করবে। এরপরও ব্যভিচার করলে, তাকে বেত্রাঘাত কর। অত:পর তাকে বিক্রয় করে দাও, যদিও দাফিরের (সামান্য মূল্যে) বিনিময়ে হয়।"[৩৬] এ হাদীস পর্যালোচনা করলে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয় :

ক. নির্বাসন দেয়া যদি 'হদ্দ' হতো তাহলে বেত্রাঘাতের সঙ্গে রসূলুল্লাহ স. তা বর্ণনা করতেন।

খ. এ হাদীস দ্বারা ব্যভিচারিনী দাসীকে নির্বাসনের শাস্তি দেয়ার নির্দেশ বাতিল প্রমাণিত হয়। আর যখন দাসীর নির্বাসনের শাস্তি বাতিল হলো, তখন আযাদ ও মুক্ত মহিলার নির্বাসনের শাস্তিও বাতিল হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন, "দাসীরা যদি ব্যভিচার করে, তবে তাদের উপর বিবাহিতা আযাদ মহিলাদের শাস্তির অর্ধেক শাস্তি হবে।"[৩৭] সুতরাং যখন দাসীর বেত্রাঘাত আযাদ মহিলাদের হদ্দের অর্ধেক এবং নবী স. দাসীদের শাস্তি হিসেবে বেত্রাঘাতের কথা বলেছেন কিন্তু দেশান্তরের কথা বলেননি তাতে প্রমাণিত হলো যে, আযাদ মহিলার 'হদ্দ' হলো বেত্রাঘাত, নির্বাসন 'হদ্দ' নয়।[৩৮]

গ. দাসী যিনা করলে রসূলুল্লাহ স. তাকে বিক্রয় করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর বেত্রাঘাত করার পর নির্বাসন করা জরুরী হলে দাসী তখন বিক্রেতার হাতে থাকবে না এবং ক্রেতাও তাকে হস্তগত করতে পারবে না। আর রসূলুল্লাহ স.-এর পক্ষে এটা অসম্ভব যে, তিনি বিক্রেতাকে এমন বস্তু বিক্রয় করার জন্য নির্দেশ দিবেন যে, ক্রেতা তাকে বিক্রেতা থেকে হস্তগত করতে সক্ষম হবে না।[৩৯]

দ্বিতীয় অভিমত: একশত বেত্রাঘাত ও একবছরের নির্বাসন

ইমাম ইবনে আবি লায়লা, মালিক, আওযায়ী, সাওরী, হাসান ইবনে সালিহ, শাফিঈ ও আহমদ ইবনে হাম্বল র. অবিবাহিত যিনাকারদের শাস্তি প্রসঙ্গে বলেন, অবিবাহিত ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারীকে একশত বেত্রাঘাতের পর উভয়কে একবছরের জন্য

---

৩৫. ان امة له زنت فجلدها ولم ينفها *প্রাগুক্ত*

৩৬. اذا زنت فليجلدها, فإن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها, ثم بيعوها ولو بضفير . *প্রাগুক্ত*

৩৭. আল-কুরআন, ৪: ২৫ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

৩৮. *আহকামুল কুরআন*, তা. বি., খ. ৩, পৃ. ৩৩৪; *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫০৫

৩৯. *প্রাগুক্ত*

নির্বাসিত করতে হবে।"[৪০] নির্বাসিত হতে হবে এত দূরে যেখানে কসর করতে হয়। ইমাম শাফিঈ র. এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, দাসকে অর্ধবছর নির্বাসন দিতে হবে।[৪১] ব্যভিচারিনীকে একাকী নির্বাসন দেয়া যাবে না, বরং তার স্বামী বা তার কোন মাহ্‌রামের সাথে নির্বাসন দিতে হবে। এ মতের সমর্থনে তাঁরা নিম্নোক্ত দলীলসমূহ উপস্থাপন করেন।

প্রথম দলীল: উবাদা ইবনে সামিত রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেন, "তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো। তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য একটি পথ করে দিয়েছেন। অবিবাহিত-অবিবাহিতার যিনার শাস্তি একশত বেত্র ঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন দণ্ড।"[৪২]

দ্বিতীয় দলীল: আবূ হুরায়রা ও যায়িদ ইবনে খালিদ রা. বলেন, একবার এক বেদুঈন রসূলুল্লাহ স.-এর খিদমতে হাজির হয়ে বলল, আমার ছেলে এই লোকটির মজুর ছিল। ছেলেটি তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। আমাকে জানানো হয়েছে যে, এই অপরাধের দরুন আমার পুত্রের শাস্তি হচ্ছে 'রজম'-পাথর নিক্ষেপে হত্যা। তখন আমি এ শাস্তি হতে পুত্রকে বাঁচাবার জন্য একশত বকরী ও আমার একটি বাঁদী মুক্তিপণ হিসেবে তাকে দিয়েছি। কিন্তু পরে আমি আলিমগণের কাছে জিজ্ঞেস করলে তারা আমাকে জানালেন, আমার পুত্রের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর এই ব্যক্তির স্ত্রীর উপর রজম-এর শাস্তি। একথা শোনার পর রসূলুল্লাহ স. বললেন, "সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা করবো। তোমার বকরী ও বাঁদী তোমাকে ফেরত দেয়া হবে। তোমার পুত্রের শাস্তি হচ্ছে একশ বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। হে উনাইস! তুমি এই ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যাও যদি সে ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার করে, তবে তাকে 'রজম' করো। উনাইস রা. তাকে জিজ্ঞেস করলে সে ব্যভিচারের কথা স্বীকার করলো। অত:পর তাকে তিনি 'রজম' করেন।"[৪৩]

---

৪০. *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৩৩; *নিহায়াতুল মুহতাজ*, তা. বি., খ. ৭, পৃ. ৪২৮-৪২৯; *ফিকহুল ইসলামী*, তা. বি., খ. ৬, পৃ. ৩৯; ইমাম শাফিঈ, *কিতাবুল উম্ম*, বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৩৯৩ হি., খ. ৬, পৃ. ১৪৬; মহীউদ্দীন ইয়াহিয়া আন-নবূবী, *রাওযাতুত তালিবীন ওয়া ইমদাতুল মুফতীন*, বৈরুত: মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি., খ. ১০, পৃ. ৮৭; সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, বৈরুত, শিরকাতু মানার লিলদাওলীয়াহ, ১৯৯৫ খ্রি., খ. ২, পৃ. ৫৫৫; ইব্রাহীম আহমদ আল্‌-আনসারী আল্‌-ওয়াকাফী, *তিলকা হুদূদাল্লাহ*, পাকিস্তান: দারুল ইলম, ১৯৮৩ খ্রি., পৃ. ৫৯

৪১. *প্রাগুক্ত*

৪২. خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيل البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ইমাম মুসলিম, *আস্‌-সহীহ লি-মুসলিম*, লাহোর: শায়খ গোলাম আলী ইনাদ, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৭৩; *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫০৮; *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৩৩

৪৩. والذى نفسى بيده لاقضين بينكم بكتاب الله ماغنمك وجاريتك فرد عليك واما ابنك فعليه جلد مأية وتغريب عام واما انت يا انيس فاعد على امراة هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت

তৃতীয় দলীল: একথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, খলীফা আবূ বকর রা. অবিবাহিত যিনাকারকে বেত্রাঘাত করার পর সিরিয়ায় নির্বাসন দিয়েছেন। আবার কখনো কখনো অপরাধীকে বেত্রাঘাত করার পর ফিদাকের দিকেও নির্বাসনে পাঠিয়েছেন।[৪৪] অতএব উপরোক্ত দলীলসমূহের আলোকে বলা যায়, অবিবাহিত যিনাকারের উপর একশত বেত্রাঘাত ও সেই সাথে একবছরের নির্বাসনের শাস্তিও কার্যকর করতে হবে।

তৃতীয় অভিমত: একশ বেত্রাঘাত ও শুধু পুরুষ যিনাকারীকে নির্বাসন

ইমাম মালিক ও আওযায়ী র. এর অভিমত হলো, "পুরুষ যিনাকারীকে বেত্রাঘাতের পর নির্বাসন দিতে হবে, কিন্তু মহিলা এবং দাসীকে নির্বাসন দেয়া যাবে না। আর যাকে দেশান্তর করা হবে তাকে ঐ স্থানে বন্দী অবস্থায় রাখতে হবে।"[৪৫]

দলীল ও যুক্তি: ব্যভিচারিনী মহিলাকে একাকী বিদেশে নির্বাসন দেয়া হলে সে সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিতা হয়ে যাবে। আর শরীয়তের বিধান মত নির্বাসন দেয়া হলে একজন মাহরাম[৪৬] পুরুষ তার সঙ্গে দিতে হবে। কেননা রসূলুল্লাহ স. বলেন, "কোন

فرجمها *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫০৩-৫০৪; *ফিকহুল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪০; *আল্-'উকূবাতু ফীল ফিকহিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

[৪৪]. *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫০৩

[৪৫]. ينفى الرجل ولا تنفى المرأة ولا العبد ومن نفى حبس فى الموضع الذى ينفسى اليه *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৩৩; *ফিকহুল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৯; *ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৫৬

[৪৬]. মাহরাম : মহান আল্লাহ মানব বংশধারা অব্যাহত রাখার জন্য বৈবাহিক পন্থার প্রচলন করেছেন। খোদায়ী বিধান অনুযায়ী পুরুষের পক্ষে যে সব নারীকে বিবাহ করা হারাম তথা অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে শরীয়তের পরিভাষায় তাদেরকে মাহরাম বলা হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا মাহরাম তিন প্রকার : ১. মাহরাম বিন নসব (বংশ ও রক্ত সম্পর্কের কারণে নিষিদ্ধ) ২. মাহরাম বির-রাযাআত (স্তন্য সম্পর্কীয় কারণে নিষিদ্ধ) ৩. মাহরাম বিস সিহরিয়্যা (বৈবাহিক সম্পর্কীয় কারণে নিষিদ্ধ) মাহরাম বিন-নসব সাত প্রকার। যথা: ১. মাতাবর্গ (امهات) ২. কন্যাবর্গ (بنات) ৩. ভগ্নীবর্গ (اخوات) ৪. ফুফুবর্গ (عمات) ৫. খালাবর্গ (خلات) ৬. ভ্রাতুষ্পুত্রী বর্গ (بنات الاخ) ৭. ভগ্নীর কন্যাবর্গ (بنات الاخت) মাহরাম বির-রাযা'আত দুই প্রকার। ১. দুধমাতাবর্গ (امهات ا رضعن) ২. দুধ ভগ্নীবর্গ (اخوات من الرضاعة)। উল্লেখ্য যে, বংশ ও রক্তের সম্পর্কের কারণে যে সাত প্রকার পুরুষ ও নারীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম, দুগ্ধ পানের কারণেও উক্ত সাত প্রকার পুরুষ ও নারীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম। মাহরাম বিস-সিহরিয়্যা পাঁচ প্রকার। যথা- ১. স্ত্রীর মাতৃবর্গ

ঈমানদার মহিলার পক্ষে মাহরাম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া তিন দিনের দূরত্বের পথ সফর করা জায়েয নয়।"[৪৭] আর কোন মাহরাম পুরুষকে তার সাথে নির্বাসিত করা হলে- অপরাধী নয় এমন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হবে। অথচ তা আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী কেননা। কেননা কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে, "কোন বোঝা বহনকারীই অন্যের বোঝা বহন করতে বাধ্য হবে না।"[৪৮] মজুরী বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যদি কাউকে এভাবে অন্যের কারণে শাস্তি প্রদান করা হয় তাহলেও তা হবে এমন একটা দায়িত্বের বোঝা চাপানো যা শরীয়ত সমর্থন করে না। অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, বিদেশে নির্বাসনের শাস্তি কেবলমাত্র পুরুষ যিনাকারীকেই দেয়া যেতে পারে; কোন মহিলা যেনাকারকে নয়।

অবিবাহিত যিনাকারদের শাস্তি সম্পর্কে উপরোক্ত অভিমতসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন পূর্বক আমরা বলতে পারি যে, ইমাম বা বিচারক যদি অপরাধীকে একশ বেত্রাঘাত করার পর নির্বাসনে পাঠানো প্রয়োজন মনে করেন তবে নির্বাসিত করাও জায়েয আছে। রসূলুল্লাহ স. আবূ বকর, উমর ও উসমান রা. হতে নির্বাসন করা সম্পর্কে যেসব বর্ণনা এসেছে, তা এরূপ পরিস্থিতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

২.২. বিবাহিত ব্যভিচারীদের শাস্তি

ইসলামী আইনে বিবাহিত ব্যভিচারীদের শাস্তি কি হবে এ ব্যাপারে তিনটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়।

১. 'রজম' বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা, ২. অবিবাহিতদের অনুরূপ শুধু একশত বেত্রাঘাত, ৩. একশত বেত্রাঘাত ও 'রজম'। নিচে সকল দলের অভিমত দলীলসহ উল্লেখ করা হলো-

---

(امهات نساء) ২. স্ত্রীর অন্য স্বামীর কন্যাবর্গ, ৩. দুই বোনকে একত্রে বিবাহ, ৪. বিমাতাবর্গ ৫. পুত্রবধূবর্গ। উপরোক্ত চৌদ্দ শ্রেণী ব্যতীত আরো যাদেরকে বিবাহ করা হারাম তারা হলো- ১. অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী ২. মুশরিক নারী ৩. তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী ৪. সমলিঙ্গের সাথে বিবাহ ৫. অমানবের সাথে বিবাহ (জ্বীন পরী বা মানবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অথবা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ অন্য কোন প্রাণীকে) ৬. লি'আন তথা নিজ স্ত্রীকে যেনার অপবাদ আরোপ করলে ৭. মুহাররামাত বিল মিল্ক তথা স্বাধীনা মহিলা কোন ক্রীতদাসকে বিবাহ করা। ৮. মুহাররমাত বিল জমা তথা চারজন স্ত্রী বর্তমান থাকতে অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ। ৯. স্ত্রীর বোন, খালা, ফুফু, বোনের মেয়ে, ভাইয়ের মেয়েদেরকেও স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় বিবাহ করা হারাম। এক্ষেত্রে মূলনীতি হল, কোন পুরুষ দুইজন মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে একসাথে বিবাহাধীন রাখতে পারবে না যাদের একজনকে পুরুষ ধরে নিলে অপর জনের সঙ্গে বিবাহ হতে পারে না। দ্র. আল-কুরআন, ৪:২৩-২৪; আল-কুরআন, ২:২২১; *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৮৮-৯২; *আনওয়ারুত তানযীল*, অ. বি., খ. ৩, পৃ. ২৫-২৬

[৪৭]. لا تسافر المرأة ثلاثة ايام الا مع زى محرم ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আত-তাকসীর, অনুচ্ছেদ : ফী কাম ইয়াকসিরুস সালাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

[৪৮]. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬-২২৭

প্রথম অভিমত : বিবাহিত ব্যভিচারীদের প্রস্তরাঘাতে হত্যা

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের সকল আলিম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, বিবাহিতা নারী (মুহসিন)[৪৯] ব্যভিচার করলে তার শাস্তি হলো প্রস্তরাঘাতে হত্যা।[৫০] নিচে এ অভিমতের সপক্ষে দলীল উপস্থাপন করা হলো।

প্রথম দলীল : উমর রা. বলেন, "মহান আল্লাহ মুহাম্মদ স.-কে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর ওপর কিতাব নাযিল করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁর ওপর যে সব আয়াত নাযিল করেছেন, তার মধ্যে 'রজম' সম্পর্কিত আয়াত ও রয়েছে। রসূলুল্লাহ স. 'রজম' করেছেন এবং আমরাও তাঁর (ইনতিকালের) পরে 'রজম' করেছি। বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা মহিলার ব্যভিচার প্রমাণিত হলে কিংবা গর্ভ প্রকাশ পেলে, অথবা স্বীকারোক্তি পাওয়া গেলে তাকে 'রজম' করার বিধান আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান।"[৫১] উমর রা. বলেন, আমরা রজমের আয়াত পাঠ করেছি ও সংরক্ষণ করে রেখেছি। আয়াতটি হলো- الشيخ والشيخة اذا زنيا فارْجمُوهُمَا البَتَّة نكالا من الله والله عزيز حكيم "উমর রা. আরো বলেন, লোকেরা বলবে, উমর আল্লাহর কিতাবে বৃদ্ধি করেছে, এ আশংকা আমার না থাকলে আমি আল-কুরআনের টীকায় তা অবশ্যই লিখে দিতাম।"[৫২] উমর রা. সাহাবীগণের এক সমাবেশে এ ভাষণটি দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের কেউ তা অস্বীকার করেননি। অতএব বুঝা গেল, 'রজম'- এর আয়াত আল-কুরআনের আয়াত হবার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে। আলিমগণ বলেন, 'রজম' সম্পর্কিত আয়াতের তিলাওয়াত মানসূখ হলেও তার হুকুম মানসূখ হয়নি।

---

৪৯. মুহ্সিনঃ মুহসিন শব্দটি احصان শব্দ হতে উৎপন্ন। এর মাসদার হলো حصن (ح - ص - ن) হিসান। এর আভিধানিক অর্থ, প্রতিরোধ বা বাধা প্রদান করা, দূর্গে প্রবেশ করা ইত্যাদি। তাই মুহ্সিন শব্দের অর্থ দূর্গে বা কিল্লায় প্রবেশকারী। পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত ইহ্সান (مُحْصِن) শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। ১. স্বাধীন বা মুক্ত হওয়া ২. বিবাহিত হওয়া ৩. সতী-সাধ্বী হওয়া ৪. শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী সহবাস করা ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায় 'মুহসিন' বলা হয়, এমন ব্যক্তিকে যার মধ্যে সাতটি গুণ পাওয়া যায়। ১. বুদ্ধিমান হওয়া, ২. বালিগ হওয়া, ৩. স্বাধীন হওয়া, ৪. মুসলমান হওয়া, ৫. সঠিক পদ্ধতিতে বিবাহ হওয়া, ৬. সহীহ বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সঙ্গম সংগঠিত হওয়া, ৭. সহীহ বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় তারা উভয়ে স্বাধীন, বুদ্ধিমান, বালিগ, মুসলমান হবে। দ্র. *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৮২, ৩০৬; *আনওয়ারুত তানযীল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৬; *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৪৮

৫০. *ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৫৬; *আল-বাদাই' আস-সানাই'*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৯; *কিতাবুল উম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৩৯; *ফিকহুল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪০; আব্দুল কাদির 'আওদা, *তাশরীউল জানায়িল ইসলামী*, বৈরুত: মুওয়াসসাসাতুর রিসালা, ১৯৯৩ খ্রি., খ. ২, পৃ. ৩৮৪

৫১. ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فما انزل الله عليه اية الرجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجمنا بعد الرجم فى كتاب الله حق على من زنى اذا احصن من الرجال او البينة او كانت الحبل او الاعراف- *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫১২

৫২. *ফিকহুল সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৫৭

দ্বিতীয় দলীল : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মদ) আল্লাহর রসূল তাকে হত্যা করা কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয়। কিন্তু তিনটি কারণের কোন একটি পাওয়া গেলে তাকে হত্যা করা যাবে : ১. জীবনের পরিবর্তে জীবন অর্থাৎ কিসাস; ২. বিবাহিত ব্যক্তি যিনা করলে এবং ৩. যে ব্যক্তি দীন ইসলাম ত্যাগ করবে তাকে হত্য করা যায়"।[৫৩]

তৃতীয় দলীল : আবূ কিলাবা রা. বলেন, "রসূলুল্লাহ স. কখনও তিনটি কারণের একটি ব্যতীত কাউকে হত্যা করেননি। ১. যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে; ২. যে ব্যক্তি বিবাহের পর ব্যভিচার করেছে এবং ৩. যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলুল্লাহ স. এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং ইসলাম ত্যাগ করেছে।"[৫৪]

চতুর্থ দলীল : আবূ হুরায়রা, ইবনে আব্বাস ও জাবির রা. বলেন, মাইয ইবনে মালিক রসূলুল্লাহ স.-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি যেনা করেছি, আপনি আমাকে পবিত্র করুন। মাইয ইবনে মালিক রা. স্বেচ্ছায় চারবার যেনার কথা স্বীকার করেন। তখন রসূল স. তাঁর কথা যাচাইয়ের পর তাকে 'রজম' করার নির্দেশ দেন।[৫৫]

পঞ্চম দলীল : এ ঘটনা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, রসূলুল্লাহ স. গামেদ গোত্রের এক মহিলাকে 'রজম' করেছিলেন। মহিলাটি রসূলুল্লাহ স.-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে স্বীকার করেছিল যে, সে ব্যভিচারের কারণে গর্ভধারণ করেছে। মহিলাটির সন্তান যখন বুকের দুধ ছাড়া অন্য খাবারে অভ্যস্ত হয়, তখন রসূলুল্লাহ স. তাকে 'রজম' করেন।[৫৬]

ষষ্ঠ দলীল : উসমান রা.-কে যে দিন শহীদ করা হয়, সেদিন তিনি ঘরের বাইরের দিকে তাকিয়ে বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে বলেন,"আমি আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাদের বলছি, তোমরা কি একথা জান না যে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তিনটি কারণের কোন একটি পাওয়া না গেলে কোন মুসলমানের রক্তপাত ঘটানো জায়েয নেই। আর তা হলো : ১. বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচার করা; ২. ইসলাম গ্রহণ করার পর তা পরিত্যাগ করা এবং ৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। আল্লাহর কসম! আমি কখনো ব্যভিচার করিনি, জাহেলী যুগেও না, আর ইসলাম গ্রহণ করার পরেও না। যখন হতে আমি রসূলের স. হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছি, তখন থেকে আমি কখনো ইসলাম

---

৫৩. لايحل دم امراء مسلم يشهد الا اله الا الله وانى رسول الله الا باحداى ثلاث النفس بالنفس والسيب الزانى المارق لدينه التارك للجماعة *ফিকহুল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪০

৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৫

৫৫. *ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৫৭; *আল্-উকূবাতু ফীল ফিকহিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬

৫৬. *প্রাগুক্ত*

ত্যাগ করিনি। আর অন্যায়ভাবে আমি কোন মানুষকে কখনো হত্যা করিনি। বল, আমাকে তোমরা কোন অপরাধে হত্যা করতে চাও?" [৫৭] উপরোক্ত দলীলসমূহসহ অসংখ্য হাদীসের ভিত্তিতে একথা আমাদের কাছে স্পষ্ট যে, বিবাহিত ব্যভিচারীদের শরীয়তের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা।

দ্বিতীয় অভিমত: অবিবাহিত যেনাকারদের শাস্তি শুধু একশ বেত্রাঘাত

বিবাহিত পুরুষ ও নারী যেনা করলে তাদের শাস্তি কী হবে এ প্রসঙ্গে খারিজীরা[৫৮] 'রজম'কে অস্বীকার করে বলেন, "যিনাকার বিবাহিত হোক কি অবিবাহিত, তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত করতে হবে।"[৫৯] খারিজীরা এ ব্যাপারে তিনটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

প্রথম যুক্তি: 'রজম' একটি কঠিন ও নির্মম শাস্তি। যদি এটি শরীয়ত সম্মত হত তাহলে অবশ্যই কুরআনে এ শাস্তির বিষয়টি উল্লেখ থাকত। যেনার শাস্তি ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বিবাহিত ও অবিবাহিতদের মধ্যে পার্থক্য করেননি, বরং বলেছেন (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ)[৬০] এ আয়াতটি সার্বিক, ব্যভিচারী মহিলা ও ব্যভিচারী পুরুষ, বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত হোক উভয়ই সমান।[৬১]

---

[৫৭]. *প্রাগুক্ত*

[৫৮]. **খাওয়ারিজ:** এটি আরবী শব্দ। খাওয়ারিজ শব্দটি বহুবচন। একবচন খারিজ। আভিধানিক অর্থ দলত্যাগী, বহির্ভূত, রাষ্ট্রদ্রোহী ইত্যাদি। খারিজীরা ইসলামের সর্বপ্রথম বিপথগামী সম্প্রদায়। মুসলিম উম্মাহর মূল স্রোতধারা ও ইসলামের সঠিক আক্বীদা থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে তাদেরকে খারিজী বলা হয়। ৬৫৭ খ্রি. আলী রা. ও মুআবিয়া রা. এর মধ্যে সিফ্ফীনের যুদ্ধে সালিশকে কেন্দ্র করে আলীর রা. দল থেকে পৃথক হয়ে যায়। এজন্যই তাদেরকে দলত্যাগী বা খারিজী বলা হয়ে থাকে। এদেরকে হারুরীয়াহও বলা হয়। তাদের 'আক্বীদা হলো ১. কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির ২. আবূ বকর রা. ও উমরকে বা. বৈধ খলীফা মনে করলেও উছমান ও আলীকে রা. তারা অবৈধ খলীফা বলে মনে করে। ৩. তারা আল-কুরআনকেই কেবল ইসলামী আইনের উৎস মনে করে। হাদীস, ইজ্মা ও কিয়াসের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করে। সুতরাং তারা মুরতাদ অথবা বিদ্রোহী। এটি তাদের সম্বন্ধে মুসলিম উম্মাহর সিদ্ধান্ত। দ্র. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭; মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, খ. ১, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ,১৯৯৬ খ্রি., পৃ ৪৯-৫২; মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, *ইসলামী 'আক্বীদাহ*, ঢাকা: আল্-আকাবা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ৩৩১-৩৩২

[৫৯]. ان عقوبة الزنى الجلد فقط, أحصن أو لم يحصن *আল্-উকূবাতু ফিল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ৮৯; *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৪৩।

[৬০]. আল-কুরআন, ২৪: ২

[৬১]. *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০৩; কামাল উদ্দীন ইবনে হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, তা. বি., খ. ১, পৃ. ২৭০; *মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন*, পৃ. ২৯৪-২৯৫

দ্বিতীয় যুক্তি: দাসীর শাস্তি স্বাধীনার অর্ধেক। যেমন আল্লাহ্ বলেন, "দাসীদের উপর মুহসানাহ বা আযাদ মহিলাদের শাস্তির অর্ধেক শাস্তি হবে।"[৬২] যদি মুহসিনের শাস্তি 'রজম' নির্ধারণ করা হয়, তাহলে দাসীর শাস্তি রজমের অর্ধেক কীভাবে প্রদান করা যাবে।

তৃতীয় যুক্তি: সূরাতুন-নূরে ব্যভিচারের শাস্তির কথা এসেছে, তা আমভাবে সকল যিনাকারীর জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু এটাকে শুধু অবিবাহিতের জন্য খাস বা নির্দিষ্ট করা কুরআনের বিধানের খেলাফ।[৬৩]

আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের পক্ষ থেকে খারিজীদের দলীলের জবাব

প্রথম জবাব: আল-কুরআনে রজমের বিধান উল্লেখ না থাকলেই যে তা শরীয়ত সম্মত নয়-এ বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা কুরআনের পাশাপাশি সুন্নাহ্ও শরীয়তের দলীল। সুন্নাহর অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন, "রসূল তোমাদের যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর, আর যা নিষেধ করে তা থেকে তোমরা বিরত থাক।"[৬৪] অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, "সে মনগড়া কথা বলে না। এতো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।"[৬৫] মহান আল্লাহ্ বলেন, "যারা রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।"[৬৬] রসূলুল্লাহ্ স. এর সুন্নাতেই স্পষ্টভাবে 'রজম' এর উল্লেখ রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ স. এর ওফাতের পর খুলাফায়ে রাশেদুন এ আইন কার্যকর করেছেন। 'রজম' এর বিধান মুতাওয়াতির সূত্রেই রসূলুল্লাহ্ স. থেকে প্রমাণিত। তবে এসব হাদীস শব্দগতভাবে মুতাওয়াতির না হলেও অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির।[৬৭]

দ্বিতীয় জবাব: খারিজীদের দ্বিতীয় দলীলের জবাবে বলা যায় যে, তাদের এই মতামত সঠিক নয়। কারণ আয়াতে আযাব (عذاب) দ্বারা 'জালদ' বুঝানো হয়েছে, 'রজম' নয়। মহান আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন যে, রজমের অর্ধেক বা অর্ধমৃত্যু একটি অসম্ভব বিষয়। সুতরাং বিবেক এটাই দাবি করে যে, এর দ্বারা 'জালদ' উদ্দেশ্য, 'রজম' নয়।[৬৮]

---

[৬২]. আল-কুরআন, ৪: ২৫ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

[৬৩]. ড. আহমদ ফাতহী বাহানসী, *আল্-উকূবাতু ফিল ফিকহিল ইসলামী* , প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯০

[৬৪]. আল-কুরআন, ৫৯: ৭ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

[৬৫]. আল-কুরআন, ৫৩: ৩-৪ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

[৬৬]. আল-কুরআন, ২৪: ৬৩ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

[৬৭]. *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫১২; *আল্- 'উকূবাতু ফীল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ৯০

[৬৮]. *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২৫-১২৭

তৃতীয় জবাবঃ খারিজীদের দাবি, যেনার ব্যাপারে কুরআনের বিধান হচ্ছে আম (عام) কিন্তু এটাকে নির্দিষ্ট করা কুরআনের নির্দেশনার বিপরীত। তাদের এ দাবি অজ্ঞতামূলক ও অযৌক্তিক। কেননা আল-কুরআনে অসংখ্য বিধান 'আম' ভাবে এসেছে, আর সুন্নাহ সেটাকে 'খাস' করেছে। যেমন চুরির আয়াত। এটি 'আম', যদি কেউ তুচ্ছ জিনিস যেমন পয়সা,সুচ ইত্যাদি চুরি করে তবে খারিজীদের দাবি অনুযায়ী তার হাত কাটতে হবে। কিন্তু কী পরিমাণ সম্পদ চুরির জন্য হাত কাটা যাবে তা সুন্নাহ নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী "এক দীনার বা দশ দিরহাম ছাড়া চোরের হাত কাটা যাবে না।" [৬৯]

তৃতীয় অভিমতঃ একশ বেত্রাঘাত ও 'রজম'

বিবাহিত পুরুষ ও নারী যেনা করলে তাদের শাস্তি প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, হাসান ও ইবনে মানজার র. বলেন, সূরাতুন নূরের ২নং আয়াত অনুসারে অপরাধীকে প্রথমে বেত্রাঘাত করা হবে। অত:পর তাদেরকে 'রজম' করা হবে। আলোচ্য আয়াত শুধু অবিবাহিতদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নয়, আর মানসূখ বা রহিতও নয়। অত্র আয়াতে যে বেত্রাঘাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা 'হদ্দ' এর অংশ বিশেষ, পূর্ণ 'হদ্দ' নয়। 'হদ্দ'-এর আর এক অংশ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব যেনাকারী অবিবাহিত হলে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে এবং তাকে এক বছরের জন্য নির্বাসনও করতে হবে। আর বিবাহিত হলে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে এবং পরে তাকে 'রজম'ও করতে হবে। নির্বাসন করা সম্পর্কিত হাদীসে যেমন আলোচ্য আয়াতের সাথে কোন বিরোধ নেই বরং হাদীস আয়াতের সম্পূরক, অনুরূপভাবে 'রজম' সম্পর্কিত হাদীস ও আয়াতের সাথে কোন বিরোধ নেই বরং এক্ষেত্রেও হাদীস আয়াতের সম্পূরক। অতএব আয়াত ও হাদীস উভয়ের ওপর আমল করা ওয়াজিব।[৭০] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. স্বীয় মতের সপক্ষে নিম্নের দলীলসমূহ উপস্থাপন করেন।

প্রথম দলীলঃ উবাদা ইবনে সামিত রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিতা মহিলার সাথে ব্যভিচার করলে তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত ও একবছরের জন্য নির্বাসন করতে হবে। আর বিবাহিত পুরুষ বিবাহিতা মহিলার সাথে ব্যভিচার করলে তাদেরকে একশত করে বেত্রাঘাত ও 'রজম' করতে হবে।'[৭১]

---

৬৯. لا قطع اليد الا فى دينار او عشرة دراهم *শারহু ফাতহিল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১১; *মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

৭০. ইবনে হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, রিয়াদঃ দারুল ইফতা, ১৪০১ হি., খ. ১২, পৃ. ১১৯; আহমদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ*, তা. বি., খ. ১, পৃ. ১২১; ইবনে কুদামা, *আল-মুগনী*, রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রিয়াদ, ১৪০১ হি., খ. ১০, পৃ. ১২০

৭১. البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم - *তাফসীরে-মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫১৭

দ্বিতীয় দলীল : আলী রা. কূফায় সুরাহা হামদানী নামক এক মহিলাকে যেনার অপরাধে বৃহস্পতিবার একশত বেত্রাঘাত করেন এবং শুক্রবার তাকে 'রজম' করেন। এরপর তিনি বলেন, আমি আল্লাহর কিতাব অনুসারে তাকে বেত্রাঘাত করেছি এবং রসূলুল্লাহ স. এর হাদীস অনুসারে তাকে 'রজম' করেছি।[৭২]

হাম্বলীদের দলীলের জবাব

প্রথম জবাবঃ ইমাম আবূ হানীফা, মালিক ও শাফিঈ র. বলেন, الزانية والزانى فاجلدوا এ আয়াতটি অবিবাহিতের জন্য নির্দিষ্ট। বিবাহিতের ব্যাপারে মানসূখ বা রহিত। উবাদা ইবনে সামিত ও সালামা ইবনে মুহাব্বাক রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের হুকুমও অনুরূপ। অর্থাৎ অবিবাহিতদের জন্য নির্দিষ্ট বা বিবাহিতের ব্যাপারে মানসূখ। মানসূখ হবার দলীল হলো, রসূলুল্লাহ স. মাইয কে 'রজম' করেছিলেন, তিনি গামেদ ও জুহায়না গোত্রীয় দুই মহিলাকেও 'রজম' করেছিলেন এবং বিভিন্ন সূত্রে তাদের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোন একটি সূত্রেও একথা বর্ণিত হয়নি যে, তাদের কাউকে প্রথমে বেত্রাঘাত করা হয়েছে এবং পরে 'রজম' করা হয়েছে। এছাড়া যায়িদ ইবনে খালিদ ও আবূ হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ স. উনাইস রা. কে বলেন, হে উনাইস! তুমি এ ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট যাও, সে যদি ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার করে, তবে তাকে 'রজম' করো। রসূলুল্লাহ স. তাকে একথা বলেননি, প্রথমে তাকে বেত্রাঘাত কর, পরে তাকে 'রজম' করো।

আবূ ওয়াকিদ আল-লায়ছী রা. বলেন, একবার আমরা 'জাবিয়া' নামক স্থানে খলীফা উমর রা.-এর দরবারে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার স্ত্রী ব্যভিচার করেছে এবং সে নিজেও তা স্বীকার করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন খলীফা আমাকে কিছু সংখ্যক লোকসহ তার নিকট বিষয়টি জানার জন্য পাঠালেন। সে এ বিষয়ে স্বামীর কথাই সত্য বলে স্বীকার করল। আমরা 'উমর রা.-এর নিকট সংবাদটি পৌঁছে দিলে তিনি তাকে 'রজম' করার নির্দেশ দেন। উমর রা. সাহাবীগণের উপস্থিতিতেই ব্যভিচারি মহিলাকে শুধু 'রজম' করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 'রজম' করার পূর্বে তাকে বেত্রাঘাত করার জন্য নির্দেশ দেননি।[৭৩]

দ্বিতীয় জবাবঃ আলী রা. হামাদানী গোত্রের এক মহিলাকে প্রথমে বেত্রাঘাত করেছিলেন, তারপর তাকে 'রজম' করেছিলেন তার জবাবে আমরা বলতে পারি যে, সম্ভবত তার কারণ ছিল, হামাদানী গোত্রের মহিলা বিবাহিতা ছিল, 'আলী রা.-এর কাছে প্রথমে তা প্রমাণিত হয়নি। এ কারণে তিনি তাকে প্রথমে বৃহস্পতিবার বেত্রাঘাত করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি যখন প্রমাণসহ জানতে পারেন যে, সে

---

৭২. *আল্-উকূবাতু ফীল ফিকহিল ইসলামী, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

৭৩. *প্রাগুক্ত*

বিবাহিতা, তখন তিনি তাকে পরের দিন 'রজম' করেন। 'আলী রা. যে একথা বলেছিলেন, "আমি তাকে আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুসারে বেত্রাঘাত করেছি এবং রসূল স.-এর হাদীস মোতাবিক 'রজম' করেছি" তাঁর এ কথার অর্থ হলো, অবিবাহিত ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। আর বিবাহিত ব্যক্তিকে 'রজম' করার নির্দেশ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অতএব হামাদানী গোত্রের মহিলার যখন বিবাহিতা হওয়া প্রমাণিত হয়েছে তখন আমি তাকে 'রজম' করেছি।[৭৪] ইমাম তাহাবী র. জাবির রা.-এর সনদে অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একবার এক ব্যক্তি যেনা করেছিল। রসূলুল্লাহ স. প্রথমে তাকে একশত বেত্রাঘাত করেন। কিন্তু পরবর্তীতে রসূলুল্লাহ স. কে জানানো হলো যে, লোকটি বিবাহিত, তখন তিনি তাকে 'রজম' করার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে 'রজম' করা হলো।[৭৫] অতএব উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্ট যে, বিবাহিত ব্যভিচারীদের শাস্তি 'রজম'ই, বেত্রাঘাত নয়। আর এর উপরই ইজমা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং রজমের দলীল দ্বারা বেত্রাঘাতের দলীলসমূহ রহিত হয়ে গেছে।

৩. ব্যভিচারের শাস্তি (হদ্দ) কার্যকর করার শর্তাবলী

ইসলামী আইনে যেনা হলো হদ্দ জাতীয় অপরাধ। পৃথিবীর কোন মানুষই এ অপরাধের শাস্তিতে কম-বেশী বা মাফ করার অধিকার রাখে না। মহান আল্লাহ ব্যভিচারদের জন্য 'হদ্দ' ঘোষণা দিয়ে মানব জাতির কল্যাণ সাধন করেছেন। ব্যভিচারের অশুভ পরিণতি সমাজব্যবস্থাকে যেমন মারাত্মক আঘাত হানে, তেমনটি বোধ হয় অন্য কোন অপরাধে নেই। যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, সেখানে কারো বংশই সংরক্ষিত থাকে না। একটু চিন্তা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর যেখানেই অশান্তি ও অনর্থ দেখা দেয়, তার অধিকাংশ কারণই নারী এবং তারপর অর্থ- সম্পদ। যে আইন নারী ও ধন-সম্পদের সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে পারে এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট পরিসরের বাইরে যেতে না দেয়, সেই আইনই বিশ্বশান্তির রক্ষাকবচ হতে পারে। এ কারণেই ইসলাম ব্যভিচারের শাস্তিকে অন্যান্য অপরাধের চাইতে কঠোরতর করেছে।

ইসলামী আইনে ব্যভিচারের শাস্তি সর্বাধিক কঠোর হওয়ায় এই অপরাধ প্রমাণের জন্য শার্তাবলীতেও অত্যন্ত কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে। এই অপরাধ প্রমাণের জন্য চারজন দেখা সাক্ষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ স. বলেন, "সন্দেহের কারণে তোমরা 'হদ্দ'কে রহিত করে দাও।"[৭৬] যদিও শর্তসমূহের অনুপস্থিতিতে 'হদ্দ'

---

[৭৪]. *প্রাগুক্ত*

[৭৫]. *প্রাগুক্ত*

[৭৬]. ادرأوا الحدود بالشبهات *তাফসীরে মাযহাবী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫২৬

(বিধিবদ্ধ শাস্তি) মাফ হয়ে যাবে কিন্তু তাযীর (রাষ্ট্রীয় দণ্ড) মাফ হবে না। অন্যান্য অপরাধে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন নারী সাক্ষী প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় কিন্তু ব্যভিচারের 'হদ্দ' জারী করার জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষীর চাক্ষুষ ও দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য জরুরী। যদি কোন নারী ও পুরুষের মাঝে যেনা সংঘটিত হয় আর তা সত্য বলে প্রমাণিত হয় তারপরও ব্যভিচারের এই শাস্তি কার্যকর করার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। এই শর্তাবলী পাওয়া গেলেই কেবল শাস্তি কার্যকর করা যাবে, অন্যথায় নয়।

৩.১. অপরাধী জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক হবে : রসূলুল্লাহ স. এ সম্পর্কে বলেন, "তিন ব্যক্তি থেকে আমলনামা লিখার কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে: ক. নাবালেগ, যতক্ষণ না সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়; খ. ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় এবং গ. বিবেক বুদ্ধিহীন পাগল, যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়।"[৭৭]

৩.২. অপরাধী মুসলমান হবে : ব্যভিচারের অপরাধে 'রজম' করার জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কোন অমুসলিম পুরুষ যদি কোন মুসলমান নারীর সাথে জোর পূর্বক যিনা করে তাহলে অমুসলিম পুরুষকে হত্যা করতে হবে। যেহেতু সে অঙ্গীকার ও চুক্তি লংঘন করেছে।[৭৮]

৩.৩. সন্দেহের বশীভূত হয়ে যেনা না হওয়া : রসূলুল্লাহ স. বলেন, "সন্দেহের কারণে তোমরা হদ্দকে রহিত করে দাও"[৭৯]

৩.৪. বিতর্কিত ফাসিদ নিকাহ অজ্ঞতাবশত না হওয়া : শরীয়তের দৃষ্টিতে যে সমস্ত নিকাহ ফাসিদ তা যদি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে হয়ে থাকে তবে এসকল ক্ষেত্রে তাদের উপর 'হদ্দ'-এর শাস্তি প্রজোয্য হবে। আর যদি তাদের এরূপ বিবাহের কার্যক্রম হারাম হওয়া সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত হয়ে থাকে তবে তাদের উপর 'হদ্দ' কার্যকর হবে না।[৮০]

৩.৫. বলাৎকারের মাধ্যমে যেনা না হওয়া : যাকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হয়েছে (المكرهة) সে শাস্তিযোগ্য হবে না। মহান আল্লাহ নারীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করতে নিষেধ করে বলেন, "তোমাদের দাসীরা নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লোভে তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। যদি কেউ তাদের

---

৭৭. رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وعن المجنون حتى يفيق ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান,* হাদীস নং ৪৪০৪, খ. ৪, পৃ. ২৪৪

৭৮. ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, *মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩

৭৯. ادراو الحدود بالشبهات *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২৬

৮০. *মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫

উপর জোর জবরদস্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৮১]

৩.৬. পশুর সাথে যেনা সংঘটিত হওয়া : ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, যুফার, মুহাম্মদ, মালিক এবং উসমান আল-বাত্তা র. বলেন "পশুর সাথে যেনাকারীর উপর হদ্দ বা যেনার শাস্তি প্রয়োগ হবে না। তবে তাকে তাযীরের আওতায় শাস্তি প্রদান করতে হবে।"[৮২] ইমাম আওযায়ী র. বলেন, তার উপর 'হদ্দ' عليه الحد লাগাতে হবে।[৮৩]

৩.৭. সংগমের যোগ্যতা সম্পন্নের সাথে যেনা হওয়া : যার সাথে যেনা-ব্যভিচার করবে, তাকে সংগমের উপযুক্ত হতে হবে। যদি সে ছোট বালিকা হয়, তাহলে যেনাকারীর উপর 'হদ্দ' (বিধিবদ্ধ শাস্তি) কার্যকর হবে না, বরং তার উপর তাযীরি শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে, তেমনিভাবে মেয়েটির উপরও কোন শাস্তি কার্যকর হবে না।[৮৪]

৩.৮. যেনা হারাম হওয়া সম্পর্কে যেনাকারীর অবগত থাকা

যদি কোন ব্যক্তি যেনা হারাম হওয়া সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকে আর অজ্ঞতাবশত সে যেনা করে, তবে তার উপর 'হদ্দ' কার্যকর হবে না।[৮৫]

৩.৯. ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া

যেনার 'হদ্দ' কার্যকর করতে হলে ইসলামী রাষ্ট্র হতে হবে। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রই একমাত্র যেনার 'হদ্দ' কার্যকর করার ক্ষমতা রাখে। অপরাধের শাস্তিসমূহ কার্যকর করার ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি একান্ত প্রয়োজন। রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে এবং খুল্যাফায়ে রাশেদীনের যুগে খলীফা তথা রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ছাড়া কখনই কোন 'হদ্দ' কার্যকর করা হয়নি। অতএব কেউ ব্যক্তিগত বা সামাজিক পর্যায়ে এ দণ্ড কার্যকর করতে পারে না। তবে পিতা-মাতা ও সমাজের নেতৃবর্গ শিক্ষামূলক দণ্ডবিধি (তা'যীর) কার্যকর করতে পারে, তওবা পড়াতে পারে, উভয়কে লজ্জা দিতে পারে। আর এরূপ কুকর্মে নিরুৎসাহিত করার জন্য অবজ্ঞা সৃষ্টি করতে পারে।

---

৮১. আল-কুরআন, ২৪: ৩৩ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

৮২. لاحد عليه و يعزر *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৪৩

৮৩. *প্রাগুক্ত*

৮৪. *ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬৯; *মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

৮৫. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ, *কাওয়ানীল আহকাম আশ্-শরীয়াহ ওয়া মাসায়েল আল-ফুরূল ফিকহীয়াহ*, বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৭৯ খ্রি. পৃ. ৩৮৫

গ. ব্যভিচার প্রতিরোধে ইসলামী আইনের শ্রেষ্ঠত্ব

একজন নারী ও একজন পুরুষ পারস্পারিক সম্মতিতে বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়াই যে যৌন মিলন করে তা ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে ব্যভিচার বলা হলেও প্রচলিত আইনে তা কোন ব্যভিচার বা অপরাধই নয়। প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে ব্যভিচার (Adultery) ও ধর্ষণ (Rape) এর নিজস্ব সংজ্ঞা ও শাস্তি নির্ধারিত আছে। The penal code, 1860-তে ব্যভিচারের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে : "কোন ব্যক্তি যদি অন্যের স্ত্রীর সাথে স্বামীর সম্মতি বা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সমর্থন ব্যতীত যৌন সঙ্গম সম্পন্ন করে তবে তাকে ব্যভিচার বলে"।[৮৬] প্রচলিত আইনে ব্যভিচারের জন্য কেবল পুরুষকে অপরাধী করা হয়। ব্যভিচারে অংশগ্রহণকারীনী নারীকে ব্যভিচারের সহযোগী হিসেবে দণ্ডিত করা হয় না। ব্যভিচারী পুরুষের শাস্তি সর্বাধিক পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড।[৮৭]

প্রচলিত আইনে ধর্ষণ (Rape)-এর সংজ্ঞা ও শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "বৈবাহিক বন্ধন ব্যতিরেকে ১৪ বছরের অধিক বয়সের নারীর সাথে তার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তার সম্মতি আদায় করে অথবা ১৪ বছরের কম বয়সের কোন নারীর সাথে তার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন মিলন হচ্ছে ধর্ষণ"।[৮৮] এ আইনে ধর্ষণ ও ধর্ষণজনিত অপরাধের শাস্তি হলো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনধিক দশ বছরের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড। ধর্ষণের সংজ্ঞায় বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দণ্ডবিধি অনুযায়ী ১৩ বছরের কম বয়সের স্ত্রীর সাথে সহবাসও ধর্ষণ। স্বামীর শাস্তি অনধিক ২ বছর কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড।[৮৯] ব্যভিচার ও ধর্ষণ সম্পর্কে উপরোক্ত সংজ্ঞা ও তাদের শাস্তি পর্যালোচনা করে আমরা বলতে পারি :

প্রথমত: প্রচলিত আইনে নারী-পুরুষ পারস্পরিক সম্মতিতে যেনা বা ব্যভিচার করলে তাদেরকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়। আর যেনার লাইসেন্স থাকলে এটা কোন অপরাধই নয়। এতে যেনা বন্ধ হওয়ার তো কথাই নয় বরং এতে সমাজে যেনা-ব্যভিচার বৃদ্ধিই পায়। পক্ষান্তরে ইসলামী আইনে ব্যভিচারীদেরকে যদি শাস্তি প্রদান করা হয় তবে সমাজ থেকে অবশ্যই ব্যভিচারের মত ঘৃণিত অপরাধ বিদূরিত হবে। ইসলামী আইনে দু'টি মূলনীতি লক্ষ করা যায়। আর তা হলো, অপরাধ প্রতিরোধ ও সমাজ রক্ষা

---

৮৬. The Penal Code 1860, Act XLV of 1860, Section 497.

৮৭. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, *বাংলাদেশে মুসলিম আইন*, ঢাকা: অরনি প্রকাশনী, ১৯৮৯ খ্রি. পৃ. ৪৬২

৮৮. *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০* (২০০০ সালের ৮ নং আইন), ধারা ২ (ঙ)।

৮৯. *The Penal Code 1860*, Section 497.

করা। তাই ইউরোপ, আমেরিকার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই যে, তাদের সমাজে ব্যভিচার এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। পক্ষান্তরে সৌদি আরব, ইরানসহ যে সমস্ত মুসলিম দেশে ইসলামী আইন চালু আছে সেখানে যেনা-ব্যভিচারের হার অতি নগণ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমানকালে প্রগতিশীল বলে দাবিদার একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ইসলাম প্রবর্তিত ব্যভিচারের শাস্তিকে 'বর্বরোচিত' বলে আখ্যায়িত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। অথচ তাদের স্ত্রী, কন্যা বা ভগ্নীদেরকে যদি কেউ ধর্ষণ করে তবে সেই অপরাধীকে তারা কঠিন শাস্তি প্রদানের পক্ষপাতি। ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যভিচারীদের প্রতি দরদ দেখানোর অর্থ হল, গোটা সমাজের ওপর জুলুম করা, মানবতাবোধ ও মানব শৃঙ্খলাকে বিপর্যস্ত করা। এই অপরাধীদের প্রতি দরদ ও সহানুভূতি প্রদর্শন হল কৃত্রিম। কারণ মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি সবচেয়ে বেশী দরদী। মহান আল্লাহ নিজেই যখন সে সব অপরাধীর জন্য উক্ত শাস্তির ব্যবস্থা দিয়েছেন তখন বুঝতে হবে, তাদের ও গোটা মানবতার কল্যাণের জন্যই সে শাস্তির ব্যবস্থা তিনি দিয়েছেন। তাই আল্লাহ বলেন, "যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী বিচার- ফয়সালা করে না তারাই কাফির"।[৯০] অন্যত্র আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই জালিম।"[৯১] অপর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না তারাই পাপাচারী।"[৯২] মহান আল্লাহ ভালভাবেই জানেন, তাঁর বান্দাদের কিসে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অতএব চরম অহংকারী, জ্ঞানপাপী ও সত্যবিমুখ কোন ব্যক্তিই কেবল এই বাহ্যিক শাস্তির অবস্থা দেখে একে কঠিন ও বর্বরোচিত শাস্তি বলে মন্তব্য করতে পারে। কারণ এরা তো সেই সব মানুষ যাদের নিজেদের মধ্যেই ব্যভিচারের ব্যাপক ছড়াছড়ি চলছে এবং এর প্রসারের জন্য তারা সামাজিকভাবে সব ধরনের ব্যবস্থা করে রেখেছে, তাদের মানব প্রকৃতি অধ:পতনের গহ্বরে পতিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ঃ প্রচলিত আইনে বিবাহ ছাড়া নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যৌন মিলনকে অবৈধ করা হয়নি। এই আইনে বংশীয় পবিত্রতা ও

---

[৯০]. আল-কুরআন, ৫: ৪৪ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

[৯১]. আল-কুরআন, ৫: ৪৫ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

[৯২]. আল-কুরআন, ৫: ৪৭ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

পারস্পরিক শৃংখলা বিনষ্ট হয়। অবৈধ সন্তানের জন্ম হয়। এতে সন্দেহ নেই যে, অবৈধ সন্তান মানবিক অধিকার থেকে অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয় এবং তার জীবন ধারণ ও লালন-পালনের সুযোগ-সুবিধা তার জন্য সহজলভ্য হয় না। তার স্বাভাবিক জীবন পথে অনেক বাধা-বিপত্তি ও অপমানের সম্মুখীন হতে হয়। যদিও মাতা-পিতার অপরাধ সন্তানের উপর বর্তায় না, তবুও সমাজ অবৈধ সন্তানকে পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা দিতে সম্মত হয় না। অতএব সন্তানের জন্য এমন একটি ঠিকানা প্রয়োজন যেখানে তার পিতামাতার অভিভাবকত্ব ও স্নেহ মমতার স্বাভাবিকত্বে জীবন গড়া সহায়ক হয়। ইসলামী আইন বৈধ বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া নারী-পুরুষের যৌন মিলন তথা ব্যভিচারকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করে পারিবারিক শৃংখলা রক্ষা করেছে এবং পবিত্র বংশধারার ধারাবাহিকতা ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছে। মানুষের যৌন চাহিদা পূরণ এবং বংশধারার পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রাচীন কাল থেকে যে বৈবাহিক প্রথা চলে আসছে তা কেবল ইসলামী আইনের মাধ্যমে রক্ষা করা সম্ভব।

তৃতীয়তঃ প্রচলিত আইনে ব্যভিচারের জন্য শুধু পুরুষের শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কোন নারী যদি পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিবাহ-বহির্ভূত যৌন মিলন করে সে ক্ষেত্রে নারীকেও অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়নি। অথচ সমাজের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, যিনা ব্যভিচারে নারীদের ভূমিকা রয়েছে। তাই মহান আল্লাহ যিনার শাস্তি বর্ণনায় ব্যভিচারিনী নারীকে প্রথমে এবং ব্যভিচারী পুরুষকে পরে উল্লেখ করে বলেন, "ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত কর।"[৯৩] অতএব প্রচলিত আইনে ব্যভিচারী নারীদেরকে শাস্তি প্রদান না করে শুধু ব্যভিচারী পুরুষদেরকে শাস্তি প্রদান করায় সমতা বা ইনসাফ করা হয়নি। অথচ ইসলামী আইন এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়কে সমান অপরাধী বলে উল্লেখ করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছে।

চতুর্থতঃ প্রচলিত আইন ইসলামী আইনের ন্যায় শুধু ধর্ষণকারীকেই অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তবে উভয় আইনের মধ্যে শাস্তির ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। প্রচলিত আইনে ধর্ষণকারীকে বিবাহিত বা অবিবাহিত হিসেবে চিহ্নিত করে শাস্তির পার্থক্য করা হয়নি। একজন অবিবাহিত পুরুষ যার প্রাকৃতিক চাহিদা মেটানোর কোন উপায় নেই, সে যদি উত্তেজনা বা কুপ্রবৃত্তির শিকার হয়ে বিপদগামী হয়, সে অবস্থায় তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হলে তার

---

৯৩. আল-কুরআন, ২৪: ২ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

সংশোধন হবার সুযোগ থাকে না। ইসলামী আইন এ ক্ষেত্রে অবিবাহিত ধর্ষণকারীকে একশ বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিয়ে হালকা শাস্তি প্রদান করে সংশোধন হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

পঞ্চমতঃ প্রচলিত আইনে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাসের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়সসীমা নির্ধারণ করে দিলেও ইসলামী আইন এরূপ কোন কঠোরতা আরোপ না করে বৈবাহিক পবিত্র বন্ধনকে স্বীকৃতি দিয়ে মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণের পথকে সুগম করেছে। তাই ইসলামী আইন অপরাধ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনের চেয়ে অধিক যুগোপযোগী ও যৌক্তিক।

ষষ্ঠতঃ প্রচলিত আইনে ব্যভিচারীকে স্বীয় অপরাধের জন্য কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। অপরাধী কারাভোগের মাধ্যমে সংশোধন হয় না। বরং কারাগারে অপরাধচক্রের সঙ্গে বসবাসের ফলে সে আরো নতুন নতুন অপরাধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। ফলে পরবর্তীতে তার দ্বারা আরো বড় বড় অপরাধ সংঘটিত হতে দেখা যায়। উপরোক্ত সকল দিক বিবেচনায় ইসলামী আইন প্রচলিত আইন থেকে অধিক যুগোপযোগী ও অত্যাধুনিক।

উপসংহার

সভ্য সমাজে ব্যভিচার একটি ঘৃণ্য অপরাধ। এ জঘন্য অপরাধ থেকে মানব জাতিকে রক্ষার লক্ষে যুগে যুগে ও দেশে দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে । কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজ থেকে এ জঘন্য অপরাধ নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না; বরং অপরাধ দমনের জন্য যত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে, সমাজে অপরাধীর সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানব রচিত কোন প্রচেষ্টাই যেন সফলতা দেখাতে পারছে না। অথচ ইসলাম একমাত্র কল্যাণময় জীবন বিধান হিসেবে অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ইসলামী আইনে দু'টি মূলনীতি লক্ষ করা যায়, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও সমাজকে রক্ষা করা। ইসলাম অপরাধের সুযোগ ও সম্ভাবনাকে প্রথমেই বন্ধ করে দেয় এবং এর মাধ্যমে অপরাধের বিরুদ্ধে তাদেরকে সচেতন করে তোলে। এরপরও কেউ অপরাধে লিপ্ত হয়ে সমাজের মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংস করতে চাইলে ইসলাম তার বিরুদ্ধে কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। আল্লাহ সকলের স্রষ্টা হিসেবে জানেন, কিসে মানব সমাজের জন্য মঙ্গল এবং কিসে অমঙ্গল। ব্যভিচার ও অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনের এই স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াটি কুরআন ও সুন্নায় বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। যদি মানব সমাজে বিশেষ করে মুসলিম সমাজে এই ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা যায় তাহলেই কেবল ব্যভিচারমুক্ত সমাজ গঠন সম্ভব।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮ সংখ্যা-৩১
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১২

অংশীদারি ব্যবসায় অর্থায়ন : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ড. মোঃ মাসুদ আলম*

[সারসংক্ষেপ: ব্যবসায় জগতের একটি প্রাচীন পদ্ধতি অংশীদারি ব্যবসায়। অংশীদারি ব্যবসায়ের মূলভিত্তি হল চুক্তি। চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারগণ ব্যবসায় গঠন, পরিচালনা, লাভ-লোকসান বণ্টন, অধিকার, দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করে থাকে, যা পরবর্তীতে ব্যবসায় সংক্রান্ত যে কোন জটিলতা নিরসনে সহায়ক হয়। আধুনিককালে একক ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতা সৃষ্টি হওয়ায় ব্যবসায়ীরা অংশীদারি বাণিজ্যে অর্থায়ন করতে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ফলে অংশীদারি বাণিজ্যের পরিধি দিন দিন বাড়ছে, বাড়ছে অংশীদারি ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগের ব্যাপ্তি। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে অংশীদারি ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ সম্পর্কিত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হয়েছে।]

ভূমিকা

মানুষের আয়-রোজগারের অন্যতম মাধ্যম ব্যবসায়-বাণিজ্য। এ কারণে ইসলাম অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছে। অংশীদারি পদ্ধতি ইসলামের বাণিজ্যনীতিতে ব্যবসায়-বাণিজ্যে অর্থায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অংশীদারি পদ্ধতি একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। বিশেষ করে বৃহৎ শিল্প এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটি অত্যধিক উপযোগী। ইসলাম গণমানুষের বহুমুখী প্রয়োজন পূরণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নের ধারণাকে সুসংহত করতেই এহেন পদ্ধতি অনুমোদন দিয়েছে।

অংশীদারিত্ব পদ্ধতি (Partnership Mode)

ইসলামের বাণিজ্যনীতিতে ব্যবসায়-বাণিজ্যে অর্থায়ন বা বিনিয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো অশীদারিত্ব পদ্ধতি। অংশীদারিত্ব পদ্ধতির দু'টি ধরন রয়েছে। যথা:

ক. মুদারাবা (মুনাফায় অংশগ্রহণ এবং লোকসান বহন পদ্ধতি-Profit Sharing loss bearing mode)

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

খ. মুশারাকা (লাভ-লোকসান অংশীদারি পদ্ধতি - Profit and loss sharing mode)

এ উভয় পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ-

ক. বায় মুদারাবা (بيع مضاربة)

'মুদারাবা' পারস্পরিক সহযোগিতামূলক ব্যবসার একটি বিশেষ পদ্ধতি। 'মুদারাবা' (مضاربة) শব্দটি বাবে مفاعلة এর মাসদার, যা আরবি 'দরবুন' (ضرب) মূলধাতু হতে গঠিত। এর শাব্দিক অর্থ-জমির উপর পদাঘাত করা, চলাফেরা করা,[১] ভ্রমণ করা[২] ইত্যাদি।

واذا ضربتم فى الارض[৩]। মহান আল্লাহ্‌র বাণীতে ضربتم অর্থ পরিভ্রমণ করা, সফর করা ইত্যাদি। তাই ইসলামী চিন্তাবিদগণ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অন্বেষণে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভ্রমণকে মুদারাবার মৌলিক বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ব্যবসায়ীরা ব্যবসার জন্য যেহেতু পৃথিবীর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে তাই ইসলামী আইনবিদগণ এর নাম দিয়েছেন 'মুদারাবা'[৪]।

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে মানুষের এ বিচরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মাজীদে বলেন, "কেউ কেউ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (ব্যবসায়-বাণিজ্য তথা রুজি-রোজগার) সন্ধানে দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করবে"।[৫]

ইসলামী পরিভাষায়- যে ব্যবসায় দু'টি পক্ষ থাকে এবং এর প্রথম পক্ষ মূলধন যোগান দেয় এবং দ্বিতীয় পক্ষ শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করে এবং চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষ লভ্যাংশ নেয়। অন্যদিকে দ্বিতীয় পক্ষের অবহেলাজনিত কারণ ছাড়া সমুদয় আর্থিক ক্ষতি মূলধন যোগানদাতা বহন করে তাকে 'মুদারাবা' বলে। অর্থাৎ এক পক্ষের মূলধন এবং অপর পক্ষের শ্রমের সমন্বয়ে অর্জিত মুনাফায় অংশীদারিত্ব সম্পর্কিত চুক্তিকে 'মুদারাবা' বলা হয়[৬]।

---

১. সাদী আবূ জীইব, *আল-কামূসুল ফিকহী,* পাকিস্তানঃ ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিয়্যাহ, তা. বি., পৃ. ২২১

২. ইবরাহীম মাদুকর, *আল-মুজামুল ওয়াসীত,* দেওবন্দঃ কুতুবখানা হুসাইনিয়্যাহ, ১৯৯৭, পৃ. ৩২২

৩. আল-কুরআন, ৪:১০১ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে কুদামা, *আল-মুগনী,* বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৭ খ্রি., খ. ৫, পৃ. ১৩৪

৫. আল-কুরআন, ৭৩:২০ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

৬. আবদুর রহমান আল-জাযায়রী, *কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবাআহ্,* বৈরুতঃ দারুল ইলমিয়্যাহ, তা. বি, খ. ৩, পৃ. ৩৪; শাহ্ ওলী উল্লাহ, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা,* বৈরুতঃ দারুল

'মুদারাবা' পদ্ধতিতে অর্থের যোগানদাতা তথা বিনিয়োগকারী বা বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানকে 'সাহিব আল-মাল' (পুঁজির মালিক) এবং গ্রাহক তথা ব্যবসায় পরিচালনাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় 'মুদারিব' বা উদ্যোক্তা। এখানে মুদারিব শ্রম বিনিয়োগ করে ব্যবসায় পরিচালনা করে[৭]।

সহজ কথায়, এক পক্ষের পুঁজি এবং অপর পক্ষের দৈহিক ও বুদ্ধিভিত্তিক শ্রমের সমন্বয়ে যে ব্যবসায় পরিচালিত হয় তাই 'মুদারাবা'[৮]।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে বুঝা যায়, মুদারাবায় দু'টি পক্ষ থাকে। মুদারাবা ব্যবসায় যে ব্যক্তি পুঁজির যোগান দেয় তাকে সাহিব আল-মাল (صاحب المال) বা রাব্বুল মাল (رب المال) এবং শ্রমদানকারী তথা কারবার পরিচালককে 'মুদারিব' (مضارب) বা উদ্যোক্তা বলা হয়। এখানে সাহিব আল-মাল এর পুঁজি হচ্ছে ব্যবসায় প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ আর মুদারিবের পুঁজি হচ্ছে দৈহিক ও বুদ্ধিভিত্তিক শ্রম। ইসলামী আইনবিদগণের ভাষ্যমতে ব্যবসায়-বাণিজ্যে লোকসান বলতে পুঁজির ক্ষয় সাধন বুঝায়। একারণে বা'য় মুদারাবায় পুঁজির মালিককে আর্থিক ক্ষতি এবং শ্রমের

কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি., খ. ২, পৃ. ১১৬; ড. নাজাতুল্লাহ্ সিদ্দিকী, *শরীয়তের দৃষ্টিতে অংশীদারি কারবার*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ১৬

আল-মুলাখ্খাসুল ফিক্হী গ্রন্থে বলা হয়েছে- ومعنى المضاربة شرعا: دفع مال معلوم لم يتجر به ببعض ربحه দ্র. ড. সালেহ ইবনে ফাওরান ইবনে আব্দুল্লাহ আল-ফাওরান, *আল-মুলাখ্খাসুল ফিকহী*, রিয়াদঃ রিয়াসাতি ইদারাতিল বুহুস আল-ইসলামিয়্যাহ ওয়াল ইফতা, ১৪২৩ হি., খ.১, পৃ. ১২৮

ইবনে কুদামা মুদারাবাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে- المضاربة ان يدفع رجل ماله الى اخر يتجر له فيه على ان ما حصل من الربح- দ্র. *আল-মুগনী*, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪১৭ হি., খ. ৫, পৃ. ১৩৪

ড. ওহাবাতুয যুহাইলী মুদারাবার সংজ্ঞায় বলেন, المضاربة هى ان يدفع المالك الى العمل مالايتجر فيه ويكون الربح مشتركا بينهما بحسب ما شرطا দ্র. ড. ওহাবাতুয যুহাইলী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, পাকিস্তানঃ মাকতাবাতুল হাক্কানিয়্যাহ, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ৮৩৬

ইব্রাহীম মাদকুর এর ভাষায়- المضاربة عقد مشركة فى الربح بمال من رجل وعمل من اخر দ্র. *আল মুজামুল ওয়াসীত*, দেওবন্দঃ কুতুবখানাহ হুসাইনিয়্যাহ, ১৯৯৭, পৃ. ৫৩৭

[৭]. আব্দুর রহমান আল-জাযায়রী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৪; মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, অনু. মুফতী মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি: সমস্যা ও সমাধান*, ঢাকাঃ মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০৫, পৃ. ৪৭

[৮]. সম্পাদনা পরিষদ, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, তা. বি., পৃ. ৩১

মালিককে শ্রমের ক্ষতি বহন করতে হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে 'মুদারাবা' ব্যবসাকে মুনাফায় অংশীদারি কারবারও বলা হয়। তাই মুদারাবা কারবারে লাভ হলে ব্যবসার শুরুতে কৃত চুক্তির শর্তানুসারে সাহিব আল-মাল এবং মুদারিব উভয়েই উক্ত লাভ ভাগ করে নেয়। পক্ষান্তরে ব্যবসায় লোকসান হলে সম্পূর্ণ লোকসান কেবল সাহিব আল-মাল তথা পুঁজি সরবরাহকারীকেই বহন করতে হয়। আর এক্ষেত্রে মুদারিবের ব্যয়িত শ্রম, বুদ্ধি ও সময় বৃথা যায়। মুদাবির কোন লাভ পায় না এটাই তার লোকসান। উল্লেখ্য, ব্যবসায় পরিচালনায় মুদারিবের অবহেলাজনিত কোন কারণে কিংবা চুক্তির শর্ত ভঙ্গের কারণে লোকসান হলে সেক্ষেত্রে লোকসানের দায়ভার মুদারিবকেই বহন করতে হয়। কেননা এক্ষেত্রে পুঁজির মালিকের কোন ভূমিকা থাকে না[৯]।

সুতরাং মুদারাবা কারবারে মুদারিবকে সততা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, দক্ষতা এবং দূরদর্শিতার সঙ্গে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয়। কারণ কারবারে মুদারিব ট্রাস্ট্রি এবং এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। তাই তার দায়িত্ব অবহেলাজনিত এবং ইচ্ছাকৃত কারণে লোকসান হলে সে দায়িত্ব মুদারিবকে বহন করতে হয়।[১০]

বায় মুদারাবার বৈধতা

পরস্পর সহযোগিতামূলক ব্যবসার ক্ষেত্রে মুদারাবা হচ্ছে অন্যতম। মহান আল্লাহ্ কুরআন মাজীদে বলেন, "কেউ কেউ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (ব্যবসায়-বাণিজ্য) সন্ধানে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করবে"।[১১] এ আয়াতটি মুদারাবা ব্যবসার ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত।

নবুয়ত লাভের আগে রসূলুল্লাহ স. খাদীজা রা. -এর মূলধন দ্বারা এরূপ শরীকানা ব্যবসায় করেছিলেন। নবুয়ত লাভের পর তিনি এভাবে ব্যবসায় করার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। তাই সাহাবা কিরামের অনেকেই এ পদ্ধতিতে ব্যবসায়-বাণিজ্য করেছেন[১২]। খায়বর বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ স. ভাগা-ভাগির ভিত্তিতে সেখানকার জমি-যিরাত ইহুদীদেরকে দান করেন। রসূলুল্লাহ স. খায়বরের জমি-যিরাত ইহুদীদেরকে এ শর্তে দান করেন যে, তারা এতে শ্রম বিনিয়োগ করবে এবং এতে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক পাবে। সাহাবীগণও মুদারাবার মাধ্যমে কারবার করতেন।

---

[৯]. শামসুদ্দীন আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৪১৪ হি., খ. ২২, পৃ. ১৫২; আলী আল-খাফীফ, *আশ-শিরকাতু ফীল ফিকহিল ইসলামী*, আল-কাহেরাঃ দারুন নশর, ১৯৬২, পৃ. ৭৪; M. Umar Chapra, *Towards a Just Moretary System*, Leicester: Islamic Foundation, 1985, P. 250

[১০]. M. Umar Chapra, Ibid, p. 248; অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নতর ব্যাংক ব্যবস্থা*, ঢাকাঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১৯৯৬, পৃ. ১৩০

[১১]. আল-কুরআন, ৭৩:২০ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

[১২]. সম্পাদনা পরিষদ, *ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

ইয়াকুব আল-মাদানী বর্ণনা করেছেন, তাকে উসমান ইবনে আফ্‌ফান রা. মুদারাবার ভিত্তিতে কিছু মাল দিয়েছিলেন এ শর্তে যে, তিনি পরিশ্রম করবেন এবং মুনাফার মধ্যে উভয়েই শরীক হবেন।[১৩]

মুদারাবা সম্পর্কে ইসলামী আইনবিদগণের অভিমত হল, মানুষের প্রয়োজনে মুদারাবা বা অংশীদারি ব্যবসায় বৈধ করা হয়েছে। কারণ কোন কোন বিত্তবান ব্যক্তি ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে থাকে। আবার কোন কোন দরিদ্র লোক এ সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা রাখে এবং ব্যবসায়ের কৌশলাদি সম্পর্কে অত্যন্ত ওয়াকিফহাল হয়। তা ছাড়া মহানবী স. -এর আবির্ভাবের আগেও মুদারাবা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। উত্তম মনে করে তিনি এই পদ্ধতিতে ব্যবসা করার অনুমতি প্রদান করেন। রসূলুল্লাহ স. -এর সাহাবীগণও এ পদ্ধতিতে ব্যবসায়-বাণিজ্য করেছেন।[১৪]
উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে মুদারাবা বৈধ। পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে মুদারাবা ব্যবসায় একটি উত্তম পদ্ধতি। তাই ইসলামে এরূপ ব্যবসায় পদ্ধতি বৈধ।

মুদারাবার শর্তাবলী

মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসায়-বাণিজ্য বৈধ হওয়ার নিমিত্তে নিম্ন বর্ণিত শর্তগুলো পূরণ করা প্রয়োজন:[১৫]

১. মুদারাবা চুক্তিতে দু'টি পক্ষ থাকে। একপক্ষ সাহিব আল-মাল (পুঁজিপতি) হিসেবে ব্যবসার সমুদয় মূলধন যোগান দেয় এবং অপরপক্ষ মুদারিব (ব্যবসায় পরিচালনাকারী) হিসেবে তার শ্রম, মেধা ও সময় বিনিয়োগ করে ব্যবসায় পরিচালনা করে। উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিটি লিখিত হতে হবে।

২. পুঁজিদাতা মুদারিবকে যে পুঁজি প্রদান করবে তা অবশ্যই নগদ মুদ্রা হতে হবে। তবে পুঁজিদাতা নগদ অর্থের পরিবর্তে মুদারিবকে কিছু মাল প্রদান করে এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা মুদারাবা ব্যবসায় করতে বললে তাও বৈধ হবে।

৩. চুক্তি সম্পাদনের সময় মূলধনের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে, যাতে পরে এ নিয়ে কোন বিবাদের সূত্রপাত না ঘটে।

৪. মূলধন নগদ অর্থ হতে হবে। ঋণের দ্বারা মুদারাবা বৈধ হবে না।

৫. সমুদয় মূলধন মুদারিবের হাতে নিরঙ্কুশভাবে অর্পণ করতে হবে যেন মুদারিব স্বয়ং তা বিনিয়োগ করতে পারে। এতে পুঁজিদাতা কোন নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে না।

---

[১৩]. ডক্টর মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, খ.১, পৃ. ১৮২

[১৪]. মোঃ আবু তাহের, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ব্যাংকিং*, ঢাকা: চলক প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ৩১৩

[১৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯-৩১০

৬. যদি পুঁজিদাতা এবং মুদারিব উভয়ে মিলে এরূপ শর্ত করে যে, তারা ব্যবসায়িক কার্যক্রমে পরস্পর অংশ গ্রহণ করবে, তবে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে।

৭. কারবারের মুনাফায় মুদারিবের নির্দিষ্ট অংশের উল্লেখ থাকবে, কোন সুনির্দিষ্ট অংকের উল্লেখ থাকবে না। যেমন তারা বলল, আমরা উভয়ে অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ইত্যাদি হারে ভাগ করে নিব, তবে তা বৈধ হবে। পক্ষান্তরে যদি এরূপ চুক্তি করে যে, মুনাফা যাই হোক মুদারিব একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পাবে তা হলে মুদারাবা বৈধ হবে না।

৮. মুদারিব কারবারের মুনাফা হতেই তার অংশ পাবে, মূলধন হতে নয়। যদি কারবারে লোকসান হয় তবে কোন অবস্থাতেই মুদারিব মূলধন থেকে কিছু দাবি করতে পারবে না।

৯. এরূপ ব্যবসার লভ্যাংশ সাহিব আল-মাল ও মুদারিবের মধ্যে চুক্তির শর্ত মোতাবেক ভাগ হবে। কোন এক পক্ষকে বঞ্চিত করে অপর পক্ষ লভ্যাংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

১০. মুদারাবা চুক্তির উভয় পক্ষেরই প্রতিনিধি নিয়োগ অথবা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার আইনগত যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকতে হবে। কারণ এ ধরনের চুক্তিতে এক পক্ষ অপর পক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে এবং অপর পক্ষকে তার প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেয়।

১১. মুদারাবা একটি বিশ্বস্ততার চুক্তি। তাই মুদারিব বিশ্বস্তার ভিত্তিতে মুদারাবা মূলধন খাটিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করে। এতে মুদারিবের অবহেলা, অব্যবস্থাপনা, অসদাচরণ, চুক্তিভঙ্গ ইত্যাদির কারণ না ঘটলে এবং অন্য কোন কারণে লোকসান হলে মুদারিব তার জন্য দায়ী হয় না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের বাণিজ্যনীতিতে অর্থ বিনিয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হল বায় মুদারাবা। বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকগুলো এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করছে। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোতে এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে আশানুরূপ সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছে।

খ. বায় মুশারাকা

বায় মুশারাকা ব্যবসায়-বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগের ইসলামী পদ্ধতিগুলোর অন্যতম । মুশারাকা শব্দটি আরবি শিরকাতুন (شركة) শব্দ থেকে উদ্‌গত[১৬]। ফিক্‌হশাস্ত্রের

---

[১৬]. ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরাব,* বৈরুতঃ দারুল ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৬, খ.৭, পৃ. ৯৯

পরিভাষায় একে 'শিরকত' (الشركة) বলা হয়[১৭]। শিরকত শব্দের আভিধানিক অর্থ মিশ্রিত[১৮]। অর্থাৎ দুই বা ততোধিক অংশ এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে যাওয়া যে, এগুলোর একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা যায় না[১৯]।

তাই শাব্দিক দিক দিয়ে মুশারাকার অর্থ-অংশীদারিত্ব। ইসলামী অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার ও ব্যবসায় অঙ্গনে মুশারাকা শব্দটি ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। আইনের ভাষায় কোন ব্যবসায়ে দুই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মিলনই শিরকত। কাজেই বলা যায় যে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত অংশীদারিত্বই শিরকত। এটি আধুনিক প্রাইভেট লিঃ কোম্পানী ও জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর বিকল্প পরিভাষা।[২০]

একইভাবে দুই বা ততোধিক কোন জিনিসের সঙ্গে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়াকেও শিরকত বলা হয়।[২১] অংশীদারি কারবারকে মূলত মুশারাকা বলা হয়। কারবার বা ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিভাষায় মুশারাকা বলতে এমন কারবারকে বুঝায়, যে কারবারে সকল অংশীদার যৌথ কারবারে লাভ-লোকসানে শরীক থাকে।[২২]

মুশারাকার ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Partnership বা Participating Financing যেমন- "Test book on Islamic Banking, এ বলা হয়েছে- The word Musharaka is derived from the Arabic word sharika meaning Partnership".[২৩]

---

[১৭]. সম্পাদনা পরিষদ, *ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[১৮]. আস-সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, সৌদি আরব: দারুল ফাতাহ লিল ইলামিল আরাবী, ১৯৮৬, পৃ. ২৮৭

[১৯]. সাদী আবু জীইব, *আল-কামূসুল ফিক্‌হী*, প্রাগুক্ত, তা. বি., পৃ. ১৯৫; ইবরাহীম মাদকুর, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮০

[২০]. মোঃ আবু তাহের, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪

[২১]. লুইয়াস মালুফ, *আল-মুনজিদ ফিল-লুগাত*, পৃ. ৩৮৪; আবদুর রহমান আল-জাযায়রী, *কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

[২২]. মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী অনুঃ মুফতী মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯; মুশারাকা ব্যবসা বাণিজ্যে একটি সহযোগিতা মূলক বৈধ কর্ম। সুদভিত্তিক কারবারের কুফল থেকে জনসাধারণকে রক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি বিকল্প আদর্শ ব্যবস্থা। হাদীসে এসেছে 'আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাকে সহযোগিতা করেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করে'।
والله فى عون العبد فى ماكان العبد فى عون اخيه (مسلم)

[২৩]. Board of Editors, *Test Book on Islamic Banking*, Dhaka: Islamic Economics Research Bureau, June, 2003, P. 127

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মূলধন ও লভ্যাংশের ব্যাপারে দুই বা ততোধিক শরীকদারের মধ্যকার আক্দ (চুক্তি) -কে শিরকত বা বায় মুশারাকা বলা হয়।[২৪]

মুশারাকা পদ্ধতিতে কারবারে লাভ হলে অংশীদারগণ পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে তা ভাগ করে নেয়; আর লোকসান হলে অংশীদারগণ নিজ নিজ পুঁজির আনুপাতিক হারে তা বহন করে।[২৫]

সুতরাং অংশীদারদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে শরীয়ত মুতাবেক ব্যবসায় পরিচালনা, কারখানা প্রতিষ্ঠা, বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ অনুসারে লাভ ও ক্ষতির নিয়ম-পদ্ধতিও চুক্তিপত্রে সুস্পষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ থাকবে। প্রত্যেক অংশীদার চুক্তির শর্ত মুতাবেক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে শরীয়াহ ভিত্তিক পরিচালিত বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থার শেয়ার খরিদ ও বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করতে পারবে। ইসলামের এ বাণিজ্যিক পদ্ধতিকে মুশারাকা বা অংশীদারিত্ব ভিত্তিক পদ্ধতি বলা হয়।[২৬]

বায় মুশারাকার বৈধতা

ইসলামে মুশারাকা পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যবসায়-বাণিজ্য করা বৈধ। আর এ বৈধতা কুরআন এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ মুশারাকা পদ্ধতির বৈধতা ঘোষণা করেছে।

"হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করবে না; তবে তোমাদের পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ"।[২৭]

---

[২৪]. মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭; ড. নাজাতুল্লাহ্ সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১০; মুশাকার সংজ্ঞায় আল-কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে- هو عقد ما يحث بالاختبار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح দ্র. সাদী আবু জীইব, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৫; ইবরাহীম মাদকুর বলেন, الشركة هى عقد بين اثنين او اكثر للقيام بعمل مشترك দ্র. ইব্রাহীম মাদকুর, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮০; উল্লেখ্য, বিভিন্ন মাযহাবের আলিমগণ মুশারাকার সংজ্ঞায় ভিন্ন ভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। যেমন: হানাফী মাযহবের আলিমগণের মতে, الشركة عبارة عن عقد المشاركين فى راس المال والربح দ্র. ড. ওহাবাতুয যুহাইলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৩; মালেকী মাযহাবের আলিমগণের মতে, هى اذن كل من الشركين للاخر فى التصريف ولو بعد العقد দ্র. সাদী আবূ জীইব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫; শাফেঈ মাযহাবের আলিমগণের মতে, هى الاجتماع فى لستحاق وتصريف দ্র. সাদী আবূ জীইব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫; হাম্বলী মাযহাবের আলিমগণের মতে, الشركة عقد يقتضى ثبوت الحق فى شى الاثنين فاكثر على جهة الشيوع দ্র. সাদী আবূ জীইব, প্রাগুক্ত

[২৫]. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

[২৬]. মোঃ আবু তাহের, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫

[২৭]. আল-কুরআন, ৪:২৯

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

সায়িব রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. জাহিলী যুগে আমার ব্যবসায়ী অংশীদার ছিলেন।[২৮]

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি মহানবী স.-এর কাছে এসে বললো, "আমি বাজারে কেনাবেচার কাজ করি, আর আমার অংশীদার মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে থাকেন। মহানবী স. বললেন, হয়তো এ কারণেই তোমাদের কারবারে বরকত হচ্ছে"।[২৯]

আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা. বিশেষ কয়েকটি শর্তে অংশীদারি মূলধন কারবার করতেন। রসূলুল্লাহ স. একথা জানতে পেরে তা অনুমোদন করেন।[৩০]

আবূ নাঈম রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে খাদীজা রা.-এর নিকট থেকে মুনাফা করার শর্তে মূলধন এনে সিরিয়ায় বাণিজ্যে গিয়েছিলেন।[৩১]

হাকীম ইবনে হিযাম রা. ও অনুরূপভাবে মুনাফা দেয়ার শর্তে মূলধন এনে কারবার করতেন।[৩২]

রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "মুশারাকা তথা মুনাফায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যে কারবার করা হয় তাতে বরকত নিহিত থাকে"।[৩৩]

উসমান রা. মূলধন সরবরাহ করে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতেন।[৩৪]

কাসিম ইবনে মুহাম্মদ র. বলেন, "আমার কিছু মূলধন আয়িশা রা.-এর নিকট জমা ছিল। তিনি এ মূলধন মুযারিবাতের নিয়মে কারবারের জন্য দিতেন।"[৩৫]

উমর রা. যায়িদ ইবনে খালিদ রা. -এর সাথে মুনাফায় অংশীদারিত্বের কারবার করতেন (মুদারিবাতের নিয়মে)।[৩৬] উমর রা. বায়তুলমাল থেকে মূলধন সরবরাহ করে মুনাফায় অংশীদারি কারবার (মুদারিবাত) করার পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর নিকট থেকে একথাও জানা যায় যে, তিনি ইয়াতীমের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য তাদের সম্পদ বা অর্থ দ্বারা মুদারিবাত বা মুনাফায় অংশীদারিত্বের নিয়মে কারবার করতেন।[৩৭]

---

[২৮]. كنت شريكى فى الجا هلية ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আত-তিজারাত, অনুচ্ছেদ : আশ-শিরকাতু ওয়াল মুদারাবাহ, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ১৪২৯/২০০৮, পৃ. ২৬১৩

[২৯]. ইমাম শামসুদ্দীন আস্-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

[৩০]. প্রাগুক্ত

[৩১]. প্রাগুক্ত

[৩২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

[৩৩]. প্রাগুক্ত

[৩৪]. আলী আল-খফীফ, *আশ্-শিরকাতু ফীল ফিক্হিল ইসলামী*, আল-কাহেরা: দারুন নাশর, ১৯৬২, পৃ. ৬৩

[৩৫]. প্রাগুক্ত

[৩৬]. ইমাম শামসুদ্দীন আস্-সারাখসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

[৩৭]. প্রাগুক্ত

কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত বর্ণনা এবং সাহাবীগণের কর্মপদ্ধতি দ্বারা মুশারাকা তথা অংশীদারি কারবারের বৈধতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এসব ব্যবসায়ের চুক্তিপত্রের বিশদ বিবরণ ও বিধি-বিধান সম্পর্কে কিছুই অবগত হওয়া যায় না। চুক্তির বিস্তারিত বিধান ফিক্‌হশাস্ত্রবিদগণ প্রণয়ন করেছেন। তারা এ কাজ মহানবী স.-এর নবুওয়াতের প্রথম যুগে মুসলিম সমাজে প্রচলিত যৌথ ও অংশীদারি কারবারের নিয়ম-পদ্ধতিগুলো সামনে রেখেই সেসব নীতিমালার আলোকে করেছিলেন, যা ব্যবসায়-বাণিজ্যের আচার-আচরণ সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।[৩৮]

এ জাতীয় কারবারের বৈধতা প্রসঙ্গে আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে শিরকতের অন্যান্য প্রকারের বৈধতার বিষয়ে ফিক্‌হশাস্ত্রের ইমামগণের মধ্যে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন শাফেঈ মাযহাবে ইনান ও মুদারাবা বাদে সকল প্রকার ব্যবসায়িক পদ্ধতি বৈধ। হাম্বলী মাযহাবে মুদারাবা বাদে সকল প্রকার বৈধ। আর হানাফী মাযহাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ শর্তারোপ ছাড়া সকল প্রকার বৈধ।[৩৯]

আমাদের ফিক্‌হশাস্ত্রবিদগণ মুশারাকা পদ্ধতির বৈধতা প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয়ের প্রতি অধিক জোর দিয়েছেন তা হলো- মানুষের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য কারবারের উল্লেখিত পদ্ধতির বৈধতা অপরিহার্য। প্রায়ই এমন হয় যে, এক ব্যক্তির কাছে মূলধন আছে কিন্তু সে কারবার করতে পারে না বা জানে না। এমনিভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে দু'জন মূলধনের মালিক পৃথক পৃথক কারবার করার পরিবর্তে সম্মিলিতভাবে কারবার করাকে অধিকতর ফলপ্রসূ ভেবে থাকেন। সুতরাং শিরকত বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কারবার তাদের মধ্যে সহযোগিতাকে সহজতর করে দেয়।[৪০]

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি, ইসলাম ব্যবসায়-বাণিজ্যে, মুশারাকা বা অংশীদারিত্ব ভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতিকে বৈধ ও সংগত ঘোষণা করেছে।

মুশারাকার শ্রেণী বিভাগ

ফিক্‌হশাস্ত্রে মুশারাকা বা শিরকাতকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে। মুশারাকা প্রধানত দু'প্রকার।[৪১] যথা:

---

[৩৮]. ড. নাজাতুল্লাহ্ সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[৩৯]. ড. ওহাবাতুয যুহাইলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৫;

[৪০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫

[৪১]. ড. সালেহ ইবনে ফাওরান প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪; বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়া,* বৈরুত: দারু ইহইয়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, ১৪১৬ হি., খ.৩-৪, পৃ. ৬২৪; আব্দুর রহমান আল-জাযায়রী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬০

১. শিরকাতুল আমলাক (شركة الاملاك) বা মালিকানায় অংশীদারিত্ব।
২. শিরকাতুল উকূদ (شركة العقود) বা চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্ব।

১. শিরকাতুল আমলাক (মালিকানায় অংশীদারিত্ব)

কোন রূপ চুক্তি ব্যতীত দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোন বস্তুতে অংশীদার বা মালিক হওয়াকে শিরকাতুল আমলাক (شركة الاملاك) বলা হয়।[৪২]

শিরকাতুল আমলাক বা মালিকানায় অংশীদারিত্ব আবার দু'প্রকার।[৪৩]

ক. শিরকাতুল জাবর (شركة الجبر) বা বাধ্যতামূলক অংশীদারিত্ব।
খ. শিরকাতুল ইখতিয়ার (شركة الاختيار) বা স্বেচ্ছাকৃত অংশীদারিত্ব।

শিরকাতুল জাবর (বাধ্যতামূলক অংশীদারিত্ব)

যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ অবিভাজ্য হওয়ায় যদি মালিকগণ উক্ত সম্পদকে যৌথ মালিকানায় রাখতে বাধ্য হয় তবে তাকে 'শিরকাতুল জাবর' বা বাধ্যতামূলক অংশীদারিত্ব বলা হয়। যেমন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মালামাল অনিচ্ছাকৃতভাবে এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে যায় যে, এগুলোকে প্রকৃত অর্থেই আর পার্থক্য করা যায় না। যেমন মালগুলো একই জাতীয় বস্তু অথবা পার্থক্য করা যায় কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম সাপেক্ষে যেমন গম, যবের সাথে মিশে যাওয়া ইত্যাদি।[৪৪]

শিরকাতুল ইখতিয়ার (স্বেচ্ছাকৃত অংশীদারিত্ব)

যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ বিভাজ্য হওয়া সত্ত্বেও যদি যৌথ মালিকগণ তাদের সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা না করে একত্রে রাখে তবে তাকে 'শিরকাতুল ইখতিয়ার' বা স্বেচ্ছাকৃত অংশীদারিত্ব বলা হয়। যেমন, দুই ব্যক্তিকে কোন মাল হিবা করা হলো বা সাদাকা করা হলো অথবা দুই ব্যক্তি ক্রয়সূত্রে কোন মালের মালিকানা লাভ করলো।

২. শিরকাতুল উকূদ (চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্ব)

চুক্তির মাধ্যমে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মূলধন ও তা থেকে প্রাপ্ত মুনাফায় শরীক বা অংশীদার হওয়াকে 'শিরকাতুল উকূদ' বা চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্ব বলা হয়। যেমন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল, আমি তোমাকে এই কাজে শরীক করলাম। অপর ব্যক্তি বললো, আমি কবুল করলাম।[৪৫]

---

[৪২]. বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৪; আস-সায়্যিদ সাবিক, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৮৮
[৪৩]. সম্পাদনা পরিষদ, *ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*, প্রাগুক্ত
[৪৪]. M. Umar Chapra, Ibid, P. 251
[৪৫]. বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত; মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
وشركة العقود هى: الاشتراك فى التصرف- كالاشتراك فى البيع او الشراء او التاجيز او غير ذالك- দ্র. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান, প্রাগুক্ত; হানাফী আলিমগণের মতে, শিরকাতুল 'উকূদ

শিরকাতুল উকুদ-এর শ্রেণী বিভাগ

শিরকাতুল উকুদ চার প্রকার। তাই ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চার ধরনের মুশারাকা ব্যবসায় পরিচালিত হতে পারে।[৪৬] যথা:

১. শিরকাতুল মুফাওয়াযা (شركة المفاوضة) বা সমঅংশীদারি কারবার

২. শিরকাতুল ইনান (شركة العنان) বা অসম অংশীদারি কারবার

৩. শিরকাতুল সানাঈ (شركة الصنائع) বা পেশাভিত্তিক অংশীদারি কারবার এবং

৪. শিরকাতুল উজুহ (شركة الوجوه) বা সুনাম ভিত্তিক অংশীদারি কারবার

এ প্রকারগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

শিরকাতুল মুফাওয়াযাহ (সম অংশীদারি কারবার)

যে অংশীদারি ব্যবসায়ে পূর্ণবয়স্ক সকল অংশীদার সমপরিমাণ মূলধন যোগান দেয়, প্রত্যেকে সমভাবে কারবার ব্যবস্থাপনায় দায়-দায়িত্ব বহন করে এবং লাভ-লোকসানের দায়িত্বও সমভাবে ভাগ করে নেয় তাকে শিরকাতুল মুফাওয়াযাহ (شركة المفاوضة) বলা হয়।[৪৭]

হচ্ছে- ان يقول احدهما: شاركتك الاخر فى المجلة: عبارة عن عقد شركة بين اثنين، فاكثر، على كون راس المال و الربح مشتركا بينهما দ্র. সা'দী আবূ জীইব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

[৪৬]. বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৪; আব্দুর রহমান আল-জাযায়রী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩; মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩; মোঃ আবু তাহের, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫; হাম্বলী মাযহাবের আলিমগণ শিরকাতুল 'উকূদকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন। উপরোক্ত চার প্রকার ছাড়া আরেকটি হলো- মুদারাবা (مضاربة)। এটিকে তারা মুশারাকা তথা শিরকতের অন্ত র্ভুক্ত করেছেন। দ্র. ড. সালেহ ইবনে ফাওরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪-১২৫। আবার ফিক্হশাস্ত্রে শিরকাতকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:

১. শিরকাতুল ইনান (شركة العنان) বা অসম অংশীদারি কারবার;

২. শিরকাতুল মুফাওয়াযা (شركة المفاوضة) বা সম অংশীদারি কারবার;

শিরকাতুল উজুহ (شركة الوجوه) বা সুনামভিত্তিক অংশীদারি কারবার। দ্র. ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬

[৪৭]. সাদী আবূ জীইব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১; আব্দুর রহমান আল-জাযায়রী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪; মোঃ আবু তাহের, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫ *আল-হিদায়া* গ্রন্থে শিরকাতুল মুফাবিযাহকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে- شركة المفاوضة فهى ان يشترك الرجلان فيتساويا فى مالهما وتصرفهما ودينهما لأنه شركة عامة فى جميع التجارات يفوض كل واحد منهما اشتراك فى كل ماتقدم بأن يفوض احدهما إلى الاخر كل تصرف مالى وبدنى. فيشمل দ্র. বুরহানুদ্দীন মারগীনানী, *আল-হিদায়া*, প্রাগুক্ত; পৃ. ৬২৪-৬২৫;

এ জাতীয় ব্যবসায় বাণিজ্যিক তৎপরতা, ধার-কর্জ, লাভ-লোকসান প্রভৃতিতে অংশীদারগণ সমভাগী হয়। তাছাড়া তারা পরস্পরের জামিনদার ও প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। ফলে তারা তৃতীয় পক্ষের নিকট এককভাবে বা যৌথভাবে দায়ী থাকে। এটি সমবায় কারবারের একটি উত্তম পন্থা। এতে অংশীদারদের মধ্যে অধিকার এবং মর্যাদার ক্ষেত্রেও সমতা থাকতে হবে। অর্থাৎ উভয়েই বা সকলেই যেন প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন এবং মুসলমান হয়। এ কারণে স্বাধীন ও দাসের মধ্যে কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে শিরকাতুল মুফাওয়াযাহ বৈধ নয়।[৪৮]

শিরকাতুল ইনান (অসম অংশীদারি কারবার)

যে অংশীদারি কারবারে অংশীদারগণ অসম মূলধন যোগান দেয়, ব্যবস্থাপনায় অসম অংশ নেয়, লাভের ক্ষেত্রে অসম অংশ নেয় এবং লোকসানের ক্ষেত্রে মূলধনের আনুপাতিক হারে লোকসান বহন করে তাকে 'শিরকাতুল ইনান' (شركة العنان) বলা হয়।[৪৯]

শিরকাতুল ইনান শিরকাতুল মুফাওয়াযার বিপরীত। এ শ্রেণীর অংশীদারি কারবারে সকল অংশীদার সাবালক হওয়া আবশ্যিক নয়। এমনকি সকল অংশীদারের সমপরিমাণ মূলধন যোগান দেয়া এবং সমভাবে লাভক্ষতির বিভাজনও জরুরী নয়। এ পদ্ধতিতে অংশীদারগণ কেবল পরস্পরের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয়; জামিনদার হিসেবে নয়। সুতরাং কারবারে অংশীদারদের পুঁজি অথবা মুনাফা বরাবর না হলে সেটাকে 'শিরকাতুল ইনান' বলা হয়। প্রাচীন আরবে এই জাতীয় কারবারের ব্যাপক প্রচলন ছিল।[৫০]

شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، ويسمى هذا النوع بشركة المفاوضة দ্র. ড. সালেহ ইবনে ফাওরান প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

৪৮. বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৫; ড. নাজাতুল্লাহ্ সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬; ডক্টর মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, খ. ১, পৃ. ১৮৮

৪৯. বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৯; আব্দুর রহমান আল-জাযায়রী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৬২৫; আল-কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে- عند الحنفية: هو ماتضمنت وكالة فقط لا كفالة، وتصح مع التساوى فى المال دون الربح وعكسه، وبعض المال، وخلاف الجنس দ্র. সাদী আবূ জীইব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩; عند المالكية: هى شركة ليس لاحد الشريكين فيها التصرف دون اذن الاخر দ্র. সা'দী আবূ জীইব, প্রাগুক্ত عند الشافعية: هى شركة فى غير مال، كالشركة فى اختطاب واصطياد- দ্র. সা'দী আবূ জীইব, প্রাগুক্ত; عند الحنبلية: ان يشترك رجلان بما ليهما/ اثنان فاكثر بما لين على ان يعملا فيهما بابد انهما والربح بينهما- দ্র. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১২৪; ان يكون الاشتراك فى المال والعمل، وهذا النوع يسمى شركة العنان দ্র. ড. সালেহ ইবনে ফাওরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

৫০. ড. নাজাতুল্লাহ্ সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪; মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে?*, ঢাকা: মাহিন পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮, পৃ. ১৪৩; অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪-১১৫; ডক্টর মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

শিরকাতুস সানাঈ (পেশাভিত্তিক অংশীদারি কারবার)

মিস্ত্রী, কারিগর বা এ ধরনের কায়িক শ্রমিকরা শুধু নিজেদের শ্রমকে পুঁজি করে যখন কোন সমবায় কারবার গড়ে তোলে তখন সেটাকে বলা হয় শিরকাতুস সানাঈ। অর্থাৎ একই পেশার দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যখন কোন মূলধন ছাড়াই নিজেদের পেশাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে যৌথ কারবার শুরু করে এবং অর্জিত আয় পূর্ব স্থিরকৃত চুক্তি অনুপাতে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয় তখন তাকে শিরকাতুস সানাঈ (شركة الصانع) বলে।[৫১]

উল্লেখ্য যে, কারবারের এ পদ্ধতিকে শ্রমভিত্তিক অংশীদারি কারবার (شركة الاعمال), শারীরিক শ্রমভিত্তিক অংশিদারি কারবার (شركة الابدان) এবং স্বেচ্ছায় শ্রমভিত্তিক অংশীদারি কারবার (شركة التقبل)ও বলা হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই অন্য জনের প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হয়। বেশীরভাগ হানাফী নীতিশাস্ত্রবিদের মতে এটা বৈধ। কিন্তু ইমাম যুফার এবং শাফেঈ র. ভিন্ন মত পোষণ করেন।[৫২]

শিরকাতুল উজুহ (সুনাম ভিত্তিক অংশীদারি কারবার)

এটা এমন কারবার যেখানে দুই বা ততোধিক পক্ষের কারো কাছেই কারবার করার জন্য প্রয়োজন পরিমাণ মূলধন নেই। অবশ্য তাদের সকলেরই ব্যবসায়ী সুনাম, সততা ও বিশ্বস্ততার খ্যাতি বিরাজমান। তারা সকলে সুনামের বলে পাইকারি ব্যবসায়ীদের নিকট হতে পণ্যদ্রব্য নিয়ে খুচরা বিক্রয়ের দোকান খুলতে পারে। এরূপ শরীকানা ব্যবসাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'শিরকাতুল উজুহ' (شركة الوجوه) বলা হয়। এরূপ শরীকানা ব্যবসায়ে দোকানের আয় হতে খরচ বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকবে তারা তা নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিবে। এক্ষেত্রেও শরীক অন্য শরীকের প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং যখন দুই বা ততোধিক অংশীদার কোন মূলধন ছাড়াই নিজেদের সুনাম, পরিচিতি, মর্যাদা ও বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে বাকীতে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে নগদ বিক্রি করে তাতে যে লাভ-লোকসান হয় তা প্রত্যেকে

---

[৫১]. বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, ৬৬২-৬৬৩; আব্দুর রহমান আল-জাযায়রী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪; ডক্টর মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, প্রাগুক্ত; মাওলানা আব্দুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭; মোঃ আবু তাহের, প্রাগুক্ত; আল-কাসানী বলেন,

وهى ان يشترك على عمل من الحياطة او القصارة او غيرهما فيقولا اشتركنا على ان نعمل فيه على ان ما رزق الله عز وجل من اجرة فهى بيننا على شرط كذا۔

দ্র. *আল-কাসানী, বাদাই'উস সানাঈ ফী তারতীবিশ শারাঈ*, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী ১৪০৩/১৯৮২ খ্রি. খ.৬, পৃ. ৫৭

[৫২]. মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২; ডক্টর মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯;

পূর্বে স্থিরকৃত চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করে নেয় তখন এ ধরনের চুক্তিকে শিরকাতুল উজুহ (شركة الوجوه) বলা হয়।[৫৩]

মোটকথা, যে যৌথ কারবারে কোন মূলধন থাকে না কিন্তু অংশীদারগণ নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে কারবার করে থাকে তাকে 'শিরকাতুল উজুহ' বলা হয়।[৫৪]

বায় মুশারাকার শর্তাবলী

বায় মুশারাকার প্রধান শর্তসমূহ নিম্নরূপ:[৫৫]

১. চুক্তি সম্পাদন

মুশারাকা ব্যবসায়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি সম্পাদনই হলো এর মূলভিত্তি। উপর্যুক্ত সাক্ষীর সাক্ষরযুক্ত চুক্তিতে ভবিষ্যতের বিরোধ এড়ানোর জন্য এতে সম্ভাব্য সকল বিষয়ের উল্লেখ থাকতে হবে।

২. ব্যবসায় নিয়োজিত মূলধন

ক. অংশীদারগণ সম অথবা অসমভাবে মূলধন যোগান দিতে পারে;

খ. মূলধন নগদ অর্থে অথবা সম্পদে দেয়া যায়। সম্পদে দিলে এর মূল্য কোন দক্ষ মূল্যায়নকারী দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে। এই নির্ধারিত মূল্য সংশ্লিষ্ট অংশীদারের শেয়ার মূলধন হিসেবে বিবেচিত হবে;

গ. অংশীদারদের বিনিয়োগকৃত মূলধন একটি একক তহবিল হিসেবে পরিগণিত হয়;

ঘ. "লাভের জন্য ঝুঁকি বহন" এ নীতির উপর ভিত্তি করে মুশারাকা কারবার পরিচালিত হয়। তাই কোন অংশীদার অপর অংশীদারের মূলধনের নিরাপত্তা দিতে পারে না।

৩. অংশীদারদের ক্ষমতা

অন্যান্য অংশীদারের যাতে স্বার্থহানী না হয় সেদিকে অংশীদারের যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোন প্রকার অবহেলা, অসদাচরণ, চুক্তির পরিপন্থী কোন

---

[৫৩]. আব্দুর রহমান আল জাযায়রী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫; ইবনে কুদামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২; বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৩;

عند الحنفية والشافعية والحنبلية والجعفرية: هى ان يشترك اثنان فيما يشتريان بجاهدهما، وثقة التجاربهما، من غير ان يكون لها راس مال، ويبيعان ما اشتريا والربح بينهما على ما اتفقا- দ্র. সা'দী আবূ জীইব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪; *আল মুলাখ্খাসুল ফিকহী* -তে বলা হয়েছে-"اشتراك فى التحمل بالذمم دون مال، وهذا مايسمى بشركة الوجوه" দ্র. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

[৫৪]. ড. নাজাতুল্লাহ্ সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

[৫৫]. মোঃ আবু তাহের, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬-১৮

কাজ, ব্যক্তিগত স্বার্থ ইত্যাদি ব্যতীত সাধারণ অবস্থায় প্রত্যেক অংশীদারের মুশারাকার সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদির অধিকার রয়েছে।

৪. ব্যবস্থাপনা

ব্যবসার সাধারণ নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক অংশীদার মুশারাকা কারবারের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। সকল অংশীদার একমত থাকলে যে কোন একজন অথবা সুনির্দিষ্টভাবে কয়েকজন ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করে ব্যবসায়য় পরিচালনা করতে কোন বাধা নেই। যদি সকলে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে তবে চুক্তির শর্তানুযায়ী সকল বিষয়ে একে অপরের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হয় এবং সাধারণ অবস্থায় প্রত্যেকের কাজ সকলের কাজ হিসেবে গণ্য হয়।

৫. ব্যবসায়ের লাভ

ক. ব্যবসায় লাভ অবশ্যই হিসেবের মধ্যে থাকবে, যাতে তা বন্টনের সুবিধা হয় এবং চুক্তি বিলুপ্তির সময় কোন প্রকারের বিরোধ দেখা না দেয়।

খ. ব্যবসায়ের অর্জিত লাভের উপর মুনাফা বন্টনের অনুপাত প্রয়োগ হবে। মূলধনের উপর কোন নির্ধারিত হার অথবা কোন নির্ধারিত বা অনির্ধারিত অংশ কখনও মুনাফা বন্টনের ভিত্তি হতে পারে না।

গ. চুক্তির শর্তানুযায়ী অংশীদারগণের মধ্যে অর্জিত লাভ মূলধন অনুপাতে বণ্টিত হতে পারে।

ঘ. কোন সক্রিয় অংশীদারের মুনাফা প্রাপ্তির অনুপাত অন্যদের তুলনায় বেশী হতে পারে।

ঙ. সকল অংশীদারের মুনাফা প্রাপ্তির অনুপাত কম-বেশী হতে পারে।

৬. ব্যবসায়ের লোকসান

এ ধরনের ব্যবসায়ের লোকসান সকল অংশীদারের মধ্যে তাদের স্ব-স্ব মূলধন অনুপাতে বণ্টিত হয়।

৭. ব্যবসায় বিলোপ

ক. চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে এবং লক্ষ্য অর্জিত হলে মুশারাকা ব্যবসার বিলুপ্তি ঘটে।

খ. চুক্তির শর্তানুযায়ী কোন অংশীদার যে কোন সময় অন্য অংশীদারদের বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে মুশারাকা বিলোপ ঘটাতে পারে।

গ. কোন অংশীদারের মৃত্যু হলে অথবা কোন অংশীদার বিকৃত মস্তিষ্ক, উন্মাদ, পাগল, কাণ্ডজ্ঞানহীন হলে এবং কারবার পরিচালনায় অযোগ্য বিবেচিত হলে মুশারাকা কারবারের বিলুপ্তি ঘটে।

ঘ. যদি কোন অংশীদার কারবারের বিলুপ্তি চায় পক্ষান্তরে অন্য অংশীদার ব্যবসায় চালু রাখার পক্ষপাতী হয় তখন পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে কারবার চালু রাখা যেতে পারে।

বায় মুশারাকা ও বায় মুদারাবার মধ্যে পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ:[৫৬]

ক্র. নং	বায় মুশারাকা	বায় মুদারাবা
০১.	দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত অংশীদারিত্বই বায় মুশারাকা।	এক পক্ষের মূলধন এবং অন্য পক্ষের শ্রম, মেধা ও সময় দিয়ে পরিচালিত কারবারের নাম বায় মুদারাবা।
০২.	সকল অংশীদার মূলধন যোগান দেয়।	শুধু সাহিব আল-মাল মূলধন যোগান দেয়।
০৩.	সকল অংশীদার কারবার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে।	শুধু মুদারিব কর্তৃক কারবার পরিচালিত হয়। সাহিব আল-মালের কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণের কোন অধিকার নেই।
০৪.	সকল অংশীদার মূলধন অনুপাতে লোকসান বহন করে।	সাধারণত মুদারিব কোন আর্থিক ক্ষতি বহন করে না। কেননা মুদারিব কোন মূলধন বিনিয়োগ করে না। কারবারের যাবতীয় লোকসান একমাত্র সাহিব আল-মাল বহন করে। মুদারিবের শুধু শ্রম ও সময় নষ্ট হয়। তবে মুদারিবের অবহেলা, অসদাচরণ, অব্যবস্থাপনা, চুক্তিভঙ্গ প্রভৃতি কারণে লোকসান হলে তা মুদারিবকেই বহন করতে হবে।
০৫.	সাধারণত অংশীদারগণের দায়-দায়িত্ব সীমাহীন। এজন্য সম্পদের চেয়ে অতিরিক্ত দায় প্রত্যেক অংশীদারকে আনুপাতিক হারে বহন করতে হয়। তবে যদি	যদি সাহিব আল-মাল মুদারিবকে তার পক্ষ থেকে ঋণ গ্রহণের অনুমতি না দেয় তবে তার দায় তার মূলধনের মধ্যে সীমিত থাকে।

[৫৬]. মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৯; মোঃ আবু তাহের, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮

	সকল অংশীদার একমত হয় যে, কোন অংশীদার কোন ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না; তবে অতিরিক্ত দায় সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতা অংশীদারকেই বহন করতে হয়।	
০৬.	মুশারাকার সকল সম্পদ অংশীদারগণের যৌথ মালিকানায় পরিগণিত হয়। সুতরাং লাভ না হলেও সম্পদের মূল্য বৃদ্ধির সুবিধা সকলে পেয়ে থাকে।	মুদারিব শুধু ব্যবসায়ে লাভের ভাগীদার, তাই সে সম্পদের মূল্য বৃদ্ধির কোন অংশ পায় না। এটা সাহিব আল-মালের প্রাপ্য।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি, ব্যবসায়-বাণিজ্যে অংশীদারি পদ্ধতিতে অর্থায়ন ইসলামী অর্থনীতিকে বিশ্ববাজারে একটি গতিশীল অর্থব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আগামী দিনে ইসলামী অর্থব্যবস্থার সুফল ইসলামের বাণিজ্যনীতির মাধ্যমে গণমানুষের কাছে পৌছানোর ক্ষেত্রে অংশীদারি পদ্ধতিতে অর্থায়ন ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে এটাই বিশ্ব মুসলিমের একান্ত প্রত্যাশা।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮ সংখ্যা-৩১
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১২

নারী-পুরুষের বিবাহে ধর্ম প্রসঙ্গ : একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম*

[**সারসংক্ষেপ :** *ইসলামী জীবনাদর্শে পরিবার গঠনের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে বিবাহ। অন্যান্য ধর্মব্যবস্থায়ও একই নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। আর বিবাহ শরীয়ত সমর্থিত এমন একটি বন্ধন যা নারী কর্তৃক পুরুষের এবং পুরুষ কর্তৃক নারীর পারস্পরিক দৈহিক সম্পর্কের বৈধতার স্বীকৃতি প্রদান করে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ আকাঙ্ক্ষা করে যে, তার সুখ্যাতির স্থায়ীহোক আর তা বংশধর অবশিষ্ট থাকা ব্যতীত সম্ভব নয়। বিবাহ ব্যতীত এ চাহিদা জোরপূর্বক পূরণ করলে তাতে সমাজে অনাচার ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ইসলাম এজন্য কিছু বিধিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এসবের মধ্যে ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা অত্যাবশ্যক। আলোচ্য নিবন্ধে ইসলাম ও প্রচলিত আইনে বিবাহনীতিতে ধর্মের অবস্থান প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।*]

বিবাহ-এর সংগা

আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহ শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হলো নিকাহ (نكاح)। আভিধানিক অর্থ হলো : মিলানো, একত্র করা, সহবাস, চুক্তি ইত্যাদি। এটি نَكَحَ শব্দের মাসদার। যেমন বলা হয় نكح فلان امرأة 'অমুক মহিলাটিকে বিবাহ করেছে'।[১]

এ শব্দটি আল-কুরআনে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তবে নারীদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে যাদের ভাল লাগে তাদের বিবাহ করো।"[২]

পারিভাষিক অর্থ

বিবাহ-এর পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে মনীষীগণ বিভিন্ন রকম অভিমত প্রদান করেছেন। যেমন : আবুল ফারায যাইনুদ্দীন ইবনে রাজাব র. বিবাহের সংজ্ঞা প্রদান করে বলেন- النكاح عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالأخر.

"বিবাহ হলো এমন একটি চুক্তি যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন বৈধ হয়।"[৩]

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

১. ইবনে মানযূর, লিসানুল আরাব, ইরান : নাশরু আদাবিল হাওযাহ, ১৪০৫, খ. ২, পৃ. ৬২৫

২ . আল-কুরআন, ৪ : ৩ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

৩. ইবনে রাজাব, কাওয়া'ইদুল ফিকহিয়্যাহ, বৈরূতঃ দারু ইহই য়াইউত তুরাছিল আরাবী, তা. বি., খ. ১, পৃ. ৭১৮

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফিকহবিদ আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী র. বলেন :

النكاح عقد بغير حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع.

"বিবাহ এমন একটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চুক্তি যা দ্বারা কোন পুরুষকে এমন কোন নারীর সাথে দৈহিক মিলনের অধিকার দেয়া যার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তে কোন বাধা নেই।"[৪]

এ প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞানী Malinowski বলেন : "বিবাহ হলো সন্তান উৎপাদন ও পালনের একটি চুক্তিপত্র।"[৫]

Edward Westernarck Zuvi The History of Human Marriage নামক গ্রন্থে বলেন : "বিবাহ হচ্ছে নারী ও পুরুষের এমন একটি সম্পর্ক যা কেবল সন্তান জন্মদান পর্যন্তই স্থায়ী হয় না বরং এরপরও কিছুদিন অন্তত স্থায়ী হয়।[৬]

হানাফী মাযহাব মতে, বিবাহ এমন একটি বন্ধন যা নারী ও পুরুষের দৈহিক সম্পর্কের অনুমতি প্রদান করে।[৭]

মালেকী মাযহাব মতে, নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে মাহরাম (নিষিদ্ধ), অগ্নি উপাসক ও আহলি কিতাব দাসী ব্যতীত অন্য নারীর সাথে বন্ধনই বিবাহ।[৮]

শাফিঈ মাযহাবের মতে, 'নিকাহ' (نكاح) বা 'যাউজ' (زوج) অথবা অনুরূপ শব্দের মাধ্যমে দৈহিক সম্পর্ক বৈধ করার বিধান অন্তর্ভুক্তকারী বন্ধনই বিবাহ।[৯]

হাম্বলী মাযহাব মতে, নিকাহ মূলতঃ বিবাহ বন্ধনের চুক্তি। অর্থাৎ এমন বন্ধন যা নিকাহ বা যাউজ অথবা তার অনূদিত শব্দের ভিত্তিতে বিবেচ্য হয়ে থাকে।[১০]

মোটকথা বিবাহ হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত এমন একটি সামাজিক চুক্তি যার মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারী একত্রে বসবাস করার বৈধতা অর্জন করে। সুতরাং বলা যায়, মানুষের যৌনকর্ম সম্পাদন এবং বংশ রক্ষার জন্য দু'জন নর-নারীর মধ্যে সমাজে আইন ও ধর্ম স্বীকৃত পন্থায় যে দাম্পত্য বন্ধনের সূচনা করা হয় তা-ই বিবাহ।

---

৪. ফাতওয়ায়ে শামী, তা. বি., খ. ৩, পৃ. ৩-৫

৫. নাহিদ সাবরিনা আলম,সমাজ বিজ্ঞান, তা. বি., পৃ. ৯৫

৬. Westermarck, Edward Alexander (1903). The History of Human Marriage. Macmillan and Co., Ltd., London. ISBN 1402185480 (reprint).

৭. আশ-শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, বৈরূত : দারু ইয়াহইয়ায়িত্তুরাছি আরাবী তা.বি., খ. ৩, পৃ. ৯৯

৮. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ আস-সাভী, আশ্‌শারাহ আস্‌সাগীর ওয়া হাশিয়াহ আস্‌সাভী, আল-কাহেরা : দারুল মাআরি, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৩৩২

৯. ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০৫, খ. ৩, পৃ. ১২৩

১০. প্রাগুক্ত

বিবাহ প্রথার মূলে

ক. বিবাহ দ্বারা নারী-পুরুষ একে অপরের সাথে প্রশান্তি, পরিতৃপ্তি, সহমর্মিতা ও ভালবাসার বৈধতাকে বুঝায়। এ প্রসঙ্গে আমরা পৃথিবীর প্রথম নারী সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে যদি একটু আলোচনা করি তাহলে স্পষ্ট বুঝতে পারবো। হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আদম আ. কে সৃষ্টির পর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। এরপর তাঁর বাম পাঁজর হতে হাড় নিয়ে সেই স্থানটি গোশত দ্বারা পূর্ণ করা হলো। ইত্যবসরে উক্ত হাড় দ্বারা তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হলো।[১১]

> মহান আল্লাহ্ আদম আ. থেকে হাওয়াকে এ জন্য সৃষ্টি করেছেন যাতে একে অপরের জন্য শান্তি বহন করতে এবং একত্রে বসবাস করতে পারেন। হাওয়া এর সৃষ্টি সম্পর্কে হাদীসসমূহের পাশাপাশি বাইবেল এর আদিপুস্তকে[১২] এভাবে এসেছে : "সদাপ্রভূ ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করিলে তিনি নিদ্রিত হইলেন; আর তিনি তার একখানি পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা সেই স্থান পূর্ণ করিলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে একজন নারী নির্মাণ করিলেন ও তাহাকে আদমের নিকট আনিলেন।"[১৩]

---

১১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.সহ অন্যান্য মুফাস্সির হতে বর্ণিত :

عن ابن عباس وغيره أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها فلما كشف عنه السنة وهب من نومه رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم لحمي ودمي وزوجتي.

"ইব্নে আব্বাস রা. ও অন্যান্য মুফাস্সিরগণ বলেন : আদম আ. কে সৃষ্টির পর তাঁকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করা হল এবং তাঁর বাম পাঁজর হতে একখানা হাড় নিয়ে সে স্থানটি গোশ্ত দ্বারা পূর্ণ করা হলো। তখনও আদম আ. নিদ্রিত ছিলেন। ইত্যবসরে উক্ত হাড় দ্বারা তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হল যেন তিনি তাঁর সাহচর্যে পরিতৃপ্ত থাকেন। যখন তাঁর তন্দ্রাচ্ছন্নতা কাটল এবং তিনি নিদ্রা হতে জাগ্রত হলেন, তখন হাওয়াকে তাঁর পাশে উপবিষ্ট দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন : আমার গোশ্ত, আমার রক্ত ও আমার স্ত্রী।"
ইমাম নববী, শারহুন নববী আলা সহীহ মুসলিম, তা. বি., খ. ১০, পৃ. ৫৩; ইবনে কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, মিশর : দারুল ফিকরিল 'আরবী, তা.বি., খ. ১, পৃ. ১৩৩

১২. আদিপুস্তক : আদি শব্দের অর্থ উৎপত্তি। বিশ্বসৃষ্টি, মানব জাতির উৎপত্তি, পাপের আরম্ভ ও পৃথিবীতে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের আরম্ভ এবং মানুষের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্কের কথা যে পুস্তকটিতে বলা হয়েছে তাকে আদিপুস্তক বলে। আদি পুস্তক দু'টি ভাগে বিভক্ত। এক. ১-১১ অধ্যায়, এ অংশে পৃথিবী সৃষ্টি এবং মানবজাতির আদিকালের কাহিনী। দুই. ১২-৫০ অধ্যায়, এ অংশে ইসরাঈল জাতির পূর্বসূরীদের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, আদিপুস্তক, ভূমিকা, পৃ. ১

১৩. বাইবেলের বর্ণনায় এসেছে :

"And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead

হাদীসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, "জান্নাতে আদম আ. অবস্থানপূর্বক সেখানে ইচ্ছামত চলাচল করতে লাগলেন। তখন তাঁর কোন স্ত্রী ছিল না যার দ্বারা তিনি শান্তি লাভ করতে পারেন। অতঃপর তিনি সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন এবং যখন জাগ্রত হন তখন তাঁর মাথার কাছে একজন নারীকে বসা দেখেন, যাকে আল্লাহ তাঁর পাজরের হাড় হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁকে প্রশ্ন করা হলো : তুমি কে? সে বলল : আমি নারী। এরপর আদম আ. তাঁকে বললেন : তোমাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? সে বলল : যাতে তুমি আমার দ্বারা শান্তি পেতে পারো"[১৪]

বিবাহ্ প্রথা চালু হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে, পুরুষের নিঃসঙ্গতা দূরীকরণ ও স্বস্তিলাভ, যাতে সে শান্তি পায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেন : "তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে সে শান্তি পায়।..." [১৫] অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন : "আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ কর এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া। নিশ্চয় এতে ঐ সকল লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা গভীরভাবে চিন্তা করে।"[১৬]

---

thereof; And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.Ó-Holy Bible, Genesis, 2 : 21-22, P. 3.

১৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত :

عن ابن مسعود قال : أسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشيا ليس له زوج يسكن إليها فنام نومة فاستيقظ فإذا ثم رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فسألها من أنت قالت امرأة قال ولم خلقت قالت لتسكن إلي قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ علمه ما عدا يا آدم قال حواء قالوا لم سميت حواء قال لأنها خلقت من شيء حي.

-ইমাম নববী, শারহুন নববী আলা সহীহ মুসলিম, খ. ১০, পৃ. ৫৩। বিভিন্ন গ্রন্থে কিছু শব্দের পরিবর্তনে উক্ত বিষয়টি এসেছে। ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, খ. ৯, পৃ. ৪৮৫, হাদীস নং-৪১৭৭; আয মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দিল বাকী, শারহুয যারকানী, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১, খ. ৩,পৃ. ২৯২।

১৫. আল-কুরআন, ৭: ১৮৯ ...هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

১৬. আল-কুরআন, ৩০ : ২১ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ের (لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا) 'যাতে তার কাছে সে শান্তি পায়' এবং (لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) 'যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও' আয়াত দু'টি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ্ পুরুষদের জন্য স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের সান্নিধ্যে শান্তি লাভ করতে পারে। মূলতঃ বেহেশ্‌তে আদম আ. এর নিঃসঙ্গতা দূরীকরণ ও শান্তি লাভের জন্যই হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহর অনেক নিদর্শনসমূহ হতে এটাও একটি অনন্য নিদর্শন।

এ অংশের ব্যাখ্যায় আদওয়াউল বায়ান নামক তাফসীর গ্রন্থে এসেছে : মহান আল্লাহ্ হাওয়াকে আদম থেকে সৃষ্টি করেছেন যাতে হাওয়ার দ্বারা তিনি শান্তি লাভ করেন।[১৭] হাওয়া এর প্রতি আদম আ. এর ভালবাসায় আসক্ত হওয়া প্রসঙ্গে বাইবেলে এসেছে :

> "সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে একজন স্ত্রী নির্মাণ করিলেন ও তাঁহাকে আদমের নিকট আনিলেন। তখন আদম কহিলেন, এইবার (হইয়াছে); ইনি আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস; ইহার নাম নারী হইবে, কেননা ইনি নর হইতে গৃহীত হইয়াছেন। এই কারণে মানুষ আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে এবং তাহারা একাঙ্গ হইবে।"[১৮]

কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আদম আ. এর মানসিক প্রশান্তি ও নিঃসঙ্গতা দূরীকরণের জন্যই হাওয়া আ. এর সৃষ্টি। মহান আল্লাহ্ বিবাহের মাধ্যমে পুরুষের জন্য স্ত্রী এবং স্ত্রীর জন্য স্বামীর ব্যবস্থা করেছেন এবং তাদের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন। আর এ ভালবাসার কারণে স্বামী তার স্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করে। স্ত্রী সন্তান প্রসব করে এবং স্বামীর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়। এ কারণে স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে।

স্বামী-স্ত্রীর বৈধ সম্পর্ক স্থাপনের মূলে আরো রয়েছে পৃথিবীর সর্বত্র মানবজাতি ছড়িয়ে দেয়া। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন : "হে মানব! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে, যিনি পয়দা করেছেন তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে এবং যিনি পয়দা করেছেন

---

১৭. শানকীতী, আদওয়াউল বায়ান, তা. বি., খ. ২, পৃ. ১৪৯; আলূসী, রূহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আজীম ওয়াস সাবয়িল মাছানী, তা. বি., খ. ৬, পৃ. ৪৭৫

১৮. বাইবেলের বর্ণনায় এসেছে :

"And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.Ó-Holy Bible, Genesis, 2 : 22-24, P. 3.

তার থেকে তার জোড়া,আর ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের দু'জন থেকে অনেক নর ও নারী।"[১৯] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন : "হে মানব! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে এবং তোমাদেরকে পরিণত করেছি বিভিন্ন জাতিতে ও বিভিন্ন গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার।"[২০]

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে আদম আ. ও তাঁর স্ত্রীর মাধ্যমে পৃথিবীতে মানবজাতি ছড়িয়ে দেয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ স্বীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী আদম আ. তাঁর সঙ্গিনী হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাঁদের উভয় থেকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাভেদে পৃথিবীর সকল মানব-মানবীকে সৃষ্টি করেছেন। আদম আ. কে সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল তিনি এ পৃথিবীতে তাঁর খলীফা পাঠাবেন। এর অপরিহার্য অবলম্বন হিসেবেই তিনি হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানবজাতি ছড়িয়ে দিয়েছেন।

বিবাহের রুকন

বিবাহের রুকন (আবশ্যক উপাদান) নিয়ে ফকীহগণ একাধিক অভিমত দিয়েছেন। হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মতে, বিবাহের রুকন হল প্রস্তাব ও কবুল। মালিকী মাযহাব মতে, বিবাহের রুকনগুলো হল, ওলী বা অভিভাবক, পাত্র-পাত্রী (বর ও কনে) এবং বিবাহের শব্দরূপ। শাফিঈ মাযহাব মতে, বিবাহের রুকন পাঁচটি। যথা : বিবাহ সংঘটিত হওয়ার শব্দরূপ, স্বামী, স্ত্রী, স্বাক্ষীদ্বয় ও অভিভাবক। হাম্বালী মাযহাব মতে, বিবাহের রুকন তিনটি। যথা : বর-কনে, প্রস্তাব ও কবুল।[২১]

বিবাহের ক্ষেত্রে কুফু নির্ধারণ

বর ও কনের সমান-সমান ও একের সাথে অপরজনের সামঞ্জস্য হওয়াকেই কুফূ বলে। বিয়ের উদ্দেশ্য যখন স্বামী-স্ত্রীর মনের প্রশান্তি লাভ, উভয়ের সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষা, তখন উভয়ের মধ্যে যাতে সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা পায় তা নিশ্চিত করা একান্ত কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন : "সেই আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পানি

---

১৯. আল-কুরআন, ৪ : ১ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...

২০. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا...

২১. ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩৯; আলাউদ্দীন আল-কাসানী, বাদাইউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারায়ি, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৮২, খ. ২, পৃ. ২২৯

থেকে, তার পরে তাকে পরিণত করেছেন বংশ ও শ্বশুর-জামাতার সম্পর্কে। আর তোমার আল্লাহ্ বড়ই শক্তিমান" ।[২২] আর ইসলামে বিবাহের কুফু-এর ক্ষেত্রে প্রধান ও উল্লেখযোগ্য বিষয়ই হলো বর ও কনেকে মুসলিম হতে হবে।

কুফূ পরিচিতি

كفء কুফূ শব্দের আভিধানিক অর্থ সমতুল্য, বরাবর। যেমন বলা হয় هذا كفاء و এটা ওটার অনুরূপ هذاكفيئ এটা ওটার সমপর্যায়ের هذا كفؤه এটা ওটার সমকক্ষ বা সমান। كفء শব্দটি أكفاء শব্দের একবচন।

কুফূ-এর প্রকৃতি

কুফু-এর বিধান সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী র. বলেন : কুফূ-যা ইসলামের বিশেষজ্ঞদের নিকট সর্বসম্মত ও গৃহীত তা গণ্য হবে দীন পালনের ক্ষেত্রে। কাজেই মুসলিম মেয়েকে কাফিরের নিকট বিয়ে দেয়া যেতে পারে না।[২৩]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল র. বলেন : কুফূ-এর হিসেব হবে দীনদারীর দৃষ্টিতে। আর এ কারণেই কোনো মুসলিম মেয়েকে কোনো কাফির পুরুষের নিকট বিয়ে দেয়া যেতে পারে না। আবার কোনো মুসলিম পুরুষকে কোনো কাফির মেয়ের সাথে বিয়ে দেয়া যেতে পারে না। এটা ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত।[২৪]

আল-কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণায় এ ইজমার ভিত্তি উদ্ধৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের ঘোষণা হলো : "ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারী কিংবা মুশরিক নারীকে বিয়ে করবে, পক্ষান্তরে ব্যভিচারী নারীকে অনুরূপ ব্যভিচারী কিংবা মুশরিক পুরুষ ছাড়া আর কেউ বিয়ে করবে না। মুমিনদের জন্য তা হারাম করে দেয়া হয়েছে" ।[২৫]

এ আয়াতের শেষ শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, ঈমানই ব্যভিচারী নারী অথবা পুরুষকে বিয়ে করতে ঈমানদার লোকদের বাধা দেয়। যে তা করবে সে হয় মুশরিক হবে, নয় ব্যভিচারী। কেননা যেনা-ব্যভিচার বংশ নষ্ট করে আর যেনাকারীর সাথে বিয়ে সম্পর্ক স্থাপনে পাপিষ্টের সাথে স্থায়ীভাবে একত্রে বসবাস-সহবাস করা অপরিহার্য হয়। অথচ আল্লাহ্ এ ধরনের সম্পর্ক হারাম ঘোষণা করেছেন।

---

২২. আল-কুরআন, ২৫ : ৫৪ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

২৩. আল্লামা বদরুদ্দীন আল-'আইনী বলেন : أن الأكفاء الاتي بالإجماع هي أن يكون في الدين فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بالكافر - আল-আইনী, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি., খ. ২৯, পৃ. ২১৫

২৪. ড. আহমাদ ফাতহী, আস-সরুর *আস-সিয়াসাতুল জিনাইয়া ফীশ শারীআতিল ইসলামিয়্যাহ,* মিশর : দারুন নুহজাতুল আরাবীয়্যাহ, ১৯৮৮, পৃ. ১০

২৫. আল-কুরআন, ২৪ : ৩ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

অপরদিকে ব্যভিচারী পুরুষ ঈমানদার নারীর জন্য এবং ব্যভিচারী নারী ঈমানদার পুরুষের জন্য কুফ্‌ নয়। কেননা স্বভাব-চরিত্র ও বাস্তব কাজের দিক দিয়ে এ দুই শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এ দু'য়ের মধ্যে মনের মিল, চরিত্র ও স্বভাবের ঐক্য হওয়া, হৃদয়ের সম্পর্ক দৃঢ় হওয়া, নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করা এবং প্রাণের শান্তি ও স্বস্তি লাভ যা বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য, সেটি কখনো সম্ভব হবে না। মহান আল্লাহ্ কুরআনের অন্য এক আয়াতে বলেছেন : "মুমিন কি কোনোক্রমেই ফাসিকদের সমান হতে পারে না, এরা কখনই সমান নয়।"[২৬] অর্থাৎ মুমিন ও ফাসিক এক নয়, নেই এদের মধ্যে কোনো রকমের সমতা ও সাদৃশ্য। অতএব মুমিন নারী বা পুরুষ কখনই ফাসিক, কাফির বা মুশরিক নারী বা পুরুষের জন্য কুফ্‌ নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন : "দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য; দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য"।[২৭]

মোটকথা বিয়ের ব্যাপারে নারী-পুরুষের মধ্যে কুফ্‌-এর বিচার অবশ্যই করতে হবে। আর সে কুফ্‌ হবে নৈতিক চরিত্র ও দীনদারীর দিক দিয়ে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "যখন তোমাদের নিকট বিয়ের জন্য দীনদারী চরিত্র ও জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন কোন প্রস্তাব আসবে তখন তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে"।[২৮]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আশ-শাওকানী র. বলেন :

فيه دليل على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق.

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, দীনদারী ও চরিত্রের দিক দিয়ে কুফ্‌ আছে কিনা, বিয়ের সময় তা অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে।[২৯]

ইমাম মালিক র. বলেছেন - وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك

"বিয়ের কুফ্‌ কেবল দীনদারীত্বের দিক দিয়েই বিচার করতে হবে, অন্য কোনো দিক দিয়ে নয়।"[৩০]

---

২৬. আল-কুরআন, ৩২ : ১৮ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

২৭. আল-কুরআন, ২৪ : ২৬ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

২৮. আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه-ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৩৯৪

২৯. মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবন মুহাম্মদ, আশ-শাওকানী, নাইলুল আওতার, লেবানন : ইদারাতুত ত্বাবাআতুল মুনীরিয়্যাহ, তা.বি., খ. ৬, পৃ. ১৮৭

এ হলো ইসলামের আদর্শিক দৃষ্টিকোণ। কিন্তু এ আদর্শিক দৃষ্টিকোণের বাইরে বাস্তব সুবিধা-অসুবিধার বিচার ও বিয়ের ব্যাপারে অগ্রাহ্য বা উপেক্ষিত হওয়া উচিত নয়। কেননা বিয়ে বাস্তবভাবে দাম্পত্য জীবন যাপনের বাহন। এজন্য স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যথাসম্ভব সার্বিক ঐক্য ও সমতা না হলে বাস্তব জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। এ কারণে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিও যথাযোগ্য গুরুত্ব সহকারে গণ্য ও গ্রাহ্য। ইসলামের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষীও এর অনুকূলে মত দিয়েছেন। ইমাম আল-খাত্তাবী র. বলেন :

والكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء بالدين والحرية والنسب والصناعة. ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب واليسار فيكون جماعها ست خصال.

"বহু সংখ্যক মনীষীর মতে চারটি বিষয়ে কুফূ-এর বিচার গণ্য হবে-দীনদারী, স্বাধীন, বংশ ও শিল্প-জীবিকা। তাদের অনেকে আবার দোষত্রুটিমুক্ত ও আর্থিক সচ্ছলতার দিক দিয়েও কুফূ-এর বিচার গণ্য করেছেন। ফলে কুফূ বিচারের জন্য মোট শর্ত হলো ছয়টি।"[৩১]

ঠিক একইভাবে কাফির বা মুশরিক মহিলা কোন মুসলিম পুরুষের জন্য, আবার কোনো কাফির বা মুশরিক পুরুষ কোনো মুসলিম নারীর জন্য বিয়ে করা হারাম। দীনের পার্থক্যের কারণেই এ ধরনের বিয়ে স্থায়ীভাবে হারাম করে দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন : "তোমরা কাফির মহিলাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করো না।"[৩২]

এ আয়াতের ভিত্তিতে আল্লামা আশ-শাওকানী র. বলেন :

والمعنى أن من كانت له امرأة كافرة فليست له بامرأة لانقطاع عصمتها باختلاف الدين.

এ আয়াতের মর্ম হলো যে, ব্যক্তির স্ত্রী কাফির সে আর তার স্ত্রী হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা দীন ভিন্ন হওয়ার কারণে এ দু'য়ের মাঝে বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে।[৩৩]

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, "তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ রা. একজন ইয়াহুদী মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন এবং হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. একজন খ্রিস্টান মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। উমর রা. এ সংবাদ জানতে পেরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। এমনকি তিনি যেন তাদেরকে চাবুক মারতে উদ্যত হন। ঐ দুই মহান ব্যক্তি বললেন : হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না। আমরা তাদেরকে তালাক দিয়ে দিচ্ছি। তখন উমর রা. বললেন, তালাক দেয়া যদি হালাল

---

৩০. প্রাগুক্ত

৩১. আবূ সুলায়মান হামদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল-খাত্তাবী, বৈরূত : দারুল কালম, তা.বি., খ. ২, পৃ. ২৬৫

৩২. আল-কুরআন, ৬০ : ১০ ... وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ...

৩৩. আশ-শাওকানী, ফাতহুল কাদীর আল-জমিউ বাইনা ফান্নীর রিওয়ায়াত ওয়াদ দিরায়াত মিন ইলমিত তাফসীর, সৌদিআরব : মাওকাউত তাফসীর, তা.বি, খ. ৫, পৃ. ৩০১

হয় তবে বিয়েও হালাল হওয়া উচিত। আমি তাদেরকে অবশ্যই তোমাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেবো এবং অত্যন্ত অপমানের সাথে তাদেরকে পৃথক করে দেবো।"[৩৪]
আল্লামা ইবনুল আরাবী র. বলেছেন : "উপরোক্ত আয়াতে সমস্ত কাফির ও মুশরিক মহিলাকে বিয়ে করতে স্পষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছে।"[৩৫]
অপর এক আয়াতে উল্লেখ আছে : "মুসলিম মহিলারা কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং মুসলিম পুরুষরাও অনুরূপভাবে কাফির মহিলাদের জন্য হালাল নয়।"[৩৬]

একথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, যে নারী কোনো আসমানী ধর্মের অনুসারী বা বিশ্বাসী নয় এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর পূজা করে, যেমন মূর্তিপূজক ও অগ্নিপূজক এ শ্রেণীর কোনো নারীকে বিবাহ করা কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয়। এ বিষয়ে ফকীহগণ একমত। এর সমর্থনে তারা আল্লাহ বাণী পেশ করেন : "মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিবাহ করো না। মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও নিশ্চয় মুমিন দাসী তার তুলনায় উত্তম"।[৩৭] এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "তোমরা তাদের ক্ষেত্রে আহলে কিতাবদের রীতি অনুসরণ করো, তবে তাদের নারীদের বিবাহ করো না এবং তাদের যবেহকৃত প্রাণীর গোশত আহার করো না"।[৩৮]

আর মুশরিক নারী হলো, যে আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের মধ্যকার কোন কিতাবে ঈমান আনে না এবং আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য যে সকল নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের কারো উপর ঈমান আনে না।[৩৯]

---

৩৪. হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهودية، ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية. فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه غضبًا شديدًا، حتى همّ بأن يسطو عليهما. فقالا نحن نطلّق يا أمير المؤمنين، ولا تغضب! فقال: لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن، ولكن أنتزعهن منكم صَغَرة قِماءً.

ইমাম ইবনে জারীর, জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন, বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২০০০, খ. ৪, পৃ. ২২১

৩৫. ইব্নুল আরাবী বলেন : هَذَا بَيَانٌ لِامْتِنَاعِ نِكَاحِ الْمُشْرِكَةِ مِنْ جُمْلَةِ الْكَوَافِرِ . আহকামুল কুরআন, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ৭, পৃ. ৩১১

৩৬. আল-কুরআন, ৬০ : ১০ ... لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ...

৩৭. আল-কুরআন, ২ : ২২১ ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن ولأمة مؤمنه خير من مشركة ولو اعجبتكم.

৩৮. রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحى نسائهم ولا آكلى ذبائحهم. - ইবনে হাজর, আত-তালখীছ, তা. বি., খ. ৩, পৃ. ১৭২

৩৯. ইব্নে কুদামা, আল-মুগনী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৫৮৯

অনুরূপভাবে ইহুদী ও খ্রিস্টান নারীকে বিয়ে করাও জায়েয নয়। কারণ তারাও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : "আল্লাহ্ মুসলিমদের জন্য মুশরিক মেয়ে বিয়ে করাকে স্পষ্ট ভাষায় হারাম করে দিয়েছেন। আর মরিয়াম-পুত্র ঈসা কিংবা অপর কোনো আল্লাহর বান্দাহকে রব বলে মনে করা অপেক্ষা বড় কোনো শিরক হতে পারে বলে আমার জানা নেই।"[৪০]

তবে তাদের মধ্যে যদি এমন কোন মেয়ে থাকে যে কখনো শিরক করেনি বরং সচ্চরিত্রা ও সতী-সাধবী তাদেরকে বিয়ে করা মুসলিম পুরুষের জন্য বৈধ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন : "এবং আহলে কিতাব বংশের সেসব চরিত্র-সতীত্বসম্পন্না মেয়ে (বিয়ে করা তোমাদের জন্য জায়েয"[৪১]

তবে হ্যাঁ, যদি তারা তাওবা করে নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করে নেয় এবং শিরক পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে পুরোপুরিভাবে দীক্ষিত হয় তখন তাদেরকে বিয়ে করাতে কোন বিধি-নিষেধ নেই।

ভিন্ন ধর্মের নারী-পুরুষের পারস্পরিক বিয়ে ইসলামে বৈধ নয়। এক কথায় ধর্মীয় পরিচয়হীন দম্পতির সন্তান হবে জারজ। এ জাতীয় বিয়ে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করবে এবং পর্যায়ক্রমে মানুষকে ধর্মহীন করে তুলবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, মানুষের সকল চাহিদাই আইন দ্বারা বৈধ করা জাতি ধ্বংসের শামিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন মুসলিম পুরুষ একজন স্বনামধন্য গোত্রের যুবতী, সুন্দরী, রূপবতী ও সুঠাম দেহের অধিকারী একজন মেয়ের সাথে বিবাহ করার ইচ্ছা করলো। অত:পর জানা দেখা গেল, সে মুশরিক বা কাফির। কিন্তু তার স্থির সিদ্ধান্ত হলো সে ঐসকল গুণ-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মহিলাকেই বিবাহ করবে। ঠিক একই ভাবে দেখা গেল যে, একজন কাফির পুরুষ ইচ্ছা করলো একজন অভিজাত পরিবারের যুবতী, সুন্দরী, রূপবতী ও সুঠাম দেহের অধিকারী মুসলিম মেয়ের সাথে বিয়ে করবে। এখন ধর্মীয় দৃষ্টিতে এ রকম বিবাহ কোনভাবেই ইসলাম অনুমোদন দেয় না। এধরনের বিবাহকে ইসতিবযা বা রতিক্রিয়া কামনায় বিবাহ (نكاح الاستبضاع) বলা হয়।

এ বিবাহের ধরণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ইবনে হাজার আল-আসকালানী র. বলেন : ইসতিবযা (استبضاع) শব্দের অর্থ লজ্জাস্থান। সুতরাং এর অর্থ হল, অমুকের কাছ

---

৪০. আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. বলেন : المشركات الكتابيات والحربيات أهل الكتاب من أهل الشرك لقوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. -আল-আইনী, বদরুদ্দীন আল-হানাফী, তা. বি., খ. ২০, পৃ. ১০০

৪১. আল-কুরআন, ৫ : ৫ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

থেকে সংগম কামনা কর। আরব জাহানে তদানীন্তনকালে উন্নত মানের বীর্য লাভের জন্য খ্যাতিসম্পন্ন লোকের সাথে স্ত্রীকে রাখা হতো। কারণ আরবের লোকজন তাদের খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ এবং বীরত্ব, মহানুভবতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নেতৃস্থায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে এরূপ কামনা করতো।[৪২]

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আয়িশা রা. বলেন : "জাহিলী যুগে বিবাহের চারটি পদ্ধতি ছিল: তন্মধ্যে একটি ছিল বর্তমান যুগের পদ্ধতি যেমন, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নিকট তার অধীনস্থ কাউকে অথবা তার কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। অত:পর লোকটি সে প্রস্তাব সমর্থন করে, তারপর তাকে বিবাহ দেয়। আর এক ধরনের বিবাহ ছিল: কোন ব্যক্তি তার স্ত্রী যখন মাসিক থেকে পবিত্র হত তখন তাকে বলত, তুমি অমুকের কাছে যাও এবং তার সাথে মেলামেশা কর। আর তার স্বামী তার থেকে দূরে থাকত। কখনো তাকে স্পর্শ করত না। যতক্ষণ না যে ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রী মেলামেশা করেছে তার থেকে গর্ভধারন সুস্পষ্ট হতো। এরপর যখন ইচ্ছা স্বামী তার সাথে মেলামেশা করতো। সন্তান বীরপুরুষ হবার জন্যই তারা এ রকম করতো। তাই এ বিবাহকে বলা হত রতিক্রিয়া কামনা ইসতিবাযা (استبضاع) এর বিবাহ।[৪৩]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন : মুসলিম নারীকে অমুসলিম পুরুষের কাছে বিয়ে দেয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম, সে অমুসলিম আহলি কিতাব হোক কি অন্য কেউ।[৪৪]

এ ছাড়া প্রত্যেক ধর্মের বিবাহব্যবস্থার কিছু নিজস্ব আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে। যেমন হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহের বৈধতার জন্য হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী বিবাহ সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠানাদি যথাযথভাবে পালন করতে হয়। হিন্দু বিয়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সন্তান উৎপাদন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করা।[৪৫]

---

৪২. ইবনে হাজার, আল-আসকালানী, ফাতহুল-বারী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৮৫

৪৩. আয়িশা রা. হতে বর্ণিত : ان النكاح فى الجاهلية كان على اربعة انحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل الى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها- ونكاح فلان فاستبضى منه' ويعتزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذالك الرجل الذى تستبضع منه فاذا اتبين حملها اصابها زوجها إذا أجب وانما يفعل ذالك رغنة فى نجابه الولد . فكان هذاالنكاح نكاخ الاستبعضاع - আল-বাহুতী, মানসূর ইবনে ইউনূস ইবনে ইদরীস, শারহু মুনতাহাল ইবাদাত, বৈরূত : আলামুল কুতুব: ১৯৯৬, খ. ৬, পৃ. ৬৬৬-৬৬৭; আল-ইনসাফু ফী মারিফাতির রাযিহ, মিনাল খিলাফি 'আলা মাজহাবিল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি., খ. ৮, পৃ. ১৬১

৪৪. ইউসুফ আল-কারযাভী, আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, অনুবাদ : মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ২৫৮-২৫৯

৪৫. অধ্যাপক এম. বদরুদ্দীন, হিন্দু আইন, ঢাকা : মুক্তা 'ল' বুক হাউস, ২০০৬, পৃ. ২৫২

ঠিক একইভাবে ইসলাম ধর্মেও বিবাহের বেশ কিছু অনুষ্ঠানাদি রয়েছে। যেমন : ইজাব ও কবূল-এদু'টি বিবাহের রুকন। এটি করতে হলে বর-কনে উভয়কে ইসলাম ধর্ম মতে ধর্মীয় কিছু নিয়ম নীতি পালন করতে হয় তা না হলে বিয়ে সংঘটিত হয় না।

এ বিষয়টি যখন আমরা বিচার-বিশ্লেষণ করবো তখন দেখতে পাব যে, যদি কোন হিন্দু মুসলমান কাউকে বিয়ে করে তাহলে তার ধর্মের নিয়মনানুসারে সে বাধাগ্রস্ত হবে। আবার কোন মুসলিম যদি কোন হিন্দুকে বিয়ে করে তাহলে মুসলিম ব্যক্তিও ধর্মীয় দিক থেকে বাধাগ্রস্ত হবে এবং কেউ পরিপূর্ণরূপে ধর্মীয়ভাবে অনুষ্ঠানাদি পালনের মাধ্যমে তার বিয়ে সম্পাদন করতে পারবে না। এজন্যই মুসলিমের পক্ষে আল্লাহ্ কোন মুশরিক ও কাফিরকে বিয়ে করতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং এটাই মানুষের কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যথাযথ ও যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত।

বিবাহের হুকুম

আবশ্যকীয় বিষয় পুরুষ ও নারীকে সমতা রক্ষা করে বিবাহ্ দেয়া একটি নৈতিক দায়িত্ব। এটি জমহুর ফুকাহা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম, আহমদ, ইমাম আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ র.-এর মত। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন : "অভিভাবকগণই নারীকে বিবাহ্ দিবে এবং তাদের যেন সমতা রক্ষা করে বিবাহ্ দেয়া হয়।"[৪৬]

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত মনীষী আল্লামা ইব্নে হুমাম র. বলেন : একথা স্পষ্ট যে, রসূলুল্লাহ স.-এর এ বাণীর বাহ্যিক অর্থ সমতা রক্ষা করা ছাড়া বিবাহ দেয়া নিষেধ বুঝায়।[৪৭]

এ ছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রেও হিন্দু-মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী তথা আন্তঃধর্ম বিবাহ সম্পর্কে বিভিন্ন বিধান দেয়া হয়েছে। আমরা যদি ভারতবর্ষের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব যে, সেখানেও নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। একটি কেস স্টাডির মাধ্যমে এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।[৪৮] আবার তাদের বিধান বলে, বিশেষ বিবাহ আইনে এ আন্তঃধর্মীয় বিবাহের বৈধতাও রয়েছে।[৪৯]

---

৪৬. জাবির রা. হতে বর্ণিত :

عن جابر بن عبد الله قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا لا يزوم النساء الا الاولياء.

আবু বকর আহমদ ইব্নে আল হুসাইন,সুনান আল-বায়হাকী আল-কুবরা, বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, , ১৪১০ হি., খ. ৭, পৃ. ১৩৩

৪৭. ইবনে কাসীর, আল-বাদায়ি ওয়াস সানায়ি', প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১৭; ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪৯; আশ-শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৮৫

৪৮. একজন মুসলিম মহিলা এ সম্পর্কে এক এ্যাডভোকেটকে প্রশ্ন করেছিল। সেটির বিবরণ নিম্নরূপঃ I am a muslim in love with a hindu girl. Our love came to be known to our parents and they are against, we tried our best to convince them, but ended in vain. We decided to marry through special

marriage act. Pl give me details, is it possible to marry without knowing either of our parents and could finish it easily. Pl help. Thanks in advance.

Ans : If you really love each other and have decided to elope, then please consider few things before taking any action.

First of all, are you guys financially independent? As and when you move out of the house, you'll require money at each and every step. Consider this marriage only if you've enough resources.

Secondly, you require your age proof and address proof while registering for a marriage. Once you fill the form, you have to submit these documents along with. They authority will tell you the marriage date which is generally after a month. After this formality, they will send a letter to your parents at the given address in which your marriage date will be revealed. If there is no objection from your parents' side, then your marriage can be solemnized without any problem.

Thirdly, I would suggest you to again convince your parents. Hindu-Muslim marriage is still considered as a "taboo" in society. Consider all the pros and cons before getting married. Fourthly, if you guys are religious, probably in future you would like your partner to follow your religion. So, keep all the things clear in your mind.

Fourthly, I can just say "All the best" for whatever decision you take. "There is nothing so pathetic as a bore who claims attention - and gets it".

Act No.43 of 1954, 9th October 1954, No. 19; The Indian Penal Code (45 of 1860)THE SPECIAL MARRIAGE ACT, 1872; http://www.sukh-dukh.com/forums/showthread.php?t=11533; http://www. sukh-dukh.com/ forums/ showthread. php?t=11533, http://www.indian express. com/news/the -trials-of-court-marriages-in-india/465575

49. উল্লিখিত বিষয়ে আরো বিস্তারিত একটি কেস্টাডির মধ্যেমে আমরা তা জানতে পারি :

My name is Mamta, a Hindu girl of 28 yrs of age and my boy friend is of 35 years, a Muslim. We both are working. We want to marry each other. We both are not much religious. We have taken decision of marriage. Our both families are not ready and against for this marriage. I have my all ID proofs from Haryana and he has from U.P. I have been living in Gurgaon since 2 years. But any of us does not have any address/ ID proof of same State/Delhi. How can we get

The inter-religious marriages do take place under the Special Marriage Act,1954 আইনে বলা হয়েছে, হিন্দু ও মুসলিম উভয় যে কোন জায়গায় বিবাহ করতে পারে। বিশেষ করে মুসলিম হিন্দু মন্দিরেও বিবাহ করতে পারবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে,[৫০] যা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ।

আবার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইয়াহুদী ধর্মে আন্তঃধর্মীয় বিবাহ ব্যবস্থা নেই। তাদের ধর্ম মতে, এটি নিষিদ্ধ এবং এ বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ বিদ্যমান ছিল সেই পূর্ব থেকেই।[৫১]

---

married? And how can we marry so that our parents can not stop our marriage?

Without changing your religions, you both can get married under Special Marriage Act. There are certain modifications in the rules of Delhi State recently and visit Delhi Govt. Web Site and I hope you both can get married in Delhi by showing temporary residence proof.[49]

During repeated Muslim invasions of India for centuries, Hindu women used to commit even Jauhar to save their honour. In Jauhar, the act of supreme sacrifice and valour, Hindu women used to embrace death by jumping into raging fires to escape being captured, converted and disgraced by Muslim invaders if Hindus were defeated in a battle.

Only two incidents of Jauhar are described here. In 1566 after Hindus were defeated at Chittaur, thousands of Hindu women committed Jauhar to escape falling into Muslims hands. Earlier in 1303, Rani Padmini and many other Hindu women committed 'Jauhar'; and preferred death to dishonour.

-http://skanda987.wordpress.com/2011/10/23/hindu-muslim-marriages-and-%E2%80%98 love-jihad%E2%80%99/.

৫০.http://in.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091227112603AAzeNnE; http://www.la wisgreek.com/is-marriage-between-a-muslim-and-hindu-legal; http://organiser.org//Encyc/2011/10/16/OPINION.aspx?NB=&lang=4&m1=&m2=&p1=&p2=&p3=&p4.

৫১. Talmud Bavli, Avodah Zarah 36b; Maimonides, Mishneh Torah, Sanctity, Laws of Prohibited Relations 12:1 and commentaries; Rabbi Yosef Karo, Shulchan Aruch II:16:2 and commentaries; Moses of Coucy, Sefer Mitzvot ha-Gadol, 112, as per JE; Jewish Encyclopedia, Intermarriage; Ludwig Philippson, Israelitische Religionslehre (1865), 3:350; Maimonides, Mishneh Torah, Sanctity,

একজন পাশ্চাত্য গবেষক আন্তঃধর্মীয় বিবাহ সম্পর্কে বলেছেন : শিশুরা বাবা-মায়ের ধর্মের অনুসারী হয়ে থাকে। আর মানুষের জীবনে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং বিবাহের ক্ষেত্রে আমাদের এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে পরবর্তীতে কোন সমস্যা না হয়।[৫২] আমার কাছে মনে হয়, এটা তখনই সম্ভব হবে যখন পিতা-মাতা একই ধর্মের অনুসারী হবেন। অন্যথায় শিশু কোন ধর্মের অনুসারী হবে তা সহজে নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

ইন্দোনেশিয়ায় একটি আইন প্রচলিত আছে যে, বিবাহের ক্ষেত্রে নিজ নিজ ধর্মের অনুসারী হতে হবে।[৫৩] Prohibition of Inter-Religious Marriage

---

Laws of Prohibited Relations, 12:22 and Maggid Mashnah ad. loc; Leadership Council of Conservative Judaism, Statement on Intermarriage, Adopted on 7th March, 1995; Survey of the American Rabbinate, The Jewish Outreach Institute, (retrieved 6th May 2009).

৫২. Indonesia Department of Information, Introduction to Law of the Republic of Indonesia Number 1 of the Year 1974 on Marriage 5 (Nov. 1975). See also INDONESIAN LAW 1949-1989: A BIBLIOGRAPHY OF FOREIGN-LANGUAGE MATERIALS WITH BRIEF COMMENTARIES ON THE LAW 167 (S. Pompe ed., 1992); The relevant provisions were contained in the Indonesian Civil Code of 1847. See Ratno Lukito, The Enigma of Legal Pluralism in Indonesian Islam: The Case of Interfaith Marriage, 10(2) J. ISLAMIC LAW & CULTURE 176, 177 (2008) (listing the various enactments that applied to marriage in Indonesia prior to 1974); Id. See also Simon Butt, Polygamy and Mixed Marriage in Indonesia: Islam and the Marriage Law in the Courts, in INDONESIA: LAW AND SOCIETY 266, 269 (Tim Lindsey ed., 2d ed. 2008);

৫৩. The relevant provisions were contained in the Indonesian Civil Code of 1847. See Ratno Lukito, The Enigma of Legal Pluralism in Indonesian Islam: The Case of Interfaith Marriage, 10(2) J. ISLAMIC LAW & CULTURE 176, 177 (2008) (listing the various enactments that applied to marriage in Indonesia prior to 1974); Indonesia Department of Information, Introduction to Law of the Republic of Indonesia Number 1 of the Year 1974 on Marriage 5 (Nov. 1975); INDONESIAN LAW 1949-1989; A BIBLIOGRAPHY OF FOREIGN-LANGUAGE MATERIALS WITH BRIEF COMMENTARIES ON THE LAW 167 (S. Pompe ed., 1992); DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, THE COMPILATION OF ISLAMIC

under the 1974 Marriage Law-আইনের ধারায় আরো বলা হয়েছে, বিবাহের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ তথা বর ও কনেকে একই ধর্মের হওয়া আবশ্যক।[৫৪]

উল্লেখ্য যে, ইসলামী আইনে নারী-পুরুষের বিবাহে ধর্ম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে সমতা রক্ষা করা না হলে বিবাহই শুদ্ধ হয় না। সাম্প্রতিক সময়ে এ প্রসঙ্গে শায়খ ফাযেল ইবরাহীম র. একটি ফতোয়া দিয়েছেন, যা আমেরিকার বিচার পরিষদ দ্বারা ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন : মুসলিম নারীর সাথে অমুসলিম পুরুষ, অমুসলিম নারীর সাথে মুসলিম পুরুষের বিবাহ সম্পূর্ণরূপে হারাম। আর যদি কেউ এমন পাপের কাজ করে তাহলে তাদের মিলনের মাধ্যমে যে সন্তান পয়দা হবে তা হবে জারজ সন্তান।"[৫৫]

LAWS OF INDONESIA (1996/1997), arts. 40A(c), 44; Adriaan Bedner & Stijn van Huis, Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia: A Plea for Pragmatism, 6(2) UTRECHT L. REV. 175, 182 (2010)

৫৪. Lukito, supra note 2, at 178. See also Butt, supra note 8, at 282 (stating that "the law of mixed marriages in Indonesia is now highly uncertain."); Lukito, supra note 2, at 180; Acta Apostolicae Sedis, (= AAS), Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1909-1928; Cassidy, Edward Idris and Duprey Pierre, 1993. Pontificium Consilium ad Christianorum Unitatem Fovendam - directory for the application of principles and norms on ecumenism, Vatican City, 25 March 1993; Apostolic Constitution Fidei Depositum, 1992. Catechism of the Catholic Church Part 2, Section 2, Chapter 1: Article 1: The Sacrament of Baptism, Vatican City, 11 October 1992.In: AAS 86 (1994).

৫৫. A fatwa issued in August 2007 by the secretary-general of the Assembly of Muslim Jurists in America (AMJA), Dr. Sheikh Salah Al-Sawy, states that marriage between a Muslim woman and a non-Muslim man is forbidden and invalid, and that children born of such a union are illegitimate.
Muslim Marriages to People of the Book: http://www. answering-islam.org/Quran/Contra/marry _christians.html; Muslim Inter-faith Marriages:http://www.islamfortoday.com/interfaithmarriage.htm;Marriage:Muslims:Non-Muslims:http://www.jannah.org /sisters/intermarriage.html; Fatwa against Muslim Women marrying non-Muslim men: http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=28449; Marriage of Muslim Woman to non-Muslim forbidden:

কুফূ ব্যতীত বিবাহের হুকুম

ইসলামী আইনবিদগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, যে ওলীর কন্যাকে বিবাহে বাধ্য করার অধিকার নেই তার জন্য কন্যার সম্মতি ছাড়া বিবাহ দেয়া জায়েয নয়। তবে যদি অধীনস্ত মহিলার সম্মতিতে তার ওলী কুফূ ছাড়া বিবাহ দেয় তবে তা বৈধ হবে, কেননা কুফূ হলো মহিলা ও ওলীর হক, তাই মহিলা অধিকার ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে ওলীদের সাথে একমত হলে তা বৈধ বলে বিবেচিত হয়।[৫৬]

রসূলুল্লাহ স. এর কন্যাগণের বিবাহের দ্বারা ফকীহগণ দলীল পেশ করেন। তাদের কারো কারো বিবাহের ক্ষেত্রেই কুফূ বিবেচনা করা হয়নি। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. ফাতেমা বিনতে কায়েস (যিনি কুরাইশী) - কে নবী স. এর দাস উসামা ইবনে যায়েদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৫৭]

উপসংহার

আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্যই তিনি মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আর তারই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ্ আদম ও আ. কে সৃষ্টি করেন। একথা সর্বজনবিদিত যে, বংশ বিস্তারের স্বাভাবিক নিয়ম হলো নারী-পুরুষের বিবাহ বন্ধন। এ কারণেই আল্লাহ বেহেশেতে আদম ও হাওয়া আ. এর মাঝে বিবাহের ব্যবস্থা করেন। কয়েকজন লোক মিলে যেহেতু একটি পরিবার, কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি সমাজ গঠিত হয়, কাজেই সমাজ গঠনের মূল ও পূর্বশর্ত হলো পরিবার গঠন। আর পরিবার গঠনের পূর্বশর্ত হচ্ছে বিবাহ, যা অন্যান্য ধর্মব্যবস্থায়ও স্বীকৃত। তা নারীর সম্মান রক্ষা, তদারকি, তাদের জন্য ব্যয়, যেনা থেকে আত্মরক্ষা ইত্যাদি বিবাহের দ্বারাই সম্ভব। আর বিবাহ ব্যতীত এ সকল চাহিদা পূরণ করলে তাতে সমাজে ব্যভিচার, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তাই এ পবিত্র বন্ধন যাতে অটুট থাকে এর জন্য ইসলাম বেশকিছু বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছে। কোন লোক যদি এ বিধানগুলো মেনে চলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে সে মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত রহমত ও বরকত পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে। এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য পাবে নারী-পুরুষের ধর্মের ক্ষেত্রে অভিন্নতা। কাজেই বলা যায়, নারী-পুরুষের বিবাহের ক্ষেত্রে ধর্ম একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

---

http://annalyttiger.wordpress.com/2007/10/24/ why-muslim-women-cant-marry-non-muslim-men/

৫৬. ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪৮০-৪৮১

৫৭. রসূলুল্লাহ স. বলেছেন :...امر النبى ص فاطمة بنت قيس بنكاح اسامة بن زيد - মুসলিম, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, বৈরুতঃ ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবি, তা. বি., খ. ২, পৃ. ১১১

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮ সংখ্যা-৩১
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১২

মালিকানা বিহীন ভূমির উন্নয়ন ও বণ্টননীতি : একটি পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান*

[সারসংক্ষেপ : ইসলাম বিশ্ব মানবতার জন্য মহান আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত। ইসলামে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক দিকসহ সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান রয়েছে। মানবজাতি যে ভূমির উপর বসবাস করে সে ভূমির ব্যাপারেও ইসলামের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। ভূমি ক্রয়-বিক্রয়, ভোগদখলসহ মালিক বিহীন ভূমির ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট বক্তব্য বিদ্যমান। অত্র প্রবন্ধে মালিক বিহীন ভূমির উন্নয়ন ও বণ্টন নীতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।]

ভূমির পরিচয়

নিম্নে পরিচয় ভূমির উপস্থাপন করা হলো :

ক. ভূমি শব্দের অর্থ হল পৃথিবী, ভূ-পৃষ্ঠ, মাটি, মেঝে, ক্ষেত্র, জমি ইত্যাদি। সাধারণ অর্থে মাটি বা জমির উপরিভাগকে ভূমি বলে।[১]

খ. আবূ হানীফা আদ-দিনাওয়ারী বলেন, "যা ভূগর্ভের উপরিভাগে আস্তরণ সৃষ্টি করে এবং যা উদ্ভিদরাজি দ্বারা সুশোভিত থাকে তাকে ভূমি বলে।"[২]

গ. মাটি বলতে বুঝায় যার উপরে মানুষ ও জীব জন্তু বসবাস করে এবং একই সাথে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় ও পরিবর্ধিত হয়। সর্বোপরি এর সাহায্যেই সকলে জীবন ধারণ করে।[৩]

ঘ. ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত প্রাথমিক স্তরের ক্ষয় সাধনের ফলে যে ক্ষুদ্র কণা ভূ-পৃষ্ঠে জমা হয় এবং তার সাথে জৈব পদার্থের সংমিশ্রণের ফলে যে পদার্থ গঠিত হয় তাই ভূমি বা মাটি।[৪]

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ, আলাতুননিসা স্কুল এন্ড কলেজ, বাড্ডা, ঢাকা

১. ইবনে মানযুর আল-ইফরীকী আল-মিসরী, *লিসানুল আরাব*, বৈরূত, দারুল ফিকর, বৈরূত : ১৯৯০, খ. ৭, পৃ. ১১১

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

৩. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস ও অন্যান্য, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, ঢাকা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৫, পৃ. ৫৪৮

৪. ড. এফ. এম মনিরুজ্জামান, *বিপন্ন পরিবেশ ও বাংলাদেশ*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৭, পৃ. ৪৫

ঙ. পানি প্রবাহ, হিমবাহ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, রোদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠের শিলারাশি চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ক্ষয়িত অংশগুলো মৃত গলিত জীবদেহের সাথে মিশ্রিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে যে নরম ও কোমল স্তর বা আবরণ সৃষ্টি করে তাকে মৃত্তিকা বলে। প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকা হল-শিলাকণা, খনিজ দ্রব্য, জৈব পদার্থ, পানি, বায়ু, জীবানু প্রভৃতির একটি যৌগ মিশ্রণ। ভূ-ত্বকের উপরি স্তরের মাত্র ৫-৭ মিটার গভীর অংশ পর্যন্ত মৃত্তিকার অবস্থান।[৫]

চ. সময়ের ব্যবধানে নিকাশ-স্থিত অবস্থায় জলবায়ু ও জৈব পদার্থের সমন্বিত প্রভাবে রূপান্তরিত উৎস শিলা সৃষ্ট গাছ জন্মানোর উপযোগী ভূ-পৃষ্ঠের প্রাকৃতিক বস্তুর সমষ্টি স্তরকে ভূমি বলে।[৬]

ছ. Soil is a dynamic body composed of mineral and organic materials and living forms in which plants grow.[৭]

জ. কোন বস্তু বা দ্রব্যকে আকার পরিবর্তন করে কিংবা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ না করে যদি ভাড়ায় খাটানো যায়, তাকে ভূমি বলা হয়। ভূমি উৎপাদিত হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। এ অর্থে যন্ত্রপাতিও ভূমির অন্তর্গত।[৮]

কুরআন-হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা

মৃত্তিকা বা মাটি শব্দের আরবী প্রতিশব্দ 'তুরাব', আর ভূ-পৃষ্ঠ শব্দের প্রতিশব্দ হচ্ছে 'আল-আরদ্ব'। কুরআনুল কারীমে সৃষ্টি এবং পুনরুত্থান সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহে 'তুরাব' শব্দটি এসেছে। আর অন্যান্য আয়াতে এসেছে 'আল-আরদ্ব' শব্দটি। 'আল-আরদ্ব' শব্দটি কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন অর্থে ব্যববহৃত হয়েছে। যেমন, 'আরদ্ব' বা ভূ-পৃষ্ঠ বলতে আমরা যে গ্রহে বাস করছি তাকে বোঝান হয়।[৯]

কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে ঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

---

৫. মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, *উদ্ভিদ পরিবেশ বিজ্ঞান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ৫৪

৬. আবদুল কাদের আল-কাফী, *আল-কুরআনুল কারীম ওয়া তাঁলাওয়াসুর-রিয়া*, কুয়েত ঃ মাকতাবাতুল-মিনার আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৫, পৃ. ৪

৭. ড. মোঃ সদরুল আমিন, *পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ মৃত্তিকার ভৌত ধর্ম*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ২০

৮. ড.মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩, পৃ. ৯৬

৯. ড. মোঃ ময়নুল হক, *ইসলাম ঃ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন*, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, পৃ. ৮৩

অর্থ : "হে জিন্ন ও মানব সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না ছাড়পত্র ব্যতিরেকে।"[১০]

ভূ-পৃষ্ঠ দ্বারা বাসগৃহকে বোঝানো হয়েছে কুরআনুল কারীমে। বলা হয়েছে ঃ

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

অর্থ : "তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তিনি তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন।"[১১] কোন কোন আয়াতে 'আরদ্বুন' শব্দটি বিস্তৃত বিছানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে ঃ

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থ : "যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জেনে শুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাড় করিও না।"[১২]

'আরদ্বুন' শব্দটি মাটি অর্থেও কুরআনুল করীমের বিভিন্ন আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ

অর্থ : "যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনো ধৈর্য ধারণ করব না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেন তিনি ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সব্জী, কাঁকড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন। মূসা বলল, তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সাথে বদল করতে চাও?"[১৩]

অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

অর্থ : "তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।"[১৪]

---

১০. আল-কুরআন, ৫৫ : ৩৩
১১. আল-কুরআন, ১১ : ৬১
১২. আল-কুরআন, ২ : ২২
১৩. আল-কুরআন, ২ : ৬১
১৪. আল-কুরআন, ২২ : ৫

মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান মাটি। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমের ভাষ্য ঃ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

অর্থ : "আমি মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং এ থেকেই তোমাদেরকে বের করব।"[১৫]

মাটি মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম। শুধু মানুষ সৃষ্টিই নয়; মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, জীব-জন্তুর আহার-বিহারের জন্য মহান আল্লাহ মাটিকে যোগ্যতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। মাটিতে লক্ষ-কোটি ব্যাক্টেরিয়ার অস্তিত্ব (যা শস্য উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা রাখে) মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। প্রত্যেকটি সৃষ্ট জীবের অধিকার রয়েছে পৃথিবীর বুক থেকে আহার্য ও পানীয়-এর সংস্থান করে নেয়ার। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ○ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ○ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ

অর্থ : "তিনি ভূমিকে স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য; এতে রয়েছে ফল-মূল এবং খেজুর গাছ যার ফল আবরণযুক্ত এবং খোসা বিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ ফুল।"[১৬]

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ○ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ○ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ○ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

অর্থ : "তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত পৃথিবী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং তা হতে উৎপন্ন করি শস্য যা তারা আহার করে। তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙুরের উদ্যান এবং তাতে উৎসারিত করি প্রস্রবণ, যাতে তারা আহার করতে পারে তার ফলমূল হতে, অথচ তাদের হাত তা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে।"[১৭]

উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আধুনিক মৃত্তিকা বিজ্ঞান মাটি বা ভূমির যে সংজ্ঞা প্রদান করেছে তার বহু পূর্বেই কুরআনুল কারীম মাটির বিবরণী তুলে ধরেছে। সুতরাং আল-কুরআনের ভাষ্য মতে মাটি হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠের সেই স্তর যেখানে মানুষ ও জীবজন্তু তাদের প্রয়োজনীয় বস্তুসম্ভার সহজে পেতে পারে এবং উদ্ভিদরাজি খুব সহজেই জন্ম নিতে পারে বাধাহীনভাবে।[১৮]

---

[১৫]. আল-কুরআন, ২০ : ৫৫
[১৬]. আল-কুরআন, ৫৫ : ১০-১২
[১৭]. আল-কুরআন, ৩৬ : ৩৩-৩৬
[১৮]. ড. মোঃ ময়নুল হক, *ইসলাম ঃ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

মহান আল্লাহ ভূ-পৃষ্ঠকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, এটা পানির ন্যায় তরলও নয় এবং রুটি ও কাদার ন্যায় চাপ সহযোগে নীচেও নেমে যায় না। আবার এই ভূমিকে এত শক্তও করা হয়নি যাতে উদ্ভিদরাজির অঙ্কুরোদগমে বাঁধা হয়ে দাড়ায়। এরূপ হলে তাতে বৃক্ষ ও শস্য বপন করা যেত না, কুপ ও খাল খনন করা যেত না; সুউচ্চ অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করা যেত না। মহান আল্লাহর সব সৃষ্টিই সুপরিকল্পিত ও সুষম। তিনি বলেন ঃ

وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ سورة الحجر وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

অর্থ : "আর পৃথিবী, তাকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং আমি তাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্গাত করেছি সুপরিমিতভাবে এবং তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য, আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নও, তাদের জন্যও।"[১৯]

প্রয়োজনের তুলনায় গম, ধান, উৎকৃষ্টতর ফলমূল যদি এত বেশী উৎপন্ন হয় যা মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তুর খাওয়ার পরও অনেক উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে অতিরিক্ত খাদ্য সামগ্রী পচে গিয়ে প্রাণীকুলের বিপদের কারণ হয়ে দাড়াঁত। এ জন্যই সর্বদা মহান আল্লাহ সবকিছুকে পরিমিত উৎপন্ন করেছেন। তাই মহান আল্লাহ ভূ-পৃষ্ঠকে মানুষের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং তা থেকে মহান আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক অন্বেষণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

অর্থ : "তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা তার দিগ-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তার প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর; পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট।"[২০]

মহানবী স. বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন পতিত অনাবাদি ভূমি আবাদ করবে সে নিজেই সে ভূমির মালিক হবে।"[২১]

এভাবে কুরআন ও হাদীসে মানবমন্ডলীকে ভূমির সদ্ব্যবহার করে রিযিকের ব্যবস্থা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু জনসংখ্যার স্ফীতি কোন কোন দেশে মাথা পিছু জমির পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে বর্তমান পৃথিবীর বহু দেশে প্রচুর চাষযোগ্য জমি অনাবাদী পড়ে আছে। সেগুলো সদ্ব্যবহার করতে পারলে দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে মানব জাতি মুক্তি লাভ করতে পারে।

---

[১৯]. আল-কুরআন, ১৫:১৯-২০

[২০]. আল-কুরআন, ৬৭:১৫

[২১]. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায় : আল-মুযারাআ, অনুচ্ছেদ : মান আহইয়া আরদান মাওয়াতান, আল-কুতুবুস সিত্তা, রিয়াদ : দারুসসালাম, ১৪২৯/২০০৮, পৃ. ১৮৩

ভূমির গুরুত্ব

পৃথিবীতে মানুষ মহান আল্লাহর প্রতিনিধি। পৃথিবীর সম্পদরাশি তিনি মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তার বুদ্ধি-বিবেক, মেধা-দক্ষতা, কর্ম প্রচেষ্টা দ্বারা ভূমি ও সম্পদ কাজে লাগাবে। অন্যান্য নিয়ামতের মত ভূমি হল মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহর এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত। উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা অতীব প্রয়োজনীয় এক নিয়ামক। উৎপাদন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভূমি প্রয়োজনীয় একটি মৌল সম্পদ। এটা মহান আল্লাহর অপার দান ও বিশেষ অনুগ্রহ।

ভূমির গুরুত্বারোপ করে কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

অর্থ : "তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা তার দিগ-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার গ্রহণ কর; পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট।"[২২]

অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ

অর্থ : "হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং এর নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না।"[২৩]

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে বসবাসের সুযোগ করে দিয়ে পৃথিবীতেই তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ঈমানদারগণ ভূমি হতে যা কিছু উপার্জন করবে তা অবশ্যই পবিত্র, নির্মল এবং সকল নিষিদ্ধ উপায় মুক্ত হতে হবে। কেননা ভূমি হতে উৎপন্ন জীবিকায় এক দিকে সৃষ্টিকর্তার এবং অন্যদিকে সৃষ্ট মানুষের অধিকার রয়েছে। ঈমানদারগণ সজাগ দৃষ্টি রেখে মালিকানা অর্জন পূর্বক তাতে কর্তৃত্ব লাভ করবে এবং ভোগ ও ব্যবহার করারও পূর্ণ অধিকার পাবে।[২৪]

পৃথিবীতে ইসলামী সমাজব্যবস্থার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা আদম আ.। আদম সন্তানের প্রথম ও প্রধান মৌলিক প্রয়োজন খাদ্য; প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক এই খাদ্যের উৎস মূলত

---

[২২]. আল-কুরআন, ৬৭ : ১৫

[২৩]. আল-কুরআন, ২ : ২৬৭

[২৪]. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ. ১৩৯-৪০

মাটি, পানি ও সূর্যকিরণ। সুতরাং মানব জাতির পিতা এবং বিশ্ব ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান আদম আ.-এর বংশধরদের বেঁচে থাকা এবং ভূমির গুরুত্ব প্রায় সমার্থক। কাজেই উপযুক্ত ভূমি নীতির উপরই প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যের উৎপাদন তথা মানব জাতির জীবিকা সংরক্ষণ এবং বেঁচে থাকা সর্বতোভাবে নির্ভর করে।[২৫]

মূলধন ও প্রযুক্তি, শ্রম ও নৈপুণ্য, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মত ভূমিও উৎপাদনের একটি উপকরণ, তবে উৎপাদনের মৌলিক উপাদান ভূমি হওয়ায় এর গুরুত্ব অনেক বেশি। সাধারণত একটি যন্ত্র বা বাসগৃহ কিছু সময়ের জন্য অব্যবহৃত থাকলে তার মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু অতীব প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনের জন্য যে জমির প্রয়োজন, সেই জমি যদি অব্যবহৃত থাকে বা জমি যদি যথাযথভাবে কাজে লাগানো না হয়, তবে কেবল জমির মালিকই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বরং পুরো মানব সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।[২৬]

মহানবী স.-এর নবুওয়াত লাভের পর আরবে ভূমি এবং ভূমিতে গোচারণই ছিল সম্পদের প্রধান উৎস। এর দ্বারাই সম্পদের পরিমাপ করা হতো। এমনকি আজও উন্নয়নশীল দেশসমূহে, যেখানে জীবনধারণের মৌলিক দ্রব্য-সামগ্রীই কেবল উৎপাদন করা হয়, সেখানকার অর্থনীতিতে ভূমির গুরুত্বই সর্বাধিক। কারণ ভূমির উৎপাদনই সে সমস্ত দেশের জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং মজুরীর ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। উন্নত দেশসমূহেও ভূমির অবদান ও গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুত রাশিয়া, হল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে ভূমি এখনও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। এমনকি শিল্পোন্নত আমেরিকাও শুধু সে দেশের জনগণের খাবারেরই ব্যবস্থা করে না অধিকন্তু এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের জনগণের এক বৃহত্তর অংশের খাবারও যোগায়। প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল বিপ্লবের পূর্বে প্রত্যেক দেশেই লক্ষ লক্ষ লোক তাদের অর্থনৈতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ভূমির উপর নির্ভর করতো। প্রাক-শিল্পবিপ্লব যুগে উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের পরিবর্তে ভূমিকে কেন্দ্র করেই যে কোন দেশের অর্থনীতি গড়ে উঠতো।[২৭]

মালিকানা বিহীন ভূমির উন্নয়ন ও বন্টন নীতি পর্যালোচনা

কোন দেশ বিজিত হবার পর সে দেশের ভূমি প্রথমত দু' শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে থাকে :[২৮]

---

[২৫]. অধ্যাপক এম,এ,সামাদ, *ইসলামের ভূমিব্যবস্থা,* ফরিদপুর : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১, পৃ.৩

[২৬]. প্রাগুক্ত, পৃ.৩-৪

[২৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[২৮]. ইমাম আলাউদ্দীন আবূ বাকর ইবনে মাসউদ আল-কাসানী আল-হানাফী, *বাদাইউস সানাঈ ফী তারতীবিশ শারাঈ,* বৈরূত : তা. বি., ১৯৮২, খ. ৬, পৃ. ১৯২

১. মালিক বিহীন ভূমি ঃ ইসলামী ফিকহ্ শাস্ত্রের পরিভাষায় এ ধরণের ভূমিকে 'আরযে মোবাহা' বলা হয়। অর্থাৎ সে ভূমির উপর বিশেষ কোন ব্যক্তির মালিকানা স্বত্ব থাকে না।
২. মালিকানা স্বত্ব সম্বলিত ভূমি ঃ যে ভূমির উপর লোকদের মালিকানা স্বত্ব থাকে এবং মালিকেরাই তা নিজ ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখে।

মালিক বিহীন ভূমির প্রকারভেদ

যে ভূমির কোন মালিক থাকে না তা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত

১. ঐ সকল ভূমি যা গ্রাম ও শহরবাসীদের সাধারণ ও যৌথ প্রয়োজনের খাতিরে ব্যবহৃত হয়; যেমন- মহল্লার অলিগলি, সড়ক, পথঘাট, খেলার মাঠ, চারণভূমি, কবরস্থান, ঈদগাহ ইত্যাদি।
২. দ্বিতীয় শ্রেণিতে ঐ সকল ভূমি অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, যা পতিত অবস্থায় থাকে, বিশেষ কোন লোক যার মালিক থাকে না; যেমন- বন-জঙ্গল, মরুভূমি, অনাবাদী পাহাড়ী জমি ইত্যাদি। এসব জমি কার্যত কোন আবাদ বা ফসল যোগ্য নয়, তেমনি এর দ্বারা কোন উপকারও হয় না। শরীয়তের পরিভাষায় এ ধরণের ভূমিকে 'আরযে মাওয়াত' বা মৃত ভূমি বলা হয়।
৩. তৃতীয় শ্রেণির মধ্যে ঐ সকল ভূমি অন্তর্ভুক্ত যা কোন গ্রাম ও শহরের প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, কিন্তু কৃষি উপযোগী এবং এ থেকে বহু উপকার গ্রহণ করা যেতে পারে। শরীয়তের পরিভাষায় এ ধরণের ভূমিকে 'আরযে বায়তুলমাল' বলা হয়।[২৯]

প্রথম শ্রেণির বিধান

যে সব মালিক বিহীন ভূমির সাথে শহর, গ্রাম ও মহল্লাবাসীদের সাধারণ স্বার্থ ও প্রয়োজন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সেসব ভূমিবিষয়ে শরীয়তের বিধান হচ্ছে, এ সব ভূমি কোন ব্যক্তির মালিকানায় বা দখল ও ব্যবহারে থাকতে পারবে না। ব্যক্তির মালিকানা ও দখল সম্পূর্ণ অবৈধ। এমনকি মুসলিম শাসকরাও এর মালিক হতে পারবে না এবং কাউকে মালিক বানাতেও পারবে না। সাধারণ প্রয়োজন পূরণের খাতিরে 'ওয়াকফের' ন্যায় সর্বদা সংরক্ষিত থাকবে।[৩০]

এমনিভাবে ধাতব পদার্থের খনি যেমন- লবণ খনি, ভূমির তেল ও পেট্রোল খনি, যা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের মধ্যে শামিল রয়েছে-এগুলো শহরের নিকটে হোক বা দূরে হোক, কখনও কোন ব্যক্তি বিশেষের মালিকানায় ও

---

[২৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪
[৩০]. প্রাগুক্ত

জায়গীরদারীতে পরিণত হতে পারবে না।[৩১] কোন মুসলিম শাসক যেমন নিজে মালিক হয়ে ব্যবহারিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না, তেমনি অন্য কোন লোকের মালিকানায়ও দিতে পারবে না। বরং সাধারণ মানুষের কল্যাণের খাতিরে সরকারী ব্যবস্থাপনায় সুরক্ষিত রাখতে হবে। কারণ মহানবী স. ইয়ামান প্রদেশের 'মারিব' নামক স্থানের ভূমি আবইয়ায ইবনে হাম্মাল আল-মাযিনী রা.-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাকে দান করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন মহানবী স. অবগত হলেন যে, এ জমিতে লবনের খনি রয়েছে এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজন এর সাথে সংশ্লিষ্ট, তখন তিনি তার থেকে এ জমি ফেরত নিয়েছিলেন।[৩২]

দ্বিতীয় শ্রেণির বিধান

যে সব পতিত ও অনাবাদী ভূমির সাথে গ্রাম বা শহরবাসীর প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট থাকে না এবং কার্যত এ ভূমি আবাদযোগ্যও নয়, এ ধরণের ভূমি সম্পর্কে শরীয়তের বিধান হচ্ছে, মুসলিম শাসকদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে যে লোক এ ভূমিকে আবাদযোগ্য ও কৃষি উপযোগী করবে সে লোকই এ ভূমির মালিক হবে, আবাদকারী মুসলিম অথবা অমুসলিম উভয়ই হতে পারে। মহানবী স. মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সর্বপ্রথম মালিকানাবিহীন অনাবাদী জমি আবাদ করার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন : "যে ব্যক্তি এমন কোন জমি আবাদ করে যার মালিক নেই, তাহলে সে ব্যক্তিই (ঐ জমির) অধিক হকদার।"[৩৩] লোকেরা তখন সাধ্যানুসারে জমি আবাদ করার ও মালিক হবার জন্য চেষ্টা করতে লেগে গেল। এভাবে বহু লোকের মধ্যে মালিকানাবিহীন জমি বণ্টন করা হলো।

উমর রা.-এর খিলাফতকালে তাঁর কাছে এক ব্যক্তি দজলা নদীর তীরে অবস্থিত এ ধরণের একটি জমি লাভের জন্য আবেদন করলে তিনি ইরাকের গভর্নর আবূ মূসা আল-আশ'আরী রা. কে লিখে পাঠিয়েছিলেন ঃ "যদি তা জিয্য়ার[৩৪] জমি না হয় এবং

---

৩১. প্রাগুক্ত

৩২. আবূ উবাইদ আল-কসেম ইবনে সাল্লাম, *কিতাবুল আমওয়াল,* ইসলামাবাদ : ইদারাহ তাহকিকাতে ইসলামী, ১৪০৭/১৯৮৬, পৃ. ২৭৬

৩৩. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায় : আল-হারাম ওয়ান মুযারাআ, অনুচ্ছেদ : মান আহইয়া আরদান মাওয়াতান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

৩৪. 'জিয্য়া'–শব্দটির বহুবচন জিযা; জাযা' শব্দ হতে উৎপন্ন। অর্থ কর, মাথা পিছু ধার্য কর, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের উপর ধার্য কর। আল্লামা যামাখ্শারীর মতে, যিম্মীগণ এই কর প্রদান করে নাগরিক হিসাবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি অংশ হতে অব্যাহতি লাভ করে বলে এর নাম জিয্য়া। মুহাম্মদ ইবনে উমার আয-যামাখশারী, *আল-কাশ্শাফ আন হাকাইকিক তানযীল ওয়া'উয়ূনিল আকাবীল,* বৈরুত : দারুল ফিক্র, তা.বি., খ. ২, পৃ. ২৬২

এমন জমিও না হয় যেখানে জিয়্যার জমির জন্য পানি প্রবাহিত হয়, তবে কেবল সেই জমিই সরকারী পর্যায়ে জনগণের মধ্যে বণ্টন করতে পারো।"[৩৫] এতে প্রমাণিত হয় যে, কেবল মালিকানাবিহীন জমিই সরকারী পর্যায়ে বণ্টন করা যেতে পারে। আর এরূপ জমির পূর্ণ বণ্টন সরকারী পর্যায়েই হতে পারে।[৩৬]

ইমাম আবূ ইউসুফ র. লিখেছেন, "যে সকল জমি আবাদী নয়, যার কোন মালিক নেই তা বণ্টন না করে অব্যবহৃত ফেলে রাখা রাষ্ট্রের পক্ষে কিছুতেই উচিত হতে পারে না। উমর ইবনে আবদুল আযীয রা.-এর একটি আদেশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর গভর্নরদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন, "তোমাদের হাতে যে সব সরকারী জমি রয়েছে তা অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে পারস্পরিক চাষের নিয়ম অনুযায়ী জনগণকে চাষ করতে দাও। এতেও যদি চাষাবাদ না হয়, তাহলে এক-তৃতীয়াংশের বিনিময়ে (তিন ভাগের এক ভাগ সরকার পাবে এবং দু'ভাগ পাবে চাষী) তা চাষ করতে দাও। আর এই শর্তে যদি কেউ জমি চাষ করতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে দশ ভাগের এক ভাগ ফসল পাওয়ার বিনিময়ে চাষ করতে দিতে পার। এতেও যদি জমি চাষ না হয় তাহলে কোন রূপ বিনিময় না নিয়ে এমনিতেই চাষ করতে দাও। এভাবেও কেউ চাষ করতে না চাইলে তার চাষাবাদ করার জন্য বায়তুলমাল[৩৭] হতে অর্থ ব্যয় কর এবং কোন জমিই তোমরা অব্যবহৃত রাখবে না"।[৩৮]

অনাবাদী জমি আবাদ করা অথবা ভূমিহীন কৃষক বা মুহাজিরদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষ হতে কাউকে ভূমি দান করা ইসলামে বৈধ। একে আরবী পরিভাষায় 'ইকতা'[৩৯] বলে। মহানবী স. ইক্তারূপে আবূ বকর, উমর, আলী, বিলাল

---

৩৫. আবূ উবাইদ আল-কাসেম ইবনে সাল্লাম, *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৮

৩৭. 'বায়তুলমাল'–বায়তুলমাল অর্থ ধনাগার, কোষাগার, মাল বা দৌলতের ঘর। ইসলামী পরিভাষায় মুসলিম রাষ্ট্রের ট্রেজারী বা কোষাগারকে বায়তুলমাল বলা হয়। মহানবী স.-এর যুগ থেকেই কোন না কোন রূপে বায়তুলমালের অস্তিত্ব ছিল। আবূ বকর রা.-এর খিলাফতকালেও অনুরূপ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। উমর রা.-এর খিলাফতের যুগেই পরিপূর্ণরূপে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বায়তুলমাল অস্তিত্ব লাভ করে। ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় রাজস্ব বায়তুলমালের সম্পত্তি নয়। সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহর আওতাভুক্ত অর্থই বায়তুলমালের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। ইমাম অথবা তাঁর প্রতিনিধি উক্ত সম্পত্তিকে মুসলিম উম্মাহর যে কোন কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে পারেন। দ্র. মু. মাজহারুল হক "*বায়তু'লমাল*", *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১৫, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪, পৃ. ৫৯৪-৬০৭

৩৮. ইমাম আবূ উবাইদ আল-কাসিম ইবনে সাল্লাম, *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫০৩

৩৯. 'ইকতা'–ইকতা ইসলামী ফিক্হ-এর একটি পরিভাষা। সরকার কর্তৃক কোন মালিকানাবিহীন ভূমি চাষাবাদের জন্য কাউকে প্রদান করা হলে এমতাবস্থায় যাকে সেই ভূমি প্রদান করা হয়,

ও জুবায়ের রা. প্রমুখ সাহাবীকে ভূমি দান করেছিলেন।[৪০] এভাবে খুলাফায়ে রাশেদীনও একাধিক ব্যক্তিকে ইক্তারূপে ভূমি দান করেছেন। 'কিতাবুল খারাজ' -এ উল্লেখ রয়েছে, "যদি ইক্তার উদ্দেশ্য সাধিত না হয় অথবা যদি অন্যায়ভাবে বা অসদুদ্দেশ্যে ইক্তা প্রদান করা হয়, তবে এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।"[৪১] উমর রা. মহানবী স. কর্তৃক প্রদত্ত বিলাল ইবনে হারিস আল-মুযানীর রা. ইকতার একাংশ এ জন্যই ফেরত নিয়েছিলেন যে, তিনি এই ভূমি যথাযথভাবে আবাদ করতে সক্ষম হননি। অনুরূপভাবে খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয র. আপন পরিবারের জন্য প্রাপ্ত লাখেরাজ ভূসম্পত্তি এজন্য বাতিল করেছিলেন যে, এগুলো উমাইয়্যা শাসকবর্গ স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে প্রদান করেছিলেন।[৪২]

উল্লেখ্য যে, সরকারীভাবে যে ভূমি জনগণের মধ্যে বণ্টন করা হবে এর দ্বারা কোনরূপ সামন্তবাদী বা জায়গীরদারী প্রথা চালু করা যাবে না। যার পক্ষে যে পরিমাণ ভূমি চাষাবাদ, উৎপাদন করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব তাকে ঐ পরিমাণ ভূমিই দেয়া হবে। সরকারী মালিকানা ছাড়া ক্রয়কৃত ভূমির মালিকগণ যদি বেশীরভাগ আবাদী ভূমি হস্তগত করে বসে এবং গরীব কৃষকের যদি ভূমির প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে দেখা দেয়, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবে ঃ

১. মালিকানাবিহীন, পতিত ও অনাবাদি কৃষি ভূমি কৃষকদের মধ্যে বিনা টাকায় বণ্টন করে দেয়া।

২. ভূমির মালিকদের নিকট কৃষিকার্যের উপযুক্ত অতিরিক্ত ভূমি থাকলে এসব ভূমি তাদের দখলমুক্ত করে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া।[৪৩]

মহানবী স.-এর ইন্তিকালের পর প্রথম পর্যায়ে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হয়ে এই দুই রাষ্ট্রের বিশাল অংশ দখল করে নেয়। ইসলামী রাষ্ট্রের দখলকৃত এই বিশাল ভূমির কেউ মালিক ছিল না। হয় ঐ জমির মালিক যুদ্ধে নিহত হয়েছে, না হয় তা আসলেই কারো

সে যতদিন পর্যন্ত তার খারাজ বা 'উশর দিতে থাকবে ততদিন মালিকের ন্যায়ই উক্ত ভূমির ব্যবহার করার অধিকার থাকবে। দ্র. "ইক্তা", সায়্যিদ নাযীর নিযামী / আবদুল জলীল, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ৩, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ. ২৯৪

[৪০]. ইমাম আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, বৈরুত : দারুল মায়ারিফাহ, তা.বি., পৃ. ৬১

[৪১]. প্রাগুক্ত

[৪২]. আবূ উবাইদ আল-কসেম ইবনে সাল্লাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬

[৪৩]. মাওলানা হিফজুর রহমান, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, অনু ঃ মওলানা আবদুল আউয়াল, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০, পৃ. ১৯২

মালিকানাভুক্ত ছিল না বরং পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের সরকার প্রদত্ত জমি জায়গা ছিল এবং তা-ই ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে এসেছিল। ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফাগণ এই সব জায়গা আবাদ ও ভোগ দখল করার জন্য এমন লোকদের মধ্যে বণ্টন করলেন যারা সেগুলো আবাদ ও ফসল ফলাতে সক্ষম বলে বিবেচিত হয়েছিলেন।[৪৪]

সরকারীভাবে যে জমি জনগণের মধ্যে বণ্টন করা হবে, তার দ্বারা কোনরূপ সামন্ত বাদ বা জায়গিরদারী প্রথা রচনা করা যাবে না। যার পক্ষে যত পরিমাণ জমি ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার মধ্যে সামলানো, চাষাবাদ ও ফসল ফলানো সম্ভব হবে বলে বিবেচিত হবে, তাকে ততো পরিমাণ জমিই দেয়া হবে। অধিক পরিমাণ জমি কাউকেই দেয়া যাবে না। বিলাল ইব্‌নুল হারিস রা.-কে মহানবী স. প্রচুর জমি নিজে আবাদ করার জন্য দিয়েছিলেন। উমর রা. খলীফা নিযুক্ত হবার পর তাঁকে ডেকে বললেন ঃ মহানবী স. আপনাকে অনেক জমি দিয়েছেন। তার পরিমাণ এত বেশি যে, আপনি তা চাষাবাদ করতে পারছেন না। অতঃপর বললেন, আপনি বিবেচনা করে দেখুন, যে পরিমাণ জমি আপনি নিজে চাষাবাদ করতে সক্ষম হবেন সে পরিমাণই আপনি নিজের নিকট রাখুন। আর যা সামলাতে পারবেন না কিংবা যে পরিমাণ জমি দেখভাল করা আপনার সাধ্যাতীত, তা আমাদের (রাষ্ট্রের) নিকট ফেরত দিন, আমরা তা অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করবো। বিলাল রা. জমি ফেরত দিতে রাজী না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সাধ্যাতীত পরিমাণ জমি উমর রা. ফেরত নিলেন এবং মুসলমানদের মধ্যে তা পুনর্বণ্টন করলেন।[৪৫]

তৃতীয় শ্রেণির বিধান

যে ভূমির কোন মালিক নেই এবং কোন গ্রাম ও শহরের প্রয়োজনেও আসে না, কিন্তু আবাদযোগ্য ও কৃষি উপযোগী, এ ধরনের ভূমি সম্পর্কে শরীয়তের বিধান হচ্ছে যে, এ ভূমি বায়তুলমালের সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ বায়তুলমালই এর মালিকানা স্বত্ব লাভ করবে। আর 'বায়তুলমালের' সম্পদের উপর যাদের হক ও অধিকার রয়েছে; তাদের জন্য এ ভূমির উৎপন্ন ফসল এবং আয়লব্ধ অর্থ ব্যয় হবে। এ ভূমির উপর রাষ্ট্রের মুসলিম শাসনকর্তার বহুবিধ ও বিভিন্ন প্রকার এখতিয়ার রয়েছে।[৪৬]

---

[৪৪]. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৫-৫৬
[৪৫]. ইমাম আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
[৪৬]. মুফতী মুহম্মদ শফী, অনু : কারামত আলী নিযামী, ইসলামের ভূমিব্যবস্থা, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, পৃ. ৫

বায়তুলমালের ভূমির শ্রেণি বিভাগ

বায়তুলমালের ভূমির মধ্যে কয়েক প্রকার ভূমি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যেমন-

১. দেশ বিজয়ের সময় যে ভূমি কারো মালিকানাভুক্ত ছিল না, বিজয়ের পর তা বায়তুলমালের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৪৭]

২. যে ভূমিতে প্রথমত কোন লোকের মালিকানা স্বত্ব ছিল বটে কিন্তু মালিকের লা-ওয়ারিস অবস্থায় মৃত্যু হবার ফলে এ ভূমি বায়তুলমালের অন্তর্ভুক্ত হবে। ফিকহ্ শাস্ত্রের পরিভাষায় এ ধরনের ভূমিকে 'আরাযীয়ে মামলাকাত' বা আরাযীয়ে হুয' বা আরাযীয়ে সুলতানিয়া' নামে অভিহিত করা হয়।[৪৮]

৩. বিজিত দেশসমূহের মালিকানা স্বত্বভুক্ত যে সকল ভূমি গণিমতপ্রাপ্ত লোকের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তার আমদানী বা আয়লব্ধ অর্থের এক পঞ্চমাংশ বায়তুলমালের জন্য নেয়া হয়। এ সব ভূমিও বায়তুলমালের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৪৯]

৪. যখন কোন দেশ যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে জয় করা হয়, তখন সে দেশের সমগ্র মালিকানা স্বত্বভুক্ত জমি মূল মালিকদের হাতে না রেখে এবং মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন না করে সমগ্র জমি বায়তুলমালের অন্তর্ভুক্ত করার এখতিয়ার ইমাম বা শাসকদের রয়েছে। এমতাবস্তায় এসব ভূমি বায়তুলমালের সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে।[৫০]

৫. যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে দেশ বিজয় করা অবস্থায় মালিকানা স্বত্বভুক্ত জমি থেকে বিশেষ বিশেষ জমি বায়তুলমালের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যেমন- উমর রা. ইরাক বিজয়ের পর সেখানকার ভূমি থেকে শাহানশাহ কিসরার এবং তার সংশ্লিষ্ট লোকদের ভূমি, আর যারা ঘরবাড়ি ও জায়গা জমি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের জায়গা জমি এবং যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করে যারা মারা গিয়েছে তাদের ভূমি এমনিভাবে বিশেষ বিশেষ আরও বহু জায়গাজমি বায়তুলমালের মধ্যে শামিল করে নিয়েছিলেন। এসব জমি থেকেই লোকদেরকে জায়গীর দেয়া হতো।[৫১]

---

৪৭. মুহাম্মদ আমীন, *রাদ্দুল মুখতার আলাদ-দুররিল মুখতার*, বৈরূত, তা.বি, খ.৩, পৃ. ৩৬৬

৪৮. প্রগুক্ত, পৃ. ২৫৩

৪৯. আবূ উবাইদ আল-কসেম ইবনে সাল্লাম, *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৫০. মুহাম্মদ আমীন, *রাদ্দুল মুখতার আলাদ-দুররিল মুখতার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩-৫৪

৫১. আবূ উবাইদ আল-কসেম ইব্ন সাল্লাম, *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

বায়তুলমালের ভূ-সম্পদের অধিকারী

বায়তুলমালের সম্পদ ব্যবহার ও ভোগাধিকার লাভের লোক তারাই যাদের কোন না কোন পর্যায়ে এ সম্পদে অধিকার রয়েছে। যেমন-ফকীর, মিসকীন, ইয়াতীম, বিদেশী পথিক, রুগ্ন, বিকল, ঋণগ্রস্ত ইত্যাদি। এছাড়া সাধারণ কল্যাণমূলক কাজেও বায়তুলমালের অর্থ ব্যয় করা যাবে। যেমন-নদীর উপর পুল-সেতু নির্মাণ, সীমান্ত পাহারা, মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।[৫২]

উপসংহার

মালিকানাবিহীন সম্পত্তি বন্টনের মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব যেমন রাষ্ট্রের তেমনি রাষ্ট্রের প্রতিটি ইঞ্চি ভূমির সদ্ব্যবহার করার দায়িত্বও রাষ্ট্রের। দেশের অসহায় ও দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষে মালিকবিহীন ভূমি বন্টন করে রাষ্ট্র তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেই একটি সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

---

৫২. মুহাম্মদ আমীন, *রাদ্দুল মুখতার আলাদ-দুররিল মুখতার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮ সংখ্যা-৩১
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১২

ইসলামী মুদ্রাব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশ ঃ একটি পর্যালোচনা

মোহাম্মদ আবু সাঈদ *

[সারসংক্ষেপ ঃ মানব সভ্যতার ইতিহাসে মুদ্রার উদ্ভাবন এক বিরল ঘটনা। আদিম ও প্রাচীন সমাজে মুদ্রার ব্যবহার না থাকলেও আধুনিক জগতে প্রতিটি সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা এতই জটিল হয়েছে যে, মুদ্রা ব্যবস্থা ও মুদ্রার ব্যবহার না থাকলে সভ্যতার চাকা অচল হয়ে পড়বে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য। কুরআন মাজীদ ও হাদীসে "দ্রব্য বিনিময়" প্রথার পরিবর্তে মুদ্রা ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসের সুদীর্ঘ শাসনামলে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী মুদ্রা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছিল, যা গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠির নিকট 'হার্ড কারেন্সি' হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। এখন থেকে প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে মুসলিম মনীষীগণ মুদ্রা ব্যবস্থা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং অনেকে মুদ্রা বিষয়ে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থও রচনা করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে মুদ্রার পরিচয়, গুরুত্ব, শরীয়তের বিভিন্ন উৎসে মুদ্রার বিবরণ, মুদ্রার উৎপত্তি, ইসলামী মুদ্রার বৈশিষ্ট্য, মুদ্রা ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।]

মুদ্রার সংজ্ঞা

মুদ্রা বা অর্থকে আরবী ভাষায় আন-নুকূদ (النقود) বা আল-আমালা (العملة) বলা হয়। ইংরেজীতে বলা হয় Money" বা 'Currency'। পূর্বেকার ফিক্‌হবিদগণ نقود বা মুদ্রা বলতে শুধু স্বর্ণ মুদ্রা এবং রৌপ্য মুদ্রাকেই বুঝাতেন। তবে কাগজী মুদ্রা আবিষ্কারের পর ফিক্‌হবিদগণও অর্থনীতিবিদদের মতই نقود বা মুদ্রা বলতে এমন কোন বস্তুকেই বুঝান যা কোন দ্রব্য কিংবা সেবার বিনিময় মূল্য হিসেবে প্রদান করা হয়। স্বর্ণ হোক কিংবা রৌপ্য অথবা অন্য কোন ধাতু কিংবা কাগজী মুদ্রা হোক বর্তমানকালে আধুনিক ফিক্‌হবিদগণ এবং অর্থনীতিবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই।

অর্থনীতিবিদদের পরিভাষায় মুদ্রার সংজ্ঞা

অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মুদ্রা বা অর্থের সর্বসম্মত কোন সংজ্ঞা নেই। অর্থনীতিবিদগণ ভিন্ন ভিন্নভাবে মুদ্রার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

১. অর্থনীতিবিদ কোলের মতে "অর্থ এমন বস্তু যা সাধারণভাবে সকলেই দেনা-পাওনা মেটাতে ও ঋণ পরিশোধ করতে ব্যবহার করে"।[১]

---

* পিএইচ.ডি. গবেষক, আল-হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

[১]. আনিসুর রহমান, *আধুনিক অর্থশাস্ত্র*, ঢাকা, পুথিঘর লিঃ, ১৯৮৭, পৃ. ১১২

২. লর্ড কীনসের মতে, "অর্থ এমন একটি দ্রব্য যা হস্তান্তর করে ঋণ চুক্তি মেটানো যায় এবং ক্রয় ক্ষমতাকে ধরে রাখা যায়"।[২]

৩. ড. আহমদ আব্দুহ মাহমুদ বলেছেন, "বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়, মূল্যের পরিমাপ করে, সম্পদের ভাণ্ডার হিসেবে পরিগণিত হয় এবং ঋণ পরিশোধে ব্যবহৃত হতে পারে এমন যে কোন বস্তুই মুদ্রা হতে পারে"।[৩]

৪. আব্দুলাহ ইবনে সুলায়মান ইবনে মুনি বলেছেন, "এমন সকল বস্তু যা সকলের নিকট বিনিময় মাধ্যম হিসেবে গ্রহণযোগ্য তাই মুদ্রা, তা যাই হোক না কেন এবং যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন"।[৪]

৫. শেখ আব্দুল ওহাব খাল্লাফ বলেছেন, "মুদ্রা হল এমন বস্তু যার মাধ্যমে সমাজের সকল ব্যক্তি কারবার, ক্রয়-বিক্রয় এবং সকল প্রকার অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করে এবং যাকে দ্রব্যের মূল্য পরিমাপক হিসেবে দেশের প্রচলিত আইন স্বীকৃতি দিয়েছে, চাই তা স্বর্ণের তৈরী হোক কিংবা রৌপ্যের অথবা অন্য কোন ধাতব পদার্থের"।[৫]

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো কোনটিতে মুদ্রার কার্যাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে আবার কোনটিতে মুদ্রার প্রকৃতিগত দিকের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তবে প্রতিটি সংজ্ঞায় একটি সাধারণ বিষয় উল্লেখ রয়েছে তা হল, "সর্ব সাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা"। সুতরাং মুদ্রা বা অর্থের পূর্ণ সংজ্ঞা হল, "যে বস্তু দেনা-পাওনা মেটানোর মাধ্যম হিসেবে সর্বজনগ্রাহ্য এবং সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে তাকেই মুদ্রা বলে।

মুদ্রার গুরুত্ব

আদিম সমাজে ব্যক্তি মানুষ তার প্রয়োজনীয় সকল জিনিস নিজেই তৈরী করতো। ঐ সময় বিনিময়ের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের চাহিদা তৈরী হতে থাকে এবং ব্যক্তির একার পক্ষে তার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের উৎপাদন অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে সমাজে শ্রম বিভাগের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে মানুষ প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা না করে কোন একটি বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে নিজেকে নিয়োজিত করে এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য নিজের দ্রব্যের বিনিময়ে অপরের নিকট থেকে সংগ্রহ করে। এভাবে সমাজে শ্রম বিভাগ দেখা দেয়ায় মানুষের জীবনে বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

---

[২]. প্রাগুক্ত

[৩]. আলাউদ্দিন মাহমুদ জাতারি, *আল-নুকুদঃ ওজায়েফুহাল আসাসিয়া ওয়া আহকামুহাস শরইয়্যাহ,* দামেস্ক, ১৯৯৬, পৃ. ৯৬

[৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

[৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

পরস্পরের সঙ্গে নিজ নিজ উদ্বৃত্ত দ্রব্যের সরাসরি বিনিময় দ্বারা মানুষ তার প্রয়োজন মিটাতে পারে। কোন একটি দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য একটি দ্রব্য সরাসরি বিনিময় করাকে দ্রব্য বিনিময় প্রথা বলে। আদিম সমাজে যখন মুদ্রার প্রচলন ছিল না তখন দ্রব্য বিনিময় প্রথাই বিনিময়ের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তখন কেউ কোন জিনিস ক্রয় করতে চাইলে তাকে নিজের দ্রব্যের বিনিময়ে অন্যের দ্রব্য সংগ্রহ করতে হতো। কিন্তু দ্রব্য বিনিময় প্রথার বহু সমস্যা ও অসুবিধা ছিল। যেমন, প্রয়োজনের অসঙ্গতি, দ্রব্যের অবিভাজ্যতা, মূল্য পরিমাপকের অভাব, দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, ঋণ পরিশোধের অসুবিধা ইত্যাদি।

সমাজে মুদ্রা বা অর্থের প্রচলনের সাথে সাথে দ্রব্য বিনিময় প্রথার উপরোক্ত অসুবিধাগুলো দূর হয়েছে। বস্তুত মানব সভ্যতার ইতিহাসে অগ্নি উদ্ভাবনের মত মুদ্রার উদ্ভাবনও একটি অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা। মুদ্রার প্রচলনের ফলে নিম্নোক্ত উপায়ে দ্রব্য বিনিময়ের অসুবিধাগুলো দূরীভূত হয়েছে।

এক কথায় মুদ্রা অর্থনৈতিক জীবনকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। বিনিময় প্রথাকে ইসলামে নিন্দা করা হয়নি কিন্তু এর মধ্যে এমন কিছু রীতি বা রেওয়াজ রয়েছে যা একে শোষণ ও অবিচারের দিকে ঠেলে দেয়। তাই মহানবী স. শুধু সীমিত ক্ষেত্রেই এ পদ্ধতি ব্যবহারের অনুমোদন দান করেছেন এবং বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার ব্যবহারকে উৎসাহিত করেছেন।

বর্তমান অর্থনৈতিক জগতে মুদ্রার গুরুত্বকে বাড়িয়ে বলার উপায় নেই। একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, মুদ্রার ব্যবহার না থাকলে সভ্যতার চাকা অচল হয়ে পড়বে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো প্রথম দিকে একটি মুদ্রাবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। বস্তুতপক্ষে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুদ্রার গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে মুদ্রার গুরুত্ব আলোচনা করা হলো-

প্রথমত : মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থাকে সহজসাধ্য করেছে। মুদ্রা সর্বজনগ্রাহ্য হওয়ার ফলে মানুষ যে কোন দ্রব্যের পরিবর্তে মুদ্রাকে গ্রহণ করেছে। তদুপরি মুদ্রাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে ভাগ করা যায় বলে মুদ্রার দ্বারা বিনিময় আরো সহজসাধ্য হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : মুদ্রা হল মূল্য পরিমাপের মাপকাঠি। মুদ্রার মাধ্যমে সকল দ্রব্যের মূল্য পরিমাপ করা যায়। সমাজে যখন মুদ্রার প্রচলন ছিল না তখন দ্রব্য মূল্যের কোন সাধারণ পরিমাপক ছিল না। কিন্তু বর্তমানে মুদ্রার মাধ্যমে দ্রব্যের মূল্য পরিমাপ করা যায়।

তৃতীয়ত : আধুনিক কালে সমাজের অর্থনৈতিক কার্যক্রম সর্বদা নগদ অর্থে লেন দেন হয় না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বর্ধিত হারে ঋণের সাহায্যে অর্থনৈতিক কাজ কর্ম চলছে। মুদ্রার মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করা যেমন সহজ, ঋণ পরিশোধ করাও তেমনি সুবিধাজনক। এ কারণে মুদ্রার প্রচলনের ফলে সমাজে ঋণের লেনদেন সহজ ও ঋণের বাজার বিস্তৃত হয়েছে; এর ফলে সমাজে উৎপাদন ও অন্যান্য যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজ কর্মের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটেছে।

চতুর্থত : সঞ্চয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান। মুদ্রা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দ্রব্যের মাধ্যমে সঞ্চয় করা অসুবিধাজনক। কারণ দ্রব্য সামগ্রী পঁচনশীল বলে সঞ্চিত সম্পদ সহজে বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। কিন্তু মুদ্রার বেলায় সে অসুবিধা থাকে না। মুদ্রার প্রচলনের ফলে মানুষের ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়ে সমাজে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

পঞ্চমত : সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থায় মুদ্রা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্রেতাদের আর্থিক ব্যয়ের ধরণ লক্ষ্য করে কোন কোন দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করতে হবে মুদ্রা উৎপাদনকারীকে তা সহজে স্থির করতে সাহায্য করে। সুতরাং আধুনিক কালের বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থাকে সহজতর করে মুদ্রা মানব সভ্যতার অগ্রগতির ধারাকে দ্রুততর করেছে।

ষষ্ঠত : আধুনিক কালে রাষ্ট্রের বিপুল আয়-ব্যয় ও ঋণ এবং এর নানা কার্যাবলী প্রসারেও মুদ্রার গুরুত্ব অপরিসীম। সরকার মুদ্রার মাধ্যমে কর ধার্য ও সংগ্রহ করে। সরকারের বিভিন্ন ব্যয়ও মুদ্রার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। তদুপরি মুদ্রার ব্যবহার সমাজের অভ্যন্তরীণ বিনিময়কে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিণত করেছে।

সপ্তমত : মুদ্রা বন্টনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানসমূহ উৎপাদন কাজে নিয়োজিত হয়ে যে আয় উপার্জন করে তা মুদ্রার মাধ্যমেই তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

তবে মুদ্রার এতসব সুবিধা ও গুরুত্ব থাকলেও এর কিছু কিছু নেতিবাচক দিকও আছে। যেমন- মুদ্রার প্রচলন সমাজকে ধনী ও দরিদ্র - এ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। মুদ্রা প্রচলনের পর থেকে এক শ্রেণীর লোক মূলধন করায়ত্ব করে ধনিক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। এ মূলধনের জোরেই তারা সমাজের দরিদ্র শ্রেণীকে অবাধে শোষণ করার সুযোগ লাভ করেছে। এ জন্য বলা হয় যে, মুদ্রার প্রচলনই সমাজে শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টির জন্য প্রধানত দায়ী। এ ছাড়াও মুদ্রা ব্যবস্থা সমাজে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচনজনিত সমস্যার সৃষ্টি করেছে। কারণ মুদ্রার যোগান বেশি হলে মুদ্রার মূল্য কমে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। মুদ্রাস্ফীতিতে মানুষের প্রকৃত আয় কমে যায় এবং স্থির আয়ের জনসাধারণ- দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে মুদ্রার যোগান কম হলে দেশে মুদ্রা সংকোচন দেখা দেয় এবং এর ফলে সমাজে আয় ও বিনিয়োগ হ্রাস পায়।[৬]

পরিশেষে বলা যায়, মুদ্রার এসব অসুবিধা বা নেতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও একথা সর্বজনবিদিত যে, মুদ্রা আধুনিক কালে উৎপাদন, ভোগ, বিনিময়, বন্টন, তথা সমাজের প্রতিটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মুদ্রা যে আধুনিক অর্থনীতিতে কেন্দ্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

---

৬. আনিসুর রহমান, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১৮

ইসলামী শরীয়তের প্রধান উৎসসমূহে মুদ্রার বিবরণ

মুসলিম অর্থনীতিবিগণ এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, ইসলামী শরীয়তের মৌলিক দু'টি উৎস হচ্ছে, পবিত্র কুরআন এবং রসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস।

প্রথমত ঃ পবিত্র কুরআন শরীফে মুদ্রার বিবরণ

কুরআন মাজীদ হল মানুষের পথপ্রদর্শক গ্রন্থ, এতে সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ নেই। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য রয়েছে রসূলের সুন্নাহ। আর ইসলামী পণ্ডিতদের কাজ হল, যাতে তা পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে স্থায়ী বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। আর এজন্যই কুরআন মাজীদ সর্বস্থান ও সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

'নুকুদ' শব্দটি আরবী। কুরআন মাজীদে এ শব্দটির উল্লেখ নেই, তবে 'মুদ্রা' বা 'নুকুদ' অর্থে যা বুঝানো হয় অর্থাৎ স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বর্ণনা যা কুরআন মাজীদ অবতীর্ণের সময় প্রচলিত ছিল যার অনেক বর্ণনা কুরআনে আছে এবং এতে মুদ্রার একটি বিশেষ প্রকার অর্থাৎ ধাতব মুদ্রার যথেষ্ট উল্লেখ রয়েছে, যা পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

"নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এইসব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ তাই নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।" (আল-কুরআন, ৩ : ১৪)

এখানে قناطير শব্দটি বহুবচন। একবচন قنطار যার অর্থ হল- 'বিশাল এক গুচ্ছ সম্পদ' আয-যাহহাক বলেছেন, القناطير المقنطرة হল স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিশাল সম্পদ[৭]। ইমাম কাতাদাও অনুরূপ বলেছেন এবং ইমাম তাবারী এটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন ।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন-

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

"যারা স্বর্ণ এবং রৌপ্য আবদ্ধ বা কুক্ষিগত করে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন"। (আল-কুরআন, ৯ : ৩৪)

এখানে يكنزون الذهب والفضة এর অর্থ হল- উৎপাদন কিংবা ভোগের জন্য অর্থ ব্যবহার না করে আবদ্ধ করে রাখা ।

স্বর্ণ এবং রৌপ্য যেহেতু মানুষের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় সম্পদ। কাজেই তা বর্ণনায় এসেছে। আল্লাহ তাআলা নেককার মুমিনদের সম্পর্কে বলেন, يحلون فيها من اساور من ذهب অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে তাদেরকে পরানো হবে স্বর্ণের অলংকারসমূহ।

---

৭. নিজামুদ্দিন আল-হাসান ইবনে মোহাম্মদ আন্নিশাপুরী, *গারায়েবুল কুরআন ওয়া রাগায়েবুল ফুরকান*, তা. বি. খ. ৩, পৃ. ১৬২

কুরআন মাজীদে الفضة বা রৌপ্যের পরিবর্তে কখনো الورق শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন- আল্লাহ তাআলা আহলে কাহাফের বর্ণনায় বলেন-

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ

এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরে পাঠাও। সে যেন দেখে কোন খাদ্য ভালো এবং তা থেকে কিছু আহার সামগ্রি তোমাদের জন্য নিয়ে আসে। সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকে কিছু জানতে না দেয়া। (আল-কুরআন, ১৮ : ১৯)

এখানে الورق বলতে দিরহাম বুঝানো হয়েছে। ভাষাবিদদের নিকট শব্দটি এই অর্থেই প্রসিদ্ধ।[৮] তবে কেউ কেউ বলেছেন, এটি রৌপ্য।[৯] উক্ত আয়াতটি প্রমাণ করে যে, মুদ্রা বা (نقود) এর ইতিহাস বেশ পুরাতন।

কুরআন মাজীদ অবতীর্ণের সময় মৌলিক দুটি মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহলো স্বর্ণমুদ্রা 'দিনার' এবং রৌপ্য মুদ্রা 'দিরহাম' এবং কুরআন মাজীদে এ দু'টি মুদ্রার উল্লেখ রয়েছে।

ইহুদিদের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআন বলেছে,

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন লোক আছে যার কাছে তুমি বিপুল পরিমাণ সম্পদ আমানত রাখলেও তোমাকে তা ফেরত দিবে, আবার এমন লোকও আছে যার কাছে তুমি মাত্র এক দিনার পরিমাণ আমানত রাখলেও সে তোমাকে ফেরত দিবেনা তবে যতক্ষণ তুমি তার নিকট উপস্থিত থাকবে"। (আল-কুরআন, ৩ : ৭৫)

ইউসুফ আ. কে যারা কূপে পেয়েছিল এবং তাকে মিসরে নিয়ে গিয়েছিল তাদের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআন বলেছে, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

"এবং তারা অতি অল্প মূল্যে মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে তাকে ক্রয় করেছিল"। (আল-কুরআন : ১২ :২০)

উপরোক্ত বর্ণনায় দুটি মূল্যবান ধাতব মুদ্রার উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ 'স্বর্ণ মুদ্রা' ও 'রৌপ্য মুদ্রা'। এ দুটি মুদ্রা ছাড়াও কুরআন শরীফে অন্য প্রকারের একটি মুদ্রার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তাহলো 'দ্রব্য মুদ্রা' অর্থাৎ দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা যা তৎকালে প্রচলিত ছিল। সে সময় বিশেষ ধরনের দ্রব্য 'মুদ্রা' হিসেবে বিবেচিত হতো, যার বিনিময়ে অন্যান্য দ্রব্যের আদান প্রদান হতো। এ ধরনের ইঙ্গিত সূরা ইউসুফে রয়েছে। কেনান প্রদেশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তার বর্ণনায় এসেছে: "ইউসুফ আ.-

---

৮. মাজদুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব আল-ফিরোজাবাদী, *আল-কামুস আল-মুহিত*, বৈরুত, আল-মুয়াচ্ছাসাহ আল আরাবিয়া, ১৪২৬/২০০৫, খ. ৩, পৃ. ২৯৮

৯. আলাউদ্দিন আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-খাজেন, *লুবাবুল তাবিল ফি মায়ানি আল-তানজিল*, বৈরুত, দারুল মায়ারিফাহ, তা. বি. খ. ৩, পৃ. ১৯৩

এর ভাইয়েরা মিসরে এসেছিল তাদের নিকট বিদ্যমান দ্রব্যাদির বিনিময়ে সাহায্য নিতে"। ৩টি আয়াতে بضاعة বা দ্রব্যের বর্ণনা করা হয়েছে-

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ
أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا
الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

"ইউসুফ তার ভাইদের বলল, তারা যে পণ্যমূল্য দিয়েছে তা তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও যাতে স্বজনদের কাছে ফেরার পর তারা তা চিনতে পারে তাহলে তারা পুনরায় আসতে পারবে। যখন তারা তাদের মালপত্র খুললো তখন তারা দেখতে পেল তাদের পণ্যমূল্য তাদেরকেই ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বলল, হে পিতা! আমরা কি প্রত্যাশা করতে পারি আমাদের দেয়া পণ্যমূল্য আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। আমরা আমাদের পরিবারকে খাদ্য সামগ্রি এনে দেব এবং আমাদের ভাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করব তা ছাড়া আমরা আরো অতিরিক্ত এক উট বোঝাই করে পণ্য আনব; যা এনেছি তা পরিমাণে খুবই অল্প। যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হলো তখন বলল, হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজন বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং আমরা খুব অল্প পুঁজি নিয়ে এসেছি আপনি আমাদেরকে পূর্ণমাত্রায় আহার সামগ্রি দিন এবং আমাদের প্রতি দান করুন আল্লাহ দাতাদেরকে পুরস্কৃত করেন।" (আল-কুরআন, ১২ : ৬২,৬৫, ৮৮)

এতে কোন ধরনের بضاعة বা দ্রব্য ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা নিয়ে এসেছিল তার বিনিময়ে সাহায্যের জন্য সে ব্যাপারে তাফসীর বিশারদগণদের মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মত হলো তা 'দিরহাম' কিংবা 'দিনার' অথবা কোনটাই ছিল না বরং তা ছিল এমন এক ধরনের বস্তু যা তাদের যুগে সহজ প্রাপ্য ছিল, যেমন 'জুতো' এবং 'চামড়া'।[১০] যেমনটি বলেছেন ইবনে আব্বাস রা.।

এ আলোচনায় প্রমাণিত হল যে, ঐ দ্রব্যগুলো দিরহাম কিংবা দিনার ছিল না, বরং তা ছিল 'দ্রব্যমুদ্রা' জাতীয়। সুতরাং এ আলোচনায় এটাই ইঙ্গিত বহন করে যে, মুদ্রার বিষয়টি নির্ভর করে প্রচলন ও পরিভাষার উপর। সৃষ্টিগতভাবে তা কোন মূল্য নয়, অনেকেই যেমনটি মনে করেন এবং শুধু স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর সীমাবদ্ধ বলে মনে করেন।

হাদিসে نقود বা মুদ্রার বর্ণনা

কুরআনের মত হাদীসেও نقود বা মুদ্রার বর্ণনা এসেছে, নবুয়্যতের সময় প্রচলিত বিভিন্ন নামে যেমন, الذهب বা স্বর্ণ, الفضة বা রৌপ্য, দিনার, দিরহাম ইত্যাদি।

---

[১০]. আবুল ফযল শিহাবুদ্দিন আল-আলুসি, *রুহুল মায়ানি ফি তাফসিরুল কুরআন আল-আযিম ওয়াছসাবউল মাসানি*, বৈরুত, দারু এহইয়ায়ে তুরাস আল-আরাবি, তা. বি. খ. ১৩, পৃ. ১০

হাদীসে বর্ণিত আছে, স্বর্ণ মুদ্রা এবং রৌপ্য মুদ্রা, এ দুটি মুদ্রাই কেবল বিনিময় মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হতো। আবু সাঈদ আল-খুদরী রা. এবং আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, "রসূলুল্লাহ স.- খায়বরে একজন লোককে যাকাত আদায় করার জন্য প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি সেখান থেকে উন্নতমানের খেজুর নিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর দরবারে হাজির হলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, খায়বরের সব খেজুর কি এ রকম? তিনি উত্তরে বলেন, না; আমরা দুই 'সা' নিম্নমানের খেজুরের বিনিময়ে এ রকম উন্নতমানের এক 'সা' খেজুর ক্রয় করি এবং তিন 'সা' এর বিনিময়ে দুই 'সা' খেজুর ক্রয় করি। রসূলুল্লাহ স.-এর বলেন, তোমরা এ রকম করো না। প্রথমে নিম্নমানের খেজুর দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করো তার পর 'দিরহাম' দিয়ে উন্নতমানের খেজুর ক্রয় করো"। এটা হল স্বর্ণ মুদ্রা কিংবা রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে দ্রব্য বিনিময় কিন্তু স্বর্ণ মুদ্রার' বিনিময়ে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমান সমান হতে হবে এবং উভয় পক্ষের হস্তগত হওয়া আবশ্যক। রসূলুল্লাহ স. বলেন, "স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, সম পরিমাণ এবং হাতে হাতে নগদে হতে হবে এবং অতিরিক্ত যা হবে তা সুদ, আর এই প্রকারের বস্তুগুলো বিভিন্ন রকমের হলে তোমরা যেমন ইচ্ছা বিক্রি বা বিনিময় করো যদি তা হাতে হাতে বা নগদে হয়।[১১]"

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, দিনারের বিনিময়ে দিনার এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম, উভয়ের মধ্যে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা যাবে না।[১২]

স্বর্ণ মুদ্রা এবং রৌপ্য মুদ্রা উভয়ই দ্রব্যের মূল্য পরিমাপক, এ দুটির মাধ্যমে যাকাত, দিয়াত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে শরীয়ত নির্ধারিত পরিমাণ নির্ধারিত হয়। অতঃপর যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নবী স. বলেন, 'পাঁচ আওয়াক' রূপার চেয়ে কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না।[১৩]

আমর ইবনে শুয়াইব পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদা সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি নবী স. হতে বর্ণনা করেন যে, "২০ মিসকাল স্বর্ণের কম এবং ২০০ দিরহাম রৌপ্যের কম পরিমাণের উপর কোন যাকাত নেই"।[১৪]

ভুলক্রমে হত্যার দিয়াতের পরিমাণ দিরহামের ভিত্তিতে নির্ধারণের বেলায় ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ স. এর আমলে একজন লোক অন্য একজন লোককে খুন করেছিল, অতঃপর নবী স. তার দিয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন বার হাজার দিরহাম।[১৫] দিনারের ভিত্তিতে দিয়াতের পরিমাণ নির্ধারণের বেলায়,

---

[১১]. *সহীহ মুসলিম*, শারহু নববী, অধ্যায় : আল-মুসাকাত, অনুচ্ছেদ : আররিবা, খ. ১১, পৃ. ২০

[১২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

[১৩]. বদরুদ্দীন আল-আইনী, *উমদাতুলকারী শরহে সহিহিল বুখারী*, অধ্যায় : আয যাকাত, অনুচ্ছেদ : মা আদ্দাজাকাতাহু ফা লাইসা বিকানযিন, খ. ৮, পৃ. ২৫৬

[১৪]. আবু ওবায়েদ আলকাসেম ইবনে সালাম, *আলআমওয়াল*, বৈরুত, মুয়াচ্ছাসাহ নাসের, ১৯৮১, পৃ. ১৬৬

[১৫]. *সুনানে নাসায়ী বেশরহি সুয়ুতি ওয়া হাসিয়াতুস সনদ*, অধ্যায় : আল-কাসামাহ, অনুচ্ছেদ : যিকরু দ্দিয়াত মিনাল ওরাক, বৈরুত, দারু এহইয়ায়ে তুরাস আল-আরাবি, তা. বি. খ. ৮, পৃ.৪৪

আমর ইবনে হাজমকে লিখিত চিঠিতে নবী স. বলেন, স্বর্ণ মুদ্রায় বিনিময়কারীদের জন্য এক হাজার দিনার।[১৬]"

অপরদিকে অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী স. তাঁর জীবনে মুদ্রা ব্যবহার করেছেন এবং নিদ্ধিধায় স্বর্ণ ও রৌপ্য বিনিময় হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

প্রমাণ আছে যে, তিনি আসআদ বিন জুরারা থেকে এক খণ্ড জমি ক্রয় করেছিলেন যা তার ঘরে প্রতিপালিত দু'জন ইয়াতীমের সম্পদ ছিল। তাদের দু'জনের নাম ছিল 'সোহেল' এবং 'সুহাইল'। তাদের পিতা বনাম ছিল রাফে। তিনি তা তার নিকট থেকে দশ দিনারের বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন। আবু বকর রা. এ অর্থ পরিশোধ করেছিলেন।[১৭]

তারিখ আল-তাবারিতে আছে, নবী স. যে প্রথম ঘোড়াটির মালিক হয়েছিলেন সেটা তিনি মদীনায় বনি ফুজারার কোন এক ব্যক্তি থেকে দশ স্বর্ণ মুদ্রা বা আওয়াক দিয়ে ক্রয় করেছিলেন।[১৮]

আলী রা. বলেন, নবী স. আমার সাথে ফাতিমাকে বিবাহ দিয়েছেন চারশত আশি দিরহাম মোহরানায়।[১৯]

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, নবী স. যে মুদ্রা ব্যবহার করেছেন তা স্বর্ণের দিনার কিংবা রৌপ্যের দিরহামই হোক না কেন দু'টি মুদ্রাই অমুসলিম দেশ থেকে আসতো, এতে একদিকে ইসলাম ধর্মের উদারতা প্রমাণিত হয়।

ইসলামী পণ্ডিতদের বিবেচনায় মুদ্রাব্যবস্থা

ইমাম মাকরিজি, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম গাযালী, ইবনে খালদুন, বালাজুরী, ইবনে আবেদীন, মাওয়ারদী, ইমাম ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযীয়া, এসব মুসলিম পণ্ডিত ইসলামী মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং অনেকেই পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ইবনে সালাম *'কিতাবুল আমওয়াল'* গ্রন্থে 'দিরহাম' সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং ইসলামে 'দিরহাম' প্রচলনের কারণও বর্ণনা করেছেন।

ঐতিহাসিক বালাজুরী তাঁর *'ফুতুহুল বুলদান'* নামক গ্রন্থে একটি বিশেষ অধ্যায়ে মুদ্রা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২০]

---

[১৬]. আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুর রাহমান, *সুনানে আল-দারামী*, অধ্যায় : আদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদ : কামদ্দিয়াত মিনাল ওরাক ওয়ায জাহাবি, বৈরুত, দারুল ফিকর, তা. বি. খ. ২, পৃ. ১৯২

[১৭]. আবুল হাসান আল-বালাজুরী, *ফুতুহুল বুলদান*, বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৮৩, খ. ২, পৃ. ২১৮

[১৮]. মুহাম্মদ ইবনে জারির আলতাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়ালমুলুক*, বৈরুত, দারুলকুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৮, খ. ২, পৃ. ২১৮

[১৯]. আবুওবায়েদ, *আল-আমওয়াল*, পৃ. ২১০

[২০]. আবুল হাসান বালাজুরী, *ফুতুহুল বুলদান*, বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, পৃঃ ২০

মাওয়ারদী তাঁর বিখ্যাত *'আল-আহকাম আল-সুলতানিয়া'* গ্রন্থে মুদ্রা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, কিভাবে মানুষ মুদ্রা অপব্যবহার করতো, যার ফলশ্রুতিতে খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান এর শাসনামলে পৃথক ইসলামী মুদ্রা তৈরী করার প্রয়োজন হয়েছিল।[২১]

মুদ্রার মূল্য সম্পর্কে ইমাম গাযালী বলেন, 'মুদ্রা' মূলতঃ কোন মূল্য বহন করে না বরং এটি একটি 'নমুনা' কিংবা 'মাধ্যম' মাত্র। ইমাম গাযালী মুদ্রার কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং দ্রব্যের মূল্য পরিমাপক হিসেবে এবং বিনিময়ের উত্তম মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বিনিময় কার্য সহজ করার ব্যাপারে এবং বাণিজ্যিক কার্যাবলী উন্নয়নের ব্যাপারে মুদ্রার ভূমিকার কথা বলেছেন এবং এগুলোকে তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[২২]

মুদ্রা সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে বলেছেন, মুদ্রার নিজস্ব কোন মূল্য নেই, বরং এর মূল্য নির্ভর করে সামাজিক পরিচিতি ও পরিভাষার উপর। এ অর্থে মুদ্রার জন্য স্বর্ণ এবং রৌপ্য আবশ্যকীয় নয়। তদ্রূপ তিনি মুদ্রার সামাজিক কার্যাবলী উল্লেখ করে বলেন, মুদ্রা হল বিনিময় মাধ্যম এবং কারবারের উপায়।[২৩]

ইবনে কাইয়্যিম তার' اعلام الموقعين عن رب العالمين গ্রন্থে মুদ্রা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি সেখানে মুদ্রার গুরুত্ব ও অত্যাবশ্যকীয়তা উল্লেখ করে বলেন, মুদ্রা হল এমন একটি অতি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বস্তু যা না হলেই নয়।

ইবনে খালদুন 'মুদ্রা' সম্পর্কে পণ্ডিত ছিলেন এবং এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিলেন যে অনেক গবেষক ইবনে খালদুনের চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে মুদ্রা সম্পর্কে বিশেষ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা তাঁর বিখ্যাত المقدمة নামক গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি মুদ্রা মূল্যের পরিমাপক এবং বিনিময় মাধ্যম- এ দুটো কার্যাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন।[২৪]

গবেষকগণ ইবনে খালদুনের 'মুদ্রা তত্ত্বে' অনেক দিক ও বিষয়ের সন্ধান পেয়েছেন, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ঃ মুদ্রার প্রকৃতি এবং রাষ্ট্রের উৎপাদন ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো এবং যেগুলো মুদ্রার যোগান ও মুদ্রার প্রচলন গতি ও চক্রের দ্রুততার সাথে সংশ্লিষ্ট।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক 'দুমাইরি' মুদ্রা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ حياة الحيوان الكبرى গ্রন্থে। তিনি খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের খিলাফত

---

২১. আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী, *আল-আহকাম আল-সুলতানিয়া ওয়াল উলায়াত আদ্দিনিয়া*, বৈরুত, ১৯৭৮, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, পৃ. ৮১

২২. আবু হামেদ আল গাযালী, *এহইয়ায়ে উলুমুদ্দিন*, বৈরুত, দারুল মারেফাহ খ. ৪, পৃ. ৯১

২৩. আহমদ ইবন তাইমিয়া, *মাজমুয়ায়ে ফাতওয়া শায়খুল ইসলাম*, জমায়া ওয়া তারতিব আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ আল-আসেমী, তা. বি. খ. ১৯, পৃ. ২৫১

২৪. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমাহ*, বৈরুত, ১৯৮৪, দারুল কলম, পৃ. ৩৮০

পর্বে 'ইসলামী মুদ্রা' সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেছেন এবং সেখানে সর্বপ্রথম ইসলামী দিনার[২৫] তৈরী ও প্রচলনকারীদের সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন।

ইমাম মাকরিজি হলেন ঐ সব ঐতিহাসিকের অন্যতম যারা 'অর্থনীতি ও মুদ্রা' সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি তাঁর اغاثة الامة في كشف الغمة এবং تاريخ المجاعات في مصر গ্রন্থে 'মিসরে মানুষের জীবন জীবিকার অভাব ও অর্থনৈতিক মন্দার কারণ সম্পর্কে গবেষণার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, সেটা ছিল প্রচলিত মুদ্রার যোগানের অতিরিক্ত অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির জন্য দ্রব্যের উচ্চমূল্য স্তরের ফলশ্রুতি।[২৬] তাঁর চিন্তার উপর ভিত্তি করেই অর্থনীতিবিদ ফিশার তাঁর মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন।

খ্যাতিমান লেখক 'তামারতাশি' ইসলামী মুদ্রা সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যার নাম দিয়েছেন, بذل المجهود في مسئلة تغيير النقود (মুদ্রা পরিবর্তন বিষয়ে প্রচেষ্টা) তাঁর পর ইবনে আবেদীন তার গ্রন্থটি রচনা করেন যার নাম হল, تنبية الرقود على مسائل النقود (মুদ্রা বিষয়ে মন্দা সতর্কতা) আর এটা হল তামারতাশির উপরোক্ত গ্রন্থের সারকথা।

তিনি তার এ গ্রন্থে "মুদ্রার মূল্যহ্রাস" বিষয়ে এবং ঋণ পরিশোধ এর উপর এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, মূল্যমান শুধু স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপরই সীমাবদ্ধ নয় বরং অন্যান্য ধাতব মুদ্রাও পরিভাষাগত ভাবে মূল্যমান বহন করতে পারে ।

মুদ্রার উৎপত্তি

ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে, মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে কয়েকটি স্তর বা ধাপের মধ্য দিয়ে মুদ্রার উৎপত্তি হয়েছে।[২৭]

(১) আদিম যুগে মানুষ মুদ্রার তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নি। কেননা তখন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। কোন দ্রব্য বা সেবা কর্ম খরিদ করার প্রয়োজন ছিল না। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আশ্রয়স্থল নিজেই তৈরী করতো। অন্যের তৈরী বস্তুর কোন প্রয়োজন হয় নি। কেননা তখন মানুষের জীবন যাত্রা ছিল অতীব সহজ সরল ও সাদাসিধে। এ স্তর বা যুগকে অর্থনীতির পরিভাষায় বলা হয় 'ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের যুগ'।

(২) এর পর ধীরে ধীরে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং মানুষের প্রয়োজনও অনেক গুণে বৃদ্ধি পেল। তখন মানুষ অনুভব করল, তার বহুবিধ চাহিদা নিজে নিজে পূরণ করা সম্ভব নয়। এজন্য তাকে অন্যের উপর নির্ভর

---

[২৫]. কামালুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-দুমাইরি, *হায়াতুল হাইওয়ান আল-কুবরা,* তা. বি. পৃ. ৭১

[২৬]. আল-মাকরিজি,*এগাছাতুল উম্মাহ বি কাশফুল গুম্মাহ,* আল-কাহেরা, লাজনাতুল তালিফ ওয়া তরজমা ওয়া নশর ১৯৫৭।

[২৭]. আলাউদ্দিন মাহমুদ জাতারী, আল-নুকুদঃ অজায়েফুহাল আসাসিয়া ওয়া আহকামুহাশ শরইয়াহ, বৈরুত , দারু কুতায়বা, ১৯৯৬, পৃ. ১৩৩

করতে হচ্ছে, অন্যের তৈরী দ্রব্য সামগ্রী তার নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিশেষ প্রয়োজন। তখন থেকে মানুষ ছোট ছোট দল গঠন করতে লাগল এবং কর্ম বিভাজন শুরু করল। প্রত্যেক ব্যক্তি কোন একটি বিশেষ দ্রব্য উৎপাদন কার্জে নিয়োজিত হতে লাগলো। এভাবে কেউ খাদ্য তৈরী, কেউ বা বস্ত্র তৈরী, কেউ বা আশ্রয়স্থল নির্মাণে নিয়োজিত হলো। অর্থনীতিতে একে বলা হয় 'শ্রম বিভাজন' এবং এ যুগকে বলা হয় 'দলীয় স্বাবলম্বনের যুগ'।

(৩) তার পর মানুষ বহু দলে- উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন বহুমুখী হয়ে ওঠে। তখন বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যের উৎপাদনও অনেক গুণে বৃদ্বি পায়। মানুষের জীবনযাত্রা অনেকটা স্থায়িত্ব পায় এবং মানুষ কৃষি কাজে নিয়োজিত হয় এবং বড় বড় দলীয় বন্ধনে আবদ্ধ হতে থাকে। তখন থেকে মানুষ বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যের আন্ত:বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। অর্থনীতিতে এই স্তরকে বলা হয় 'পরস্পর বিনিময়ের অর্থনৈতিক স্তর'। বিনিময়ের এ স্তর দীর্ঘদিন যাবৎ চলতে থাকে। পরবর্তীতে এই স্তরে মানুষের মধ্যে বিনিময়ের ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং মানুষ দ্রব্য বিনিময়ের কোন সহজ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

(৪) এ পর্যায়ে মানুষ দ্রব্য বিনিময়ের জটিলতা ও সমস্যা প্রকটভাবে অনুভব করে এবং চিন্তা করতে থাকে বিশেষ কোন একটি দ্রব্যকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করার জন্য যা দ্রব্য ও সেবার মূল্য পরিমাপক হিসেবে গণ্য হবে। একে 'দ্রব্য বিনিময় প্রথা' বলা হয়। বিনিময়ের এ স্তর বহু যুগ ধরে চলতে থাকে।

(৫) এর কিছুদিন পর আরেকটি উন্নত পর্যায় আবিষ্কৃত হয়, যে স্তরে মানুষের ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং সহজতর হয়। এ পর্যায়ে কোন একটি বিশেষ দ্রব্যকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সকল ক্রেতা ও বিক্রেতা গ্রহণ করে এবং তাদের দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য পরিমাপক হিসেবে নির্বাচন করে নেয় যেমন- চামড়া, অলংকার, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি। এ স্তরকে 'বস্তু মুদ্রা অর্থনীতি' হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। কেউ কেউ একে 'দ্রব্য মুদ্রা পদ্ধতি' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।[২৮] তবে এখানে উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত ধাপগুলো একটি আরেকটি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল না বরং পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত ছিল।

উল্লেখ্য যে, মুদ্রার উৎপত্তির উপরোক্ত ধাপগুলোর সুনির্দিষ্ট কোন সময়কাল জানা যায়নি। কারণ এ ধাপগুলোতে কোন বিষয় লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রচলন ছিল না, কেননা এগুলো ছিল ইতিহাসপূর্ব যুগের ঘটনাবলী।

(৬) এরপর ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব যুগে মানুষের জীবনযাত্রা আরও জটিল হয়ে পড়ে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পায়। শ্রম

---

[২৮]. প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৪

বিভাজন আরো ব্যাপক হয়ে পড়ে, বিনিময় পরিসর আরো বৃদ্ধি পায়, তখন দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য প্রথা অচল হতে থাকে। সেটা আর মানুষের বিনিময় প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হল না। তখন মানুষ এমন একটা মুদ্রার প্রয়োজন অনুভব করল যার মূল্যমান অধিক হবে, সহজে বহনযোগ্য হবে, দীর্ঘস্থায়ী হবে, যার মূল্যমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যাবে এবং যার মাধ্যমে ছোট বড় সব ধরনের বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করা সম্ভব হবে।

মানুষের এ প্রয়োজন ও অর্থনৈতিক চিন্তার উপর ভিত্তি করে 'দ্রব্য মুদ্রা' প্রথার পরিবর্তে তখন 'ধাতব মুদ্রা' প্রথার প্রচলন হলো। ধাতব মুদ্রা মানুষের বিনিময় ব্যবস্থাকে অনেক উন্নত ও সহজতর করে দেয়। ধাতব মুদ্রাই তখন সকল দ্রব্যের মূল্য পরিমাপক হিসেবে গণ্য হয়। এ সময় মানুষ স্বল্পমূল্যের ধাতব যেমন লোহা, ব্রোঞ্জ, নিকেল ইত্যাদিকে মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করে।[২৯]

ডঃ ফৌজি আতাবি বলেন, "প্রথম ধাতব মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন হয় যিশুখৃষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর পূর্বে। বহু বৎসর পর্যন্ত এ মুদ্রার প্রচলন চলতে থাকে এবং পরবর্তীতে স্বর্ণ ও রৌপ্যকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তখন ধীরে ধীরে অন্যান্য ধাতব মুদ্রার ব্যবহার হ্রাস পায় এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার বৃদ্ধি পায়, কারণ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বিনিময় মূল্য অনেক বেশী। এটা সহজ বহনযোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী। ফলে এ দুটো মুদ্রাই তখন সর্বসাধারণের নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়।[৩০]
এক গবেষণায় বলা হয়, যিশুখৃষ্টের জন্মের ৭০০ বছর পূর্বে প্রথম রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন হয়। অন্য এক গবেষণায় বলা হয়, প্রথম রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয় যিশুখৃষ্টের জন্মের ২৬৯ বছর পূর্বে। স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলনের ব্যাপারে অন্য এক গবেষণায় বলা হয়, যিশুখৃষ্টের জন্মের ২০৬ বছর পূর্বে প্রথম স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন হয়।[৩১]

(ক) প্রথমে মানুষ যখন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন শুরু করে এবং এর গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও বৈশিষ্ট্য অনুভব করল তখন থেকে বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন ওজনের মুদ্রা তৈরি হতে লাগল। পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণা ও জালিয়াতী কারবার চলতে থাকে। তখন এ সমস্যা নিরসনের জন্য সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। তখন থেকে ব্যক্তির পরিবর্তে সরকার বা রাষ্ট্রের উপর স্বর্ণ মুদ্রা ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় এবং মুদ্রার প্রকৃত মূল্যের সাথে বাজার মূল্যের সমন্বয় হয় এবং মানুষ স্বাধীনভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে কারবার করতে থাকে।

(খ) এ স্তরে গোটা পৃথিবী আরেকটি নতুন শিল্পে প্রবেশ করে তা হল 'মুদ্রা তৈরী শিল্প'। এ মুদ্রা তৈরী শিল্প প্রথমে এশিয়া তারপর ইউরোপে প্রবেশ করে। তখন হতে

---

[২৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬
[৩০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫
[৩১]. ডঃ সকর আহমেদ সকর, *মুহাদিরাত ফিননুকূদ ওয়াল বুনুক ওয়াল ইকতিসাদুদ্দাউলি*, আল-কাহেরাঃ নাহদাতুস্‌শারক, পৃ. ১৭

মুদ্রার উভয় পার্শ্বে বিভিন্ন নকশা সম্বলিত এবং প্রচলনকারী সরকারের ছবি কিংবা সিলমোহরসহ তৈরী হতে থাকে। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা বিভিন্ন নামে পরিচিত হতে থাকে যেমন স্বর্ণ মুদ্রাকে দিনার এবং রৌপ্য মুদ্রাকে 'দিরহাম' বলা হতো। ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিস্তারের মাধ্যমে পৃথিবীর বৃহৎ সাম্রাজ্য রোম সাম্রাজ্যে স্বর্ণ মুদ্রা ব্যবহৃত হতো 'দিনার' নামে এবং পৃথিবীর আরেকটি বৃহৎ ক্ষমতাধর সাম্রাজ্য পারস্যে রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহার হতো 'দিরহাম' নামে।

এ সময় এ দুটো সাম্রাজ্যের সাথেই আরবদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, যোগাযোগ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালিত হতো। ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ সম্পাদিত হতো মুদ্রার বিনিময়ে। এ কারণে আরব দেশে তখন 'দিনার' ও 'দিরহাম' উভয় মুদ্রার প্রচলন ছিল।

৬. গোটা পৃথিবীতে বহু শতাব্দিকাল থেকে ধাতব মুদ্রার প্রচলন বিদ্যমান থাকলেও শিল্প বিপ্লবের পরের পৃথিবীর বিনিময় মাধ্যম হিসেবে চাহিদা মিটাতে ধাতব মুদ্রা অক্ষম হয়ে পড়ে । গোটা পৃথিবীর ব্যবসায়-বাণিজ্য আর লেনদেনের পরিমাণ এতই বৃদ্ধি পায় যে, স্বর্ণ মুদ্রা কিংবা রৌপ্য মুদ্রার মাধ্যমে এ বিশাল চাহিদা পূরণ করা সম্ভব ছিল না। পৃথিবী তখন এমন আরেকটি মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে যার মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক লেনদেন ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কারবারের বিনিময় মাধ্যম ও মূল্য পরিমাপক হিসেবে যোগান দেয়া সম্ভব, যার যোগান ধাতব মুদ্রার মত সীমিত থাকবে না। আর তখনই আবিষ্কার হল 'কাগজী মুদ্রা'। ১৭শ শতাব্দিতে ইউরোপে বিশেষ করে ইংল্যান্ডে কাগজী মুদ্রার প্রথম প্রচলন শুরু হয়। যদিও কাগজী মুদ্রা অনেকগুলো ধাপ বা স্তর অতিক্রম করে আজকের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। অর্থনীতিবিদদের ধারণা, কাগজি মুদ্রা এ পরিণত পর্যায়ে পৌছাতে প্রায় তিন শত বছরেরও বেশী সময় পার হয়েছে। মুদ্রার ইতিহাসে কাগজি মুদ্রার আবিষ্কার এক বিরল ঘটনা।

ইসলামী মুদ্রাব্যবস্থার গুরুত্ব

যে পদ্ধতির সাহায্যে দেশের অর্থের যোগান ও এর মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে মুদ্রাব্যবস্থা বলে। দেশের অর্থনৈতিক কর্মপ্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে অর্থের যথোপযুক্ত যোগানের বন্দোবস্ত করে দেশের দাম স্তর ও অর্থের মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখাই মুদ্রাব্যবস্থার লক্ষ্য। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মুদ্রাব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ইসলামী মুদ্রাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

(১) ইসলামী মুদ্রা ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, দ্বি-ধাতুমান মুদ্রাব্যবস্থা। ইসলামের আবির্ভাবের পর সাময়িকভাবে রোম সাম্রাজ্যের স্বর্ণ মুদ্রা এবং পারস্য সাম্রাজের রৌপ্য মুদ্রা- এ দুটি মুদ্রাই যুগপৎভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে প্রচলিত ছিল। অতঃপর উমর রা. উক্ত মুদ্রা দুটির আকার আকৃতির কিছু পরিবর্তন এবং ইসলামী ভাবধারার কিছু শব্দাবলী সংযোজন করে ইসলামী মুদ্রা প্রচলন করেন। পরবর্তীতে খলীফা আব্দুল মালিক এবং উমাইয়া ও আব্বাসীয়

খলিফাদের আমলে আরো অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে ইসলামী মুদ্রার প্রচলন করা হয়, যা ইসলামের সুদীর্ঘ শাসনামলে প্রচলিত ছিল।

(২) ইসলামী মুদ্রা ব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, দেশের অভ্যন্তরে প্রচলিত বিহিত মুদ্রার ধাতবমান। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বিহিত মুদ্রার অবশ্যই ধাতব মূল্য থাকতে হবে, কিংবা অবশ্যই তা পরিবর্তনীয় হতে হবে। এ অর্থে ইসলাম বিভিন্ন দেশে প্রচলিত কাগজি মুদ্রাকে সমর্থন করে কিন্তু এটাকে অবশ্যই পরিবর্তনীয় মুদ্রা হতে হবে। অর্থাৎ এ মুদ্রার বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সমপরিমাণ কিংবা ন্যূনতম পরিমাণ স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য থাকতে হবে, যাতে জনসাধারণ ইচ্ছে করলে সরকারের নিকট থেকে কাগজি মুদ্রার পরিবর্তে ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তন করে নিতে পারে, কিংবা এমন বৈদেশিক মুদ্রা থাকতে হবে যার বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য ঐ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গচ্ছিত রয়েছে যেমন মার্কিন ডলার ।

(৩) **সুদবিহীন ব্যবস্থা ঃ** ইসলামী মুদ্রা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এটা সুদমুক্ত ব্যবস্থা। ইসলাম সুদকে যুলুম, নির্যাতন ও অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার আখ্যা দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি বরং মানবতার মুক্তির সনদ সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“হে মুমিনগণ। তোমরা সুদ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাক, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। আর যদি তা না কর তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে। আর তোমরা যদি তা থেকে বিরত থাক এবং তওবা কর তাহলে তোমরা তাতে বিনিয়োগকৃত তোমাদের মূল পুঁজি গ্রহণ করতে পারবে। তোমরা কাউকে যুলুম করবে না এবং তোমরাও কারো যুলুম নির্যাতনের স্বীকার হবে না” ।(আল-কুরআন, ২ : ২৭৮-২৭৯)

রসূলুল্লাহ স.-এর পবিত্র হাদীসে কঠোরভাবে সুদ গ্রহণ, ভক্ষণ ও সুদের কারবারে সাক্ষ্যপ্রদানকে শুধু নিষিদ্ধ বা হারামই করা হয়নি বরং তিনি তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। আর এ জন্যেই ইসলামী মুদ্রাব্যবস্থা এ অভিশপ্ত সুদকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার ও বর্জন করেছে।

(৪) **শরীয়ত অনুগত ঃ** ইসলামী মুদ্রা ব্যবস্থা সুদ বর্জন করা ছাড়াও ইসলামী শরীয়তের সকল নির্দেশাবলী মেনে চলতে বদ্ধপরিকর। ইসলামী শরীয়তের নীতিমালা অনুযায়ী এর সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যবিধি ও কর্মপদ্ধতিতে ব্যাংক সম্পূর্ণরূপ ইসলামী শরীয়ার অনুসারী।

আমানত গ্রহণ, বিনিয়োগ ও পরামর্শ প্রদানসহ সকল ক্ষেত্রেই ইসলামী শরীয়ার বিধি-নিষেধের প্রতি খেয়াল রাখা ইসলামী ব্যাংকের কর্তব্য।[৩২]

ইসলামী মুদ্রা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য

(১) দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কর্মপ্রবাহ সচল ও গতিশীল রাখা। অর্থনীতিতে মুদ্রা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সুদূরপ্রসারী। মুদ্রা শুধু বিনিময় মাধ্যম এবং মূল্যপরিমাপক হিসেবে কিংবা সঞ্চয়ের বাহন এবং ঋণ পরিশোধের হাতিয়ার হিসেবেই ভূমিকা পালন করে না। বরং মুদ্রা বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে। জীবন ধারণ এবং উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবার দ্রুত বন্টনের নিয়ামক হিসেবেও কাজ করে। অর্থনীতিতে ভোগ ও বিনিয়োগ নির্ধারণে অর্থ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থের প্রসারণ এবং সংকোচন দেশের মোট চাহিদা হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারে।

(২) **অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ** আধুনিক জগতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনুন্নত দেশগুলোর মুদ্রাব্যবস্থা ও আর্থিক নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে। অনুন্নত দেশসমূহে প্রচুর অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ নিয়োগ দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন এই সমস্ত দেশের প্রধান লক্ষ্য।

(৩) **পূর্ণ কর্মসংস্থান ঃ** দেশে যে পরিমাণ মানব সম্পদ রয়েছে তাদের পূর্ণ নিয়োগ লাভ দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। মুদ্রাব্যবস্থা ও বিশেষ আর্থিক নীতির মাধ্যমে দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। অর্থনীতিবিদদের মতে দেশের মোট কর্ম-নিয়োগের পরিমাণ সমাজের মোট ব্যয়ের উপর নির্ভর করে এবং অর্থব্যবস্থা ও আর্থিক নীতির সাহায্যে এ ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়।

(৪) **বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিরতা ঃ** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে যখন স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল তখন মুদ্রাব্যবস্থা ও আর্থিক নীতির বিশেষ লক্ষ্য ছিল মুদ্রার বহির্মূল্য স্থির রাখা। স্বর্ণমানে বিনিময় হারের উঠানামার ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ দাম স্তর, উৎপাদন ও নিয়োগ স্তরের কাঠামোতে পরিবর্তন হয়। সুতরাং স্বর্ণমানের নিয়ম মেনে চলে বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিরতা বজায় রাখাই তখনকার মুদ্রাব্যবস্থা ও আর্থিক নীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল। কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থের বা মুদ্রার বহির্মূল্য অপেক্ষা অর্থের অন্তর্মূল্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অর্থের অভ্যন্তরীণ মূল্যের পরিবর্তনের ফলে সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মান প্রভাবিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, অর্থের বহির্মূল্য ও অভ্যন্তরীণ মূল্যের মধ্যে কোন বিরোধ থাকা উচিত নয়। দেশের স্বার্থ অনুযায়ী উভয় মূল্যকেই কখনো স্থির রাখা উচিত এবং কখনো পরিবর্তিত হতে দেয়া উচিত।

---

৩২. ইকবাল কবির মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, ঢাকা: জেরীন পাবলিশার্স, ২০০১, পৃ. ১৩০

(৫) মুদ্রা ব্যবস্থার আরেকটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্থির মূল্যস্তর। অর্থ বা মুদ্রা বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য ও সেবার মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড এবং ঋণ পরিশোধের মাপকাঠি। সুতরাং সঙ্গত কারণেই মুদ্রার মূল্য স্থির থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ দাম স্তরের উর্ধ্বগতি ও নিম্নগতি উভয়ই ক্ষতিকর। তাছাড়া বাণিজ্যচক্রের উঠানামা রোধ করতে হলে দাম স্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা নেহায়েত জরুরী। এছাড়া দাম স্তরের স্থিতিশীলতা আয় বৈষম্য হ্রাস করতে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। স্থিতিশীল দাম স্তর রপ্তানি বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনের ভারসাম্য সৃষ্টিতে সহায়তা করে। সর্বোপরি দাম স্তরের অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতি সীমিত আয়ের জনসমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাই মুদ্রাব্যবস্থা ও মুদ্রা নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল স্থিতিশীল মূল্য স্তর বহাল রাখা।

(৬) **পুঁজি সমাবেশকরণ ও বিনিয়োগ ঃ** ইসলাম অতিরিক্ত সম্পদ পুঁঞ্জভূত করাকে যেমন অপছন্দ করে, তেমনি অলস সঞ্চয় একত্র করে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং যথার্থ বিনিয়োগেও উৎসাহিত করে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পুঁজি উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার অপরিহার্য। অনেকে অর্থ সঞ্চয় করে তা দিয়ে নিজ উদ্যোগে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে সক্ষম নাও হতে পারে। তা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীর পক্ষেও উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ অসম্ভব। এ জন্য প্রয়োজন এমন একটি আর্থিক ব্যবস্থা যা সঞ্চয়ের সন্নিবেশ ঘটিয়ে অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে। ইসলামী মুদ্রাব্যবস্থা এ ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।[৩৩]

(৭) **সুদের পূর্ণ বিলোপ সাধন ঃ** সুদ নির্মূল করা ইসলামী মুদ্রা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সুদের অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করে মুনাফাভিত্তিক একটি কল্যাণধর্মী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি রচনায় ইসলামী মুদ্রা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। কুরআন ও সুন্নাহয় সুদের অভিশাপ থেকে মানবতাকে মুক্ত থাকার জন্য যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ইসলামী মুদ্রাব্যবস্থা এ সুদ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর।

(৮) **শরীয়া নীতি অনুসরণ ঃ** ইসলামী মুদ্রাব্যবস্থার আরেকটি উদ্দেশ্য হল ইসলামী শরীয়ার পূর্ণ অনুসরণ। ইসলামী মুদ্রা ব্যবস্থার যাবতীয় কর্মপরিকল্পনা ও নীতি ইসলামী শরীয়ার আলোকে প্রণীত। তাই ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শরীয়ার নীতি বিরুদ্ধ কোনো কাজ করে না এবং শরীয়া লংঘিত হয় এমন কোনো লেনদেনও করে না। যে সব খাতে শরীয়া বিনিয়োগ নিষিদ্ধ, ইসলামী ব্যাংকসমূহ কখনো তাতে বিনিয়োগ করতে পারে না, তা যতই লাভজনক হোক না কেন। ইসলামী ব্যাংক তার

---

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

আমানত গ্রহণ নীতি থেকে বিনিয়োগ প্রদান নীতি পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে ইসলামী নিয়ম-নীতিকে মেনে চলে।[৩৪]

(৯) **আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন :** আয় বৈষম্য দূরীকরণ এবং আয়ের অসম বন্টন দূর করার জন্য ইসলাম যাকাতব্যবস্থা, কর আরোপ, সম্পদ হস্তান্তর এবং আবর্তনের নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী মুদ্রাব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

(১০) **সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন :** আল্লাহর দেয়া সম্পদের যথার্থ ব্যবহার, অপচয়রোধ এবং মানব সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে মানব জীবনকে অর্থবহ ও কল্যাণকর করে তোলা ইসলামী মুদ্রা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। এই দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ এবং এ সম্পদ তাই আল্লাহর হুকুম মতো ব্যবহার করতে হবে। আর তা হলেই কেবল মানুষের কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে। সম্পদের ব্যাপারে ইসলামের যে ধারণা রয়েছে, ইসলামী অর্থব্যবস্থা একই ধারণার ভিত্তিতে সম্পদকে ব্যবহার করে। সম্পদের ব্যাপারে আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ
فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সমস্ত আল্লাহর। তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। তারপর যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করে দেবেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (আল-কুরআন, ২ : ২৮৪)

মহান আল্লাহ তাঁর দেয়া সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে সমাজের মানুষের জন্য পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছেন। এ জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালাও রয়েছে ইসলামে। যে কোনো উপায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা ইসলামে কাম্য নয়। অপ্রয়োজনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যাপক উৎপাদনের মাধ্যমে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ইসলাম সমর্থন করে না। কেননা এরূপ মাত্রাতিরিক্ত ও বল্গাহীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পদের যথেচ্ছা ব্যবহার বৃদ্ধি করে এবং সমাজে অনৈতিকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে মানুষকে নিশ্চিত ধ্বংসের পথে পরিচালিত করে। তাই মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে আল্লাহর নির্ধারিত পন্থায় বাঞ্ছিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধন করা যেতে পারে। আর এটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করে ইসলামী মুদ্রাব্যবস্থা।

---

[৩৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

ইসলামী শাসনামলে মুদ্রা ব্যবস্থার উন্নতি

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুদ্রার আকার আকৃতির কোন রূপ পরিবর্তন সাধন না হলেও পরবর্তীতে এর আকার, নীতি ও বিধি বিধানের অনেক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে।

নবী স. এর আমলে যে সব মুদ্রা প্রচলিত ছিল পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করা হয়েছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিস্তার লাভের সাথে সাথে মুসলমানদের কারবার ভিন্ন রূপ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন ছিল যা ইসলামী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিত্বকে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের সন্মুখে তুলে ধরবে।

ইসলামী শাসনামল বা সভ্যতার যুগে মুদ্রার প্রকৃতিগত বা মৌলিক কোন পরিবর্তন হয় নি, এটি মূলত ধাতব মুদ্রাই ছিল বরং এর আকার আকৃতিগত পরিবর্তনই হয়েছে। নীচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

হিজরী প্রথম শতাব্দীতে ইসলামী মুদ্রাব্যবস্থা

প্রখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক বালাজুরী তার '*ফুতুহুল বুলদান*' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেন, "জাহেলিয়া আমলে মক্কাবাসীগণ রোম সম্রাট 'হেরাকেল' এর মুদ্রা 'দিনার' ব্যবহার করতেন এবং তারা পারস্য সাম্রাজ্যের 'কায়সারের' রৌপ্য মুদ্রা 'দিরহাম' ব্যবহার করতেন এবং 'মিসকাল' এর ভিত্তিতে তারা পরিমাণ নির্ধারণ করতেন ।

এ সময় আরবগণ স্বর্ণ মুদ্রার নাম দিয়েছিল 'আল-আইন' এবং রৌপ্য মুদ্রার নাম দিয়েছিল 'আল-ওরাক' । তার পর রোমানদের মুদ্রা 'দিনার' এবং পারস্যদের মুদ্রা 'দিরহাম' অধিক ক্ষেত্রে ব্যবহার হতো, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ইয়ামেনের মুদ্রা 'হুমায়রিয়া' আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, কিন্তু খুব ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যবহার হতো ।

এ সময় মুসলমানদের জন্য নতুন কোন বিশেষ মুদ্রার প্রচলন না করার প্রধান কারণ হতে পারে সম্ভবতঃ রসূলুল্লাহ স. এর এমন বিষয়ের প্রতি ব্যস্ততা যা এর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় ছিল। সে সময় নবী স. এবং মুসলমানগণ ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে একীভূত করার বিষয়ে নিমগ্ন ছিলেন।

ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর রা. নবী স. এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং মুদ্রার পরিবর্তন সাধন সম্পর্কে কোন মনোযোগ দেন নি।[৩৫] অন্যদিকে আবু বকর রা. এর খিলাফত কাল ছিল খুবই স্বল্প সময়ের এবং মুদ্রার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিপূর্ণ ছিল যেমন 'মুরতাদ' বা ইসলামত্যাগীদের বিষয় ও তাদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ, যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি ইত্যাদি। এ ছাড়াও নবী স. এর আরব উপদ্বীপের বাইরে ইসলামকে ছড়িয়ে দেয়ার মিশন পরিচালনা এবং সে সময়ের মহাক্ষমতাধর দু'সম্রাট (রোম সম্রাট ও পারস্য সম্রাট) এর নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়া।

---

৩৫. ড. হামদান আব্দুল মাজিদ আল-কাবিসি, *তাতাউরিন্নকুদ ওয়ান্নিজামুন্নকদি ফিদ্দাউলা আল-আরাবিয়া আল-ইসলামিয়া*, মুহাদারাহ ফি নাদওয়াতুল ইকতিসাদ আল-ইসলামী, বাগদাদ, মায়াহাদিল বুহুস ওয়া দ্দিরাসাত আল-আরাবিয়া, ১৯৮৩, পৃ. ৭৮

উমর রা. এর আমলে মুদ্রাব্যবস্থা

উমর রা. মুদ্রা বিষয়ে তিনটি পরিকল্পনা করেছিলেন, এর দু'টি তিনি বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং একটি থেকে বিরত থাকেন।

প্রথম পদক্ষেপ

তিনি সর্বপ্রথম ইসলামী মুদ্রার প্রচলন করেন এবং এতে বেশ কিছু ইসলামী শব্দ সংযোজন করেন। আর এটা করেন তার খিলাফতের ৮ম বর্ষে অর্থাৎ ২০ হি. (৬৪১ খ্রি.) সনে। তিনি পারস্য সম্রাট কায়সারের 'দিরহামের' আকার আকৃতির অনুরূপ মুদ্রা তৈরীর জন্য নির্দেশ দেন এর উপর খলিফার নাম, তৈরির স্থান ও তারিখ লিখা হয়। তবে কোনটির উপর অতিরিক্তভাবে 'আলহামদুলিল্লাহ' কোনটির উপর 'মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ' কোনটির উপর কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু' এবং কোনটিতে 'উমর' লিখা হয়।

তদ্রূপ দামেস্কে 'ব্রোঞ্জে'র তৈরী মুদ্রাসমূহে 'জায়েজ' এবং হেমসে তৈরী মুদ্রাসমূহে 'তাইয়েব' কিংবা 'ওয়াফি' ইত্যাদি শব্দ সংযোজন করা হয়েছিল । এর উদ্দেশ্য ছিল সঠিক ওজন নির্দেশ করা।

উমর রা.-এর এ পদক্ষেপের কারণ ছিল সে সময় মুসলমানদের ব্যবসায়-বাণিজ্যে অস্বাভাবিক বিস্তৃতি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের এ প্রসারতার জন্য প্রয়োজনীয় মুদ্রা সরবরাহ করা ।

এভাবে মুদ্রা একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে এবং ইসলামী মুদ্রায় পরিণত হয় এবং এর উপর বিভিন্ন ধরনের ইসলাম শব্দাবলী অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়। এভাবেই খলীফা ওমর রা. ইসলামী মুদ্রা প্রচলনের দিক থেকে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের উপর অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

তবে ড. হামদান আব্দুল মজিদ আল কাবিছি বলেন,[৩৬] উমর রা. নতুন মুদ্রা প্রচলন করেন। তিনি শুধু মুদ্রার আকৃতি পরিবর্তন করেছেন যাতে সংযোজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। প্রকৃত ঘটনা যাই হোক না কেন এতে উমর রা.-এর অগ্রণী ভূমিকাকে কোন ভাবেই দুর্বল করে না।

ইসলামী মুদ্রা এখান থেকেই শুরু হয়েছে। এরপর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীন তা পূর্ণতা দান করেন এবং উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সময় মুদ্রা ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটে এবং তিনি প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থায় পূর্ণ ইসলামী মুদ্রা চালু করেন।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ

এ পর্যায়ে দিরহামের ওজন স্থিতিশীল করা হয়। কারণ ইত:পূর্বে দিরহামের ওজন বিভিন্ন রকম ছিল। কেননা সে সময় রোম সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে মুদ্রা ব্যবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় নিপতিত হয়। অতঃপর পৃথিবীতে ইসলামের আলো উদ্ভাসিত হলে পর্যায়ক্রমে পুঞ্জিভূত সমস্যার সমাধান হতে থাকে। মাওয়ারদী উল্লেখ করেন, "উমর রা. যখন দিরহামের পরিমাণের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখেন যেমন-

---

[৩৬]. আলামাওয়ারদী, *আলাআহকামিল সুলতানিয়া*, পৃ. ২৫২

বাগালি দেরহামের পরিমাণ ছিল আট দাওয়ানেক, এবং তাবারি দিরহামের পরিমাণ ছিল চার দাওয়ানেক, মাগরেবী দিরহামের পরিমাণ ছিল তিন দাওয়ানেক আর ইয়ামেনি দিরহামের পরিমাণ ছিল এক দাওয়ানেক। তিনি বলেন, "তোমরা লক্ষ্য কর, কোন- মুদ্রা বেশি ব্যবহৃত হয় এবং অধিকাংশ মানুষ ব্যবহার করে। অতঃপর দেখা যায়, বাগালি দিরহাম এবং তাবারি দিরহাম সর্বাধিক ব্যবহার হয়। তিনি ঐ দুটি মুদ্রা একত্র করেন এবং তা ১২ দাওয়ানেকে পরিণত হয়। তিনি এর অর্ধেক ছয় দাওয়ানেক গ্রহণ করে 'ইসলামী দিরহাম' ছয় দাওয়ানেক প্রচলন করেন।

ইমাম মাকরিজি, ইবনে খালদুন ও ইমাম মাওয়ারদী এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, উমর রা. উপরোক্ত পদক্ষেপটি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইবনে সালাম উক্ত কাজটি উমাইয়া খলিফাদের কাজ বলে উল্লেখ করেন এবং ইবনে কুদামাহ্ আল-মাকদিসী উক্ত অভিমত সমর্থন করেন।[৩৭]

ইমাম আবু উবায়েদ বলেন, "উমাইয়া যুগে যখন মুদ্রা তৈরীর প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় তখন এর পরিণতি কি হবে তার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়। অতঃপর যখন মুদ্রা তৈরির জন্য সকলেই সম্মত হন তখন পূর্ণ দিরহামের বিবেচনা করা হয় আর এর পরিমাণ ছিল আট দাওয়ানেক, এর চেয়ে ছোট দিরহামের পরিমাণ ছিল চার দাওয়ানেক । অতঃপর তারা ছোট ও বড় উভয় প্রকারের মুদ্রাকে সম মুদ্রায় পরিণত করেন এবং দু'টি মুদ্রাই ছয় দাওয়ানেক করে তৈরী করা হয়।[৩৮]

দিরহামকে মিসকাল-এ রূপান্তর

অনারবদের তৈরী দিরহাম ছোট-বড় ছিল। আরবগণ তা থেকে মিসকাল তৈরী করতো যার ওজন ছিল বিশ কিরাত, কোনটি ১২ কিরাত, কোনটি ১০ কিরাত, আর এটাই ছিল মধ্যম পর্যায়ের। ইসলামের আবির্ভাবের পর যাকাত আদায়ের জন্য মধ্যম পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হল তখন তারা ২০ কিরাত, ১২ কিরাত ও ১০ কিরাত যোগ করে ৪২ কিরাত পান এবং এর এক তৃতীয়াংশ ওজন নিয়ে নতুন করে দিরহাম তৈরী করেন যার ওজন ১২ কিরাত। এতে প্রতি ১০ দিরহামের ওজন হয় ৭ মিসকাল, তাতে ৭ মিসকাল সমান ১৪০ কিরাত হতো।[৩৯]

ইবনে খালদুন এ ওজনের পক্ষে বলেন, "ইসলামের প্রথম যুগ, সাহাবাদের যুগ ও তাবেয়ীদের যুগ থেকেই এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে যে, ইসলামী দিরহাম দশ দিরহাম সমান ৭ মিসকাল স্বর্ণ এবং এর এক আওকিয়া সমান ৪০ দিরহাম, এ হিসাবে এক দিরহাম এক দিনারের ৭ (সাত) দশমাংশ এবং এক মিসকাল স্বর্ণের পরিমাণ হল ৭২

---

[৩৭]. আবুওবায়েদ, আম-আমওয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

[৩৮]. আল-বালাজুরী, *ফুতুহুল বুলদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১

[৩৯]. ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

গমের দানা। সুতরাং এক দিরহাম যা এক দিনারের সাত দশমাংশ, এর পরিমাণ হল ৫০, ২/৫ গমের দানা। আর এ পরিমাণগুলো প্রতিটিই ইজমা দ্বারা সমর্থিত।[৪০]

আলমাজমু গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রাফেয়ী এবং অন্যরা বলেছেন, প্রথম যুগের অধিবাসীগণ এই ওজনের ভিত্তিতে পরিমাপ করার জন্য ইজমা করেছেন অর্থাৎ এক দিরহাম সমান ছয় দাওয়ানেক এবং প্রতি ১০ দিরহাম সমান সাত মিসকাল।[৪১] ইবনে নুজাইম বলেন, "প্রতি ১০ দিরহাম সমান ৭ (সাত) মিসকাল যা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[৪২]

সুতরাং খলীফা উমরের রা. আমলে মুদ্রা সংশোধন করে নির্ধারিণ করা হয়েছে দিনার এবং দিরহামের মধ্যে স্থায়ী অনুপাত অর্থাৎ ৭/১০, (অর্থাৎ এক দিরহাম সমান ৭/১০ দিনার, এবং এখান থেকে 'ইসলামী দিরহামের' ওজন ছিল (২,৯৭ গ্রাম) এবং 'ইসলামী দিনারের' ওজন ছিল (৪, ২৫ গ্রাম)।[৪৩]

তৃতীয় পদক্ষেপের প্রচেষ্টা

এ পদক্ষেপে খলীফা উমর রা. স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রার পরিবর্তে পশুর চামড়ার মুদ্রা প্রচলন করতে চেয়েছিলেন এর উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের ফলে বিনিময় হার বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য মুদ্রা বহন সহজসাধ্য করা ।

বালাজুরী বলেন, উমর রা. বলেছেন, "আমি চেয়েছিলাম উটের চামড়া দিয়ে 'দিরহাম' তৈরী করতে। আমাকে সতর্ক করা হলো এই বলে যে, 'তা হলে তো কোন উটই থাকবে না' তারপর আমি বিরত হলাম।[৪৪]

উসমান রা. তার পূর্বসুরীর নিয়মই অনুসরণ করেছেন। তিনিও নতুন মুদ্রা তৈরী করেন এবং তাতে ইসলামী শব্দাবলী সংযোজন করেন।

ইমাম মাকরিজি বলেন, "উসমান ইবনে আফ্‌ফান রা. খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর (২৩ হি. /৬৪৪ ইং) 'দিরহাম' তৈরী করেন এবং এতে "আল্লাহু আকবার' লিখে নকশা করা হয়।[৪৫]

আলী ইবনে আবু তালিব রা. এর আমলেও পূর্বের মতই মুদ্রার উন্নয়ন কাজ চালু ছিল। তিনি ইসলামী মুদ্রার প্রচুর উন্নয়ন সাধন করেন, মুদ্রার পুনঃমূল্যায়ন করেন

---

[৪০]. আল-নববী, *শাহরুল মিহজাব,* আল-মদিনা আল-মুনুয়ারা : আলতাদামুন আল উখুবি, আলমাকতাবা আলসালাফিয়া, তা. বি., খ. ৬, পৃ. ১৫

[৪১]. যায়নুদ্দিন ইবনে নাজিম আল-হানাফী, *আলবাহরুর রায়েক শরহে কানজু দাকায়েক,* বৈরুত, দারুল মারিফাহ, তা. বি., খ. ২, পৃ. ২৪৪

[৪২]. ড. আব্দুর রহমান ফাহমী মুহাম্মদ, *আলনুকুদ আল-আরাবিয়া ঃ মাদিহা ওয়া হাদেরুহা,* আল-কাহেরা, ১৯৬৪, পৃ. ১০

[৪৩]. বালাজুরী, *ফুতুহুল বুলদান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬

[৪৪]. আলমাকরিজি, *শুজুরিল উকুদ ফি যিকরিন নুকুদ,* তা. বি. পৃ. ৮

[৪৫]. ইউসুফ ইলিয়াস সারকিস,*আন নুকুদ আল-আরাবিয়া আল-কাদিমাহ,* সাময়িকি আলমুকতাতাফ, ভলিউম ৪৯, জুলাই ১৯১৬, পৃ. ৫৮

এবং এর উপর আরবী ইসলামী শব্দাবলী সংযোজন করেন। 'আলমুকতাতাফ' নামক সাময়িকীতে এসেছে, "আলী রা. এর খিলাফতের সময় যে সব মুদ্রা (হিঃ ৩৭ সনে) তৈরী করা হয়েছিল সেসব মুদ্রার উপর লিখা ছিল "ওলিআল্লাহ্" এবং হি. ৩৮ ও ৩৯ সনে তৈরী মুদ্রার উপর লিখা ছিল "বিসমিল্লাহি রাব্বি"।[৪৬]

উমাইয়া যুগে মুদ্রা ব্যবস্থা

ক. মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের রা. আমলে ইসলামী মুদ্রাব্যবস্থা

ইমাম মাকরিজি বলেন, "যখন মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা. এর নিকট মুদ্রার বিষয়টি ওঠল এবং কুফা ও বসরার লোকজন তার পুত্র জিয়াদের নিকট উপস্থিত হল তখন তিনি বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহর নেক বান্দাহ উমর রা. দিরহামকে ছোট করেছেন এবং হাতকে বড় করেছেন এবং এর উপর সৈন্যদের বেতনের জন্য ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছে এবং প্রজাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন হিসেবে শিশুদের জন্য বন্টন করা হচ্ছে। আপনি যদি এর চেয়ে স্বল্প ওজনের মুদ্রা প্রচলন করতেন তাহলে সাধারণ মানুষের প্রতি অধিক দয়া প্রদর্শন করা হতো এবং এর দ্বারা একটি উত্তম নিয়ম প্রচলিত হতো ।

অতঃপর মুয়াবিয়া রা. ছয় দাওয়ানেকের চেয়ে কম ওজনের মুদ্রা প্রচলন করেন যার ওজন ১৫ কিরাত হয়, এক কিংবা দুই দানা কম। এর পর জিয়াদ নতুন করে মুদ্রা তৈরী করেন এবং প্রতি ১০ দিরহামের ওজন সাত মিসকাল করে তা দিরহামের পরিবর্তে ব্যবহার হতো।[৪৭]

মুয়াবিয়া রা. এর কার্যাবলী শুধু 'দিরহাম' তৈরী করার মধ্যেই থেমে ছিল না, তিনি ৪১ হিজরী/৬৬১ ইং সনে 'দিনার' ও তৈরী করেন। মোঃ আলী, 'ইরাক রিপাবলিক' নামক পত্রিকা থেকে সংকলন করেন, "চীন প্রজাতন্ত্রের 'সিয়ান' নামক গোরস্থানে সম্প্রতি তিনটি আরবী স্বর্ণের টুকরো আবিস্কৃত হয়েছে অত:পর এ গোরস্থান "চীনা ঐতিহ্য পরিষদ" কর্তৃক তদন্ত করা হয়েছে এবং তাতে দেখা গেছে ঐ মুদ্রাটির ব্যাস ১ : ৯ সেমি, উজন ছিল ৪, ৩ গ্রাম, পুরো ছিল এক মি.লি.। এক পিঠের মধ্যস্থানে তিন লাইনে আরবীতে লিখা, 'লা ইলাহা ইল্লালাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু', 'মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, আরছালাহু বিল-হুদা ওয়া দিনিল-হাক্ক'। প্রত্যেক মুদ্রার অপর পিঠে কুফী অক্ষরে নকশা বিদ্যমান ছিল, সেখানে লিখা এই দিনারটি তৈরী করা হয়েছে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের সময়ে ।

খ. আব্দুলাহ্ ইবনে যুবায়ের রা.-এর আমলে মুদ্রাব্যবস্থা

আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের রা. মুদ্রা বিষয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা হচ্ছে, তিনি মুদ্রার আকার পরিবর্তন করেছিলেন এবং আয়তাকারের পরিবর্তে

---

[৪৬]. আলমাকরিজি, *শুজুরিল উকুদ ফি যিকরিন নুকুদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯

[৪৭]. মুস্তফা আবদুল্লাহ আল-হামশারী, *আল আমাল আল মাসরাফিয়া ওয়াল ইসলাম*, বৈরুত : ইসলামী কুতুবখানা, তা. বি. পৃ. ১০৪

গোলাকার করে তৈরী করেছিলেন। ঐতিহাসিক জাওদাত পাশা ১৯ হিজরীতে ইয়াজেদ নামক স্থানে তৈরী মুদ্রা দেখেছেন। এর চতুর্দিকে লিখা ছিল, "আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের আমীরুল মুমিনীন"।[৪৮]
অন্যদিকে আব্দুলাহ ইবনে যুবায়েরের পুত্রও মুদ্রার উপর বিভিন্ন ইসলামী শব্দাবলী সংযোজন করেছিলেন।

ইমাম মাকরিজি বলেন, আব্দুলাহ ইবনে যুবাইর যখন মক্কায় খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি গোলাকার মুদ্রা তৈরী করেন সুতরাং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি গোলাকার দিরহাম তৈরী করেছিলেন। এর পূর্বে যে সব 'দিরহাম' তৈরী করা হয়েছিল তা ছিল পুরু ছোট ও আয়তাকার। অতঃপর তিনি গোলাকার করে তৈরী করেন এবং এর এক পৃষ্ঠায় নকশাকারে লিখা হয়, 'মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ' অন্য পৃষ্ঠায় লিখা হয় 'আমারাল্লাহু বিল ওফায়ে ওয়াল আদলে' (আল্লাহ ওয়াদা পূর্ণ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন)।

ঐতিহাসিক বালাজুরী বলেছেন, আব্দুলাহ ইবনে যুবায়ের রা. এর নির্দেশে মুসয়াব রা. 'দিরহাম' তৈরী করেছিলেন ৭০ হিজরীতে পারস্যের মুদ্রার ধরন অনুযায়ী এবং এর উপর লিখা হয়েছিল 'বারকাতুল্লাহ' এবং 'আল্লাহ'। অদ্রূপ বর্ণিত আছে, মুসয়াব রা. দিনার তৈরী করেছিলেন। মাওয়ারদী, ইবনে খালদুন এবং ইমাম মাকরিজিও একই কথা বলেছেন।[৪৯]

গ. খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের যুগে মুদ্রাব্যবস্থা
অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতানুসারে[৫০] খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলামী দিনার তৈরী করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামী মুদ্রা প্রচলনের পূর্ণ মর্যাদা পেয়েছিলেন এবং তিনিই সমগ্র পৃথিবীতে প্রধান ও প্রথম মুদ্রা তৈরী ও প্রচলনকারী হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। আধুনিক পরিভাষা অনুযায়ী 'ইসলামী দিনার' তখনকার 'হার্ড কারেন্সি' তে পরিণত হয়েছিল।

একটি আধুনিক গবেষণায় ড. নাজদাহ খামাস বলেন, "সিরিয়ায় দিনার পাওয়া গিয়েছিল ১৯৫৪ সনে, এরপর লেবাননে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখান থেকে করাচির যাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয় এবং এখনও সেখানেই আছে। এই আরবীয় নতুন দিনার তৈরী হয়েছিল ৭৪ হিজরী সনে। এর প্রথম পৃষ্ঠায় অংকিত ছিল খলিফা আব্দুল মালিকের ছবি, দণ্ডায়মান, তরবারী হাতে, পরনে যুদ্ধের পোশাক। এর চতুর্দিকে লিখা ছিল বিপরীত দিক থেকে 'বিসমিল্লাহ' 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু', 'মুহাম্মদ রসূলুলাহ' প্রথম পীঠের মধ্যখানে ছিল বাইজেনটাইন ক্রস, এর চতুর্দিকে লিখা ছিল 'বিসমিল্লাহ'। এই দিনার হিজরী ৭৪ সনে তৈরী করা হয়েছিল।[৫১]

---

[৪৮]. আল-মাকরিজি, *ইগাছাতুল উম্মাহ বি কাশফিল গুম্মাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
[৪৯]. আল-মাওয়ারদি, *আল আহকাম আল সুলতানিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪
[৫০]. ড. নাজদাহ খামাস, *তারিবুন্নাকদে ওয়া আসারুহু আলাল এলাকাতিল আরাবিয়া আলবায়জানতিয়া ওয়ালআয়িল ইকতেসাদি*, মাজাল্লা দিরাসাত তারিখিয়া, সংখ্যা ১৫,১৬, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪, পৃ. ১৩৭-৮
[৫১]. আল-মাকরিজি, *ইগাছাতুল উম্মাহ বি কাশফুল গুম্মাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

গবেষকগণ এমতকেই সমর্থন করে বলেন, তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামী দিনার তৈরি করেন, তবে এর দ্বারা গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইসলামী মুদ্রা প্রস্তুতকারী হিসেবে উমর রা. এর নাম অস্বীকার করা যায় না দু'কারণে ঃ

প্রথমতঃ ঐতিহাসিকগণ এবং গবেষকগণের মতামতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব। খুলাফায়ে রাশেদার দ্বিতীয় খলীফা উমর রা. প্রথম 'ইসলামী দিরহাম' তৈরী করেন। উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান সর্বপ্রথম 'ইসলামী দিনার' তৈরী করেছিলেন। 'দিরহাম' 'দিনার' নয়। প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক কাজ করেছেন। সুতরাং অগ্রজ আর অনুজের কাজের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

দ্বিতীয়ত ঃ খুলাফায়ে রাশেদার দ্বিতীয় খলীফা উমর রা. ইসলামী মুদ্রার সূচনা করেছিলেন, তাঁর তৈরী মুদ্রার উপর বিভিন্ন ইসলামী শব্দাবলী সংযোজনের মাধ্যমে। অতঃপর তাঁর পরে যারা এসেছেন ঐ কাজেরই পূর্ণতা দান করেছেন এবং প্রত্যেক খলীফা নতুন কিছু সংযোজন করেছেন। এভাবে খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের যুগে তিনি অনুভব করেন যে, এখন মুসলমানদের অর্থনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের সময় এসেছে। অতঃপর তিনি ইসলামী দিনার তৈরী ও প্রচলন করেন এবং ঐ মুদ্রা যাতে সেকালে গোটা পৃথিবীর 'হার্ড কারেন্সি' হিসেবে পরিগণিত হয় তার জন্য তিনি সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সুতরাং ইসলামী মুদ্রা তৈরী ও প্রচলনের কাজ প্রথম শুরু হয়েছে হযরত উমর রা. এর সময়ে এবং এর পূর্নতা ঘটেছে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের আমলে।

খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন ইসলামী মুদ্রার পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য, তা নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১. তিনি ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে মুদ্রা প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশ দেন। অতঃপর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এ কাজ সম্পাদন করেন। বালাজুরী বলেন, 'হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ' জিজ্ঞাসা করেন, 'পারস্যের লোকেরা কিভাবে দিরহাম তৈরী করতো'। তিনি তা প্রস্তুত করার জন্য একটি ঘর নির্দিষ্ট করেন এবং সেখানে প্রস্তুতকারীদের একত্র করেন বিভিন্ন উপাদান দ্বারা 'মুদ্রা' বা 'দিরহাম' তৈরী করা হয় এবং দিরহামের উপর আরবীতে লিখা হয় 'কুলহু আল্লাহু আহাদ'।[৫২]

২. এরপর খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান যখন মুসলমানদের একাজে পারদর্শিতা দেখলেন তখন তিনি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নিকট কাঁচা রৌপ্য পাঠালেন এবং হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেন এ থেকে দিরহাম তৈরী করার জন্য এবং প্রস্তুতকারীদের জন্য বেতন নির্ধারিণ করেন।

---

[৫২]. ড. আব্দুর রহমান ফাহমী মুহাম্মদ, *আন-নুকুদ আল-আরাবিয়া মাদিহা ওয়া হাদেরুহা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৩. খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান নির্দেশ দেন, পূর্বেকার তৈরী ও প্রচলিত সকল 'দিনার' বায়তুলমালের মাধ্যমে প্রত্যাহার করে নতুন তৈরী আরবী ডিজাইনের মুদ্রা প্রতিস্থাপন করার জন্য।[৫৩]

সম্ভবতঃ এতে 'মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের' তৈরী 'দিনার' আমাদের নিকট না পৌঁছার কথাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি তার পূর্বেকার প্রচলিত সমস্ত মুদ্রা বাতিল করে নতুন করে ইসলামী মুদ্রা তৈরী করেছিলেন।

এভাবে 'ইসলামী মুদ্রা' খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের ফলে সমগ্র পৃথিবীতে একক আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল এবং পৃথিবীর বহু জাতিক বিনিময় মাধ্যম হিসেবে পরিণত হয়েছিল। এর প্রমাণ রাশিয়া, পোলান্ড, ফিনল্যান্ড এবং জার্মানিদের নিকট অদ্যাপি বিদ্যমান আরবীয় মুদ্রাগুলো।
উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এটাই পরিষ্কার হল যে, হিজরী প্রথম শতাব্দি সমাপ্তির পূর্বেই ইসলামী মুদ্রা তথা ইসলামী স্বর্ণ মুদ্রা 'দিনার' এবং ইসলামী রৌপ্য মুদ্রা 'দিরহাম' গোটা পৃথিবীর প্রধান মুদ্রায় (Hard Currency) পরিণত হয়।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের গোড়া থেকে বাগদাদের পতন পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে মুদ্রা ব্যবস্থার উন্নয়ন

উপরোক্ত সময়কালের মধ্যে ইসলামী মুদ্রার উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনায় মুদ্রার ক্ষেত্রে যে সব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তাকে দু'ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায়। প্রথমতঃ আকৃতিগত পরিবর্তন, যেমন মুদ্রার উপর বিভিন্ন ধরনের নকশা, লিপি ইত্যাদির পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত ঃ মৌলিক পরিবর্তন। যেমন- মুদ্রার প্রকার এবং ধাতুগত পরিবর্তন।

প্রথমত ঃ মুদ্রার আকৃতিগত পরিবর্তন ছিল নিম্নরূপ-

(ক) মুদ্রার উপর খলীফাদের নাম, পদবী, খলীফাদের সন্তানদের নাম ইত্যাদি লিখা হতো। এরপর খলীফাগণ তাদের নাম উল্লেখের পর তাদের কর্মচারীদের নাম, তাদের উপাধি, তাদের পদবী ইত্যাদি লিখতেন। ডঃ আব্দুর রহমান ফাহমী মুহাম্মদ বলেন, 'খলীফা হারুনুর রশিদের যুগ হতে (১৭০-১৯৩) আরবী ও ইসলামী মুদ্রা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি সাধিত হয়েছে । তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তার নাম, তার পুত্র আমিনের নাম[৫৪] স্বর্ণমুদ্রা দিনারের উপর লেখা হয়।[৫৫]

(খ) মুদ্রার আকার-আকৃতিতে আরো যেসব পরিবর্তন হয়েছিল তা হলো ঃ মুদ্রার আকৃতি গোলাকার থেকে আয়তাকৃতি করা হয়েছিল। ইবনে খালদুন বলেন, সে সময় দিনার এবং দিরহামগুলো গোলাকার ছিল এবং এর চতুর্দিকে লিখা থাকতো। এর এক পীঠে লিখা থাকতো ঃ আল্লাহর নাম, কলেমা-লা ইলাহা

---

[৫৩]. আনিস তাসমারী আলকারমালী আলবাগদাদী, *ইলমুন্নামিয়াত*, আল-কাহেরা, আলআসরিয়া, ১৯৩৯, পৃ ১২২-১৩৬

[৫৪]. ড. আব্দুর রহমান ফাহমী মুহাম্মদ, *আল-নুকুদ আল-আরাবিয়া ঃ মাদিহা ওয়া হাদেরুহা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

[৫৫]. ইবনে খালদুন, *আলমুকাদ্দিমাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২

ইল্লালাহু, আলহামদু লিল্লাহ ও নবী স. এর দরুদ। অন্য পীঠে লিখা থাকতো- তারিখ খলীফার নাম। এরকম ছিল উমাইয়া এবং আব্বাসীয় খলীফাদের যুগে। এরপর খলীফা মাহদীর সংস্কার কাজের অন্যতম ছিল, দিরহামকে গোলাকার থেকে আয়তাকৃতি করা এবং দিনারের চতুর্দিকে ও মধ্যখানে আয়তাকৃতির ডিজাইন করা। এর এক পৃষ্ঠা কলেমা-লা ইলাহা ইল্লাহু আলহামদু লিল্লাহ দিয়ে পূর্ণ করেন এবং অন্য পৃষ্ঠায় তার নাম এবং তার পরবর্তী খলীফাদের নাম লিখেন।

দ্বিতীয়ত ঃ মুদ্রার মৌলিক দিক এবং ধাতুগত যে সব পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল-

(ক) মুদ্রার পরিমাণ ও গুণের মধ্যে প্রতারণা ঢুকে গিয়েছিল। দিনার ও দিরহামের পরিমাণের মধ্যে আইনানুগ পরিমাণের চেয়ে অনেক কম ছিল। ইমাম মাকরিজি বলেন, 'যখন খলীফা মোতাওক্কিল নিহত হলেন[৫৬] এবং তুর্কিরা বিজয়ী হল, খিলাফতের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হল এবং আব্বাসীয় খিলাফত বহুধা বিভক্ত হল, প্রসাশনিক ব্যবস্থায় দুর্বলতা পরিলক্ষিত হল, মানুষের জীবন জীবিকার খরচ বেড়ে গেল, মুদ্রামান হ্রাস পেল, সে সময় অনেক কুসংস্কার দেখা দেয়, চতুর্দিকে অরাজকতা পরিলক্ষিত হল তখন মুদ্রার পরিমাণের মধ্যেও প্রতারণা সৃষ্টি হয়েছিল।[৫৭]

ইবনে খালদুন বলেন, তখন দিনার এবং দিরহামের সরকার নির্ধারিত পরিমাণ উল্লেখ করে উক্ত এলাকার জনসাধারণের জন্য কম ওজনের দিনার এবং দিরহামের মুদ্রা গ্রহণ না করা এবং প্রতিবাদ করার অধিকার দেয়া হয়। প্রতি এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং তারা পূর্বের মত মুদ্রার আইনানুগ পরিমাণ অনুমানের মাধ্যমে নির্ধারণ করে এবং তাদের আইনানুগ অধিকার নির্ধারণ করেন সরকার নির্ধারিত পরিমাণের অনুপাত অনুযায়ী।

(খ) স্বর্ণ মুদ্রা ও রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে অন্যান্য ধাতব মুদ্রার বিস্তার ঘটে এবং এমন কিছু মুদ্রার বিস্তার ঘটে যা দেখা যায়নি।

ফাতেমীয় শাসনামলের (২৯৬- ৫৬৭ হি./৯০৯-১১৭১ ইং), কোন কোন পর্যায়ে রাষ্ট্র বিশেষ করে হাকিম বি আমরিল্লাহ এর আমলে (৩৮৬-৪১১হি.) অর্থের অভাব অনুভব করে ফলে রাষ্ট্র তখন কাঁচের মুদ্রা প্রচলন করে। এর প্রধান কারণ ছিল সে সময় রাষ্ট্রের নিকট স্বর্ণ ও রৌপ্যের অপর্যাপ্ততা পরিলক্ষিত হয়েছিল।[৫৮]

পরবর্তীতে খলীফা সালাহউদ্দীন আইয়ূবীর আমলে (৫৬৭-৬৪৮ হি./১১৭১-১২৫০ ইং পর্যন্ত সময়ে) স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রচণ্ড অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে রাষ্ট্র তখন সীসা

---

[৫৬]. আলমাকরিজি, *শুজুরিল উকুদ ফি যিকরিন নুকুদ*, পৃ. ২০-২১

[৫৭]. ইবনে খালদুন, *আল মুকাদ্দিমাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩-২৬৪

[৫৮]. ড. ফৌজি আতাবি, *ফিল ইকতিসাদ আল সিয়াসিঃ আল নুকুদ ওয়ান নুজুম আল নকদিয়া,* বৈরুতঃ দারুল ফিকর আল-আরাবি, ১৯৮৯, পৃ. ৭৭-৭৮

থেকে মুদ্রা তৈরী করে এবং এত বেশী পরিমাণ প্রস্তুত করা হয় যে, স্বর্ণের ও রৌপ্যের মুদ্রার চেয়ে সীসার তৈরী মুদ্রার পরিমাণই বেশী হয়েছিল।[৫৯] বাগদাদ পতনের পূর্বে মুদ্রা ব্যবস্থায় এ পরিবর্তনগুলো সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু বাগদাদের পতনের পর একদিকে প্রাচ্যের মুগলগণ আক্রমণ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকে, অন্যদিকে ইউরোপীয়রা এ অঞ্চলের দিকে লোলুপ দৃষ্টি প্রসারিত করে। ফলে মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের অধ:পতন ঘটতে শুরু করে।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা হতে জানা গেল, আধুনিক জগতের সকল দ্রব্য বস্তু ও সম্পদের মূল্য পরিমাপক এবং বিনিময় মাধ্যম হিসেবে এবং সকল অর্থনৈতিক কারবারের চাবিকাঠি হিসেবে মুদ্রা অপরিহার্য মাধ্যম। আধুনিক মুদ্রার উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসে ইসলামের গৌরবোজ্জল ভূমিকা রয়েছে, যদিও আধুনিক অর্থনীতির প্রবক্তাগণ ইসলামের এই অবদানকে উপেক্ষা করতে চান। ইসলামের আবির্ভাবের যুগসন্ধিক্ষণে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের 'দিনার' ও 'দিরহাম' আরব বিশ্বেও ব্যবহার হতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর নব গঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মহান খলীফা উমর রা. এর আমল থেকে ইসলামী মুদ্রার উৎপত্তি ও বিকাশ শুরু হয়ে বাগদাদের পতন পর্যন্ত ইসলামের সুদীর্ঘ শাসনামলে একটি অতি উন্নত এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলামী মুদ্রা ও মুদ্রা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছিল। ইসলামের সুদীর্ঘ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণ মুদ্রা 'দিনার' এবং রৌপ্য মুদ্রা 'দিরহাম' তৎকালীন প্রায় গোটা পৃথিবীতে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে গণ্য হতো। ইসলামী শাসনামলের অবসানের পরও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ইসলামী মুদ্রা বিভিন্ন নামে ব্যবহৃত হতো। আজও পৃথিবীর বিভিন্ন যাদুঘরে 'ইসলামী মুদ্রা' সংরক্ষিত আছে। তাই মুদ্রার ইতিহাস তথা আধুনিক মুদ্রার আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ইসলাম ও 'ইসলামী মুদ্রা' ও মুদ্রা ব্যবস্থার গুরুত্ব ও অবদান অবিস্মরণীয়।

ইসলামী শাসনামলের অবসানের পর বহু শতাব্দি কাল গোটা পৃথিবী ইসলামের আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। তার পর প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মুসলিম দেশগুলো পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করতে থাকে। মুসলমানরা হারানো গৌরব আবার ফিরে পায়। দিকে দিকে শুরু হয় মুসলমানদের নব জাগরণ। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ইসলামী অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়ে নানা গবেষণা চলছে। ইসলামী মুদ্রাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা তাই এখন সময়ের দাবি।

---

৫৯. প্রাগুক্ত

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮ সংখ্যা-৩১
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১২

ব্যবসায়-বাণিজ্যে মজুদদারিঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ

কামরুজ্জামান শামীম*

[সারসংক্ষেপঃ সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ সমাজবদ্ধভাবে একত্রে মিলেমিশে বসবাস করে। প্রয়োজনের তাগিদে একে অন্যের সাথে পারস্পরিক লেনদেন এবং জিনিসপত্রের আদান-প্রদান করে থাকে। প্রাত্যহিক লেনদেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ব্যবসায়-বাণিজ্য। ব্যবহারিক জীবনে ব্যবসায়-বাণিজ্যে পণ্য ও মূল্যের বিনিময় হয়ে থাকে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে পণ্য ও মূল্যে যৌক্তিক বিনিময় আদান প্রদান হওয়া কাম্য হওয়া সত্ত্বেও যখন বিক্রেতা অতি মুনাফার লোভে চড়ামূল্যে বিক্রয় করার জন্য পণ্য সামগ্রী কুক্ষিগত করে, তখন একে বলে মজুদদারি। এর ফলে পণ্যের মূল্য বেড়ে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায় এবং জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ইসলাম এ সমস্যা সমাধানে যথাযথ দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। ইসলাম মজুদদারিকে হারাম ঘোষণা করত: অতি মুনাফা অর্জনের মানসিকতা পরিহারের নির্দেশ দিয়েছে। মজুদদারির কারণে কোন ভাবেই যেন জনজীবন বিপর্যস্ত না হয়ে পড়ে, সে জন্য কুরআন ও হাদীসে এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মজুদদারির বিভিন্ন দিক আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।]

মজুদদারি-এর পরিচয়

পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেনের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখার স্বার্থে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইসলাম নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ব্যবসায়-বাণিজ্য। ইসলাম ব্যবসায়-বাণিজ্য উৎসাহিত করতে যেমন বিভিন্ন রকম জাগতিক ও পারলৌকিক প্রাপ্তির ঘোষণা দিয়েছে তদ্রূপ বিভিন্ন ধরনের নৈরাজ্যকর ও অবাঞ্ছনীয় পদক্ষেপ প্রতিরোধে জাগতিক এবং পারলৌকিক শাস্তিও ঘোষণা করেছে। পণ্য সামগ্রী জমা রেখে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সমাজের দুর্ভোগ বৃদ্ধি ও অতি মুনাফা অর্জন করাকে দণ্ডনীয় কাজ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

আভিধানিক অর্থ

মাওজুদ বা মজুদ শব্দ থেকে মজুদদারি শব্দটি এসেছে। মাওজুদ অর্থ হচ্ছে, সঞ্চিত, জমা, হাজির, উপস্থাপিত ইত্যাদি। আর মজুদদারি অর্থ হচ্ছে, দ্রব্যাদি অন্যায়ভাবে

---

* পিএইচ. ডি. গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মজুদ বা জমা রাখা। যে ব্যবসায়ী অন্যায়ভাবে দ্রব্যাদি মজুদ করে রাখে তাকে মজুদদার বলা হয়।[১]

আরবী ভাষায় মজুদদারিকে ইহতিকার (احتكار) বলা হয়। ইহতিকার (احتكار) শব্দের অর্থ হচ্ছেঃ একচেটিয়াকরণ, একচ্ছত্র সুবিধাভোগ, মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পণ্য ধরে রাখা ইত্যাদি।[২]

লিসানুল আরাব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, ইহতিকার (احتكار) শব্দটি حكر (হাকরুন) শব্দমূল থেকে এসেছে। حكر শব্দের অর্থ হচ্ছে, খাদ্য সামগ্রী আটকে রেখে পুঞ্জীভূত করা। যে আটক রাখে তাকে (মুহতাকির) محتكر বলে।[৩]

আররায়িদ প্রণেতা বলেন, حكر শব্দের অর্থ হচ্ছে, অন্যায়ভাবে হ্রাস করা, দুর্ব্যবহার করা, পণ্য সামগ্রী আটকে রাখা এবং উচ্চমূল্যে লাভবান হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শেষ অর্থটিই উদ্দেশ্য।[৪]

আল-মুনজিদ অভিধানে বলা হয়েছে,

احتكار الشيء: جمعه و احتبسه انتظارا لغلائه فيبيعه بالكثير

"পণ্য মজুদ করে চড়া মূল্যের অপেক্ষায় আটকে রাখা। অতঃপর মূল্য বৃদ্ধি পেলে অধিক মুনাফায় তা বিক্রি করা"।[৫]

পারিভাষিক অর্থ

ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদদের মতে, ইসলামী পরিভাষায় মজুদদারি হচ্ছে, খাদ্যশস্য মজুদ করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করা। অতঃপর মূল্য বৃদ্ধি পেলে তা বিক্রি করে প্রচুর পরিমাণে লাভবান হওয়া।

আল-হিদায়া প্রণেতার ভাষায় : الاحتكار هو حبس الأقوات متربصا للغلا

অর্থাৎ-ইহতিকার বা মজুদদারি হচ্ছে, খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করে মূল্য বৃদ্ধির আশায় গুদামজাত করা।[৬]

আল্লামা ইমাম ইবনে আবেদীন শামী র. বলেন-

الاحتكار هو اشتراء طعام و نحوه و حبسه إلى الغلاء اربعين يوما

---

[১]. শৈলেন্দ্র্য বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, কলকাতা সাহিত্য সংসদ, ২০০২, পৃ. ৬৭৬

[২]. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান* (আল-মুজামুল ওয়াফী), ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৪২

[৩]. ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরাব*, আল-কাহেরাঃ দারুল হাদীস, ২০০৩, পৃ. ৫৩৭

[৪]. জাবরান মাসউদ, *আর-রায়িদ*, বৈরূতঃ দারুল ইল্ম লিল-মালায়িন, ১৯৯২, পৃ. ৩১৩

[৫]. কামিল ইসকান্দর হুশাইমার তত্ত্বাবধানে রচিত, *আল-মুনজিদ ফিল লুগাতি ওয়াল-আলাম*, বৈরূতঃ দারুল মাশরিক, ২০০০, পৃ. ১৪৬

[৬]. বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী, *আল-হিদায়া*, দিল্লীঃ মাতবায়া মুজতাবাই, ১৯০৭, পৃ. ৪৫৪

"ইহতিকার হচ্ছে, খাদ্য সামগ্রী বা নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে উচ্চ মূল্যের জন্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত আটক রাখা"।[৭]

ইমাম আবু ইউসূফ র. এর মতে- كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار
"যে সকল জিনিস আটকে রাখলে সর্বসাধারণের কষ্ট হয়, তাকে ইহতিকার বা মজুদদারি বলে"।[৮]
ইমাম গাযালী র. বলেন, "মজুদদারি হলো, খাদ্য শস্য ক্রয় করতঃ মূল্য বৃদ্ধি পেলে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে মজুদ করে রাখা"।[৯]

ফাতওয়ায়ে রাহমানিয়ায় বর্ণিত হয়েছে, "মানুষ বা প্রাণির প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও জিনিসপত্র সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে ক্রয় করে এমনভাবে জমা করে রাখা যে, বিশেষ প্রয়োজনের মুহূর্তেও (অর্থাৎ যখন উক্ত মালের অভাবে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির কষ্ট হয়) আরো বেশি মুনাফার আশায় বিক্রয় না করাকেই ইহতিকার বা মজুদদারি বলা হয়"।[১০]

অর্থনীতির দৃষ্টিতে

Wikipedia তে অর্থনীতির ভাষায় মজুদদারির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,
Hoarding is the practice of buying up and holding resources so that they can be sold to customers for profit. "মজুদদারি হচ্ছে, পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে আটকে রাখার কারবার, যা পরে অধিক মুনাফায় ক্রেতার কাছে বিক্রি করা হবে"।

পুঁজিবাদী তন্ত্রের ভিত্তিতে মজুদদারির সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে,
If this is done so that the resource can be transferred to the customer or improved upon, then it is a standard business practice (eg buying up a bunch of wood to turn into a house); however, if the sole intent is to hold an otherwise unavailable resource it is considered hoarding. "যদি এ কারবার এমন হয় যে, এই পণ্য সামগ্রী ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করা হবে বা এ থেকে উৎকৃষ্ট কিছু উৎপন্ন করা হবে, তাহলে এটা একটি উত্তম ব্যবসায়িক কারবার যেমনঃ কাঠ ক্রয় করে ঘর তৈরী

---

[৭]. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, *রাদ্দুল মুহতার*, সাহারানপুরঃ মাকতাবায়ে যাকারিয়া, ১৯৯৬, খ. ৯, পৃ. ৫৭১

[৮]. বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী, *আল-হিদায়া*, দিল্লীঃ মাতবায়া মুজতাবাই, ১৯০৭, পৃ. ৪৫৪

[৯]. ইমাম গাযালী, (অনু. আব্দুল খালেক) *সৌভাগ্যের পরশমনি*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩, খ. ২, পৃ. ৭২

[১০]. মুফতী মাওলানা মানসূরুল হক, *ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া*, ঢাকাঃ মাকতাবাতুল আশরাফ, ১৪২৭ হি., খ. ২, পৃ. ১৬৭

করা; আর যদি ক্রয়ের উদ্দেশ্য হয় দুষ্প্রাপ্য পণ্য সামগ্রী আটকে রাখা, তাহলে তা মজুদদারি হিসেবে বিবেচিত হবে"।[১১]

মজুদদারির ধরন

মজুদদারি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। ক্রেতা ও বিক্রেতার উপর নির্ভর করে এর ধরনের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে কয়েকটি ধরন উপস্থাপিত হলো–

১. **আংশিক মজুদদারি:** অল্প সংখ্যক উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা কোন একটি নির্দিষ্ট পণ্য মজুদ করে রাখবে। আর তাদের এই মজুদের কারণে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির পাবে।

২. **পারস্পরিক মজুদদারি:** বিক্রেতা বা উৎপাদনকারী নির্দিষ্ট একটি পণ্য আটকে রাখবে। আর এই পণ্যের ক্রেতা থাকবে একজন। ক্রেতাও এই পণ্যের ক্রয় আটকে রাখবে। এখানে পণ্যের মূল্য এই ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে পারস্পরিক দরকষাকষির উপর নির্ভরশীল থাকবে।

৩. **পূর্ণাঙ্গ মজুদদারি:** কোন ব্যক্তি একটি পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয় আটকে রাখবে। আর এই পণ্যের বিকল্প দেশের ভিতরে বা বাইরে কোথাও পাওয়া যাবে না।

৪. **রাষ্ট্রীয় মজুদদারি:** কোন রাষ্ট্র কোন একটি পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করবে। পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি বা পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কখনো পণ্যের উৎপাদন কমিয়ে দিবে বা সরবরাহ যাতে ব্যাহত হয়, সে জন্য বিভিন্ন অপকৌশল গ্রহণ করবে।

আল-কুরআনে মজুদদারি প্রসঙ্গ

ইসলাম ব্যবসায়-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু খাদ্য সামগ্রী ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আটকে রেখে কৃত্রিম সংকট তৈরীর মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জনের মানসিকতাকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। দুনিয়া ও আখিরাতে মজুদদারির ভয়াবহ শাস্তির কথা কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। ইহতিকার সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "যারা সোনা রূপা (ধন-সম্পদ) জমা করে এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না তাদের জন্য আপনি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সংবাদ দিন। সে দিন এসব ধন-সম্পদ আগুনে গরম করা হবে। অতঃপর তা দিয়ে তাদের কপাল, পাঁজর আর পিঠে দাগ দেয়া হবে। (বলা হবে), তোমরা যা কিছু নিজেদের জন্য জমা

[১১]. Internet, *I:\Food Hoarding\Hoarding* (economics) - Wikipedia, the free encyclopedia.htm

করে রেখেছিলে এগুলো তো সেসব ধন-সম্পদ। সুতরাং তোমরা যা কিছু জমা করে রেখেছিলে, এখন তার স্বাদ আস্বাদন করো"।[১২]
অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন, "যাতে ধন-সম্পদ শুধু বিত্তবানদের মধ্যে পুঞ্জীভূত না হয়"।[১৩]

এ সকল আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখাকে অর্থনৈতিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কেননা এতে ধন-সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ ও বণ্টন হওয়ার পরিবর্তে শ্রেণী ও সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে আর সাধারণ মানুষ হয় নিঃস্ব ও দরিদ্র। লেনদেনেও স্থবিরতা দেখা দেয় এবং উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। অনুরূপভাবে পণ্য সামগ্রী আটকে রাখার ফলেও একই রকম সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সম্পদ পুঞ্জীভূতকারী এবং পণ্য মজুদকারী সমান অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল-কুরআনে কারুনের ঘটনা উল্লেখ করেন। কারুন ধন-সম্পদ জমা করে স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায় আচরণ করে এবং যমীনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। ফলে আল্লাহ্ তাআলা তাকে, তার ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পদসহ যমীনে ধ্বসিয়ে দিয়ে শাস্তি দেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "কারুন ছিল মূসা আ. এর সম্প্রদায়ভুক্ত। সে তার প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করল। আমি তাকে এত ধন-ভাণ্ডার দান করেছিলাম, যার চাবি বহন করা কয়েক জন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল, দম্ভ করো না নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিকদের ভালবাসেন না। আল্লাহ্ তোমাকে যা দান করেছেন, তা দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। সে বলল, আমি এই ধন-সম্পদ আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা অর্জন করেছি। সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং ধন-সম্পদে অধিক সমৃদ্ধ। পাপীদেরকে কি তাদের পাপ কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না"।[১৪]

---

[১২]. আল কুরআন, ৯: ৩৪-৩৫

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ { } يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

[১৩]. আল-কুরআন, ৫৯: ৭ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ

[১৪]. আল-কুরআন, ২৮: ৭৬-৭৮

কারুন ছিল অহংকারী। সে অঢেল ধন-সম্পদের মালিক ছিল। তার সম্প্রদায় তাকে এ থেকে দান করার জন্য উপদেশ দিয়েছিল কিন্তু সে দান করেনি। বরং আরো ঔদ্ধত প্রদর্শন করে বলেছিল, ধন-সম্পদ সে নিজ জ্ঞান-গরিমায় অর্জন করেছে। আল্লাহ সীমালংঘন ও অবাধ্যতার কারণে তাকে তার ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি ও বাড়ি-ঘরসহ ধ্বংস করে দেন।

আল-হাদীসে মজুদদারি প্রসঙ্গ

ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে অতি মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী মজুদ করে আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। রসূলুল্লাহ স. পণ্য মজুদ করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। তিনি বলেছেন, "যে লোক চল্লিশ দিন খাদ্য শস্য মজুদ করে রাখল, সে আল্লাহ থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে গেল এবং আল্লাহও নিঃসম্পর্ক হয়ে গেলেন তার থেকে"।[১৫]

অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য পণ্যদ্রব্য মজুদ করা থেকে বিরত থাকতে রসূলুল্লাহ স. নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে "অধিক মূল্যে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্য আটক করে রাখতে নবী স. নিষেধ করেছেন"।[১৬]
যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখে সে চরম অপরাধী। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ স. বলেন, "অপরাধী ব্যক্তি ছাড়া কেউ পণ্য মজুদ করে রাখে না"।[১৭]

এ অপরাধী কথাটি সহজ অর্থে নয়। যে পণ্য মজুদ করে সে অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে। কুরআন মাজীদে ফিরাউন, হামান প্রভৃতি বড় বড় কাফির আল্লাহ

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ { } وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ { } قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

[১৫]. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, আল-কাহেরাঃ দারুল হাদীস, ১৯৯৫, খ. ৪, পৃ. ৪৩৭, হাদীস নং ৪৮৮০ من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى و برئ الله تعالى من

[১৬]. মুয়াফ্‌ফিকুদ্দীন ও শামসুদ্দীন, *আল-মুগনী ওয়াশ শারহুল কাবীর আলা মাতানিল মুকনি ফি ফিকহিল ইমাম আহমদ*, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তাবি, খ. ৪, পৃ. ৩০৫ نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يحتكر الطعام

[১৭]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায়ঃ আল-মুসাকাত ওয়াল মুযারায়াত, অনুচ্ছেদঃ তাহরীমুল ইহতিকার ফিল-আকওয়াত, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদঃ দারুল সালাম, ২০০০, পৃ. ৯৫৭ لا يحتكر إلا خاطئ

দ্রোহীদের সম্পর্কে এ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন বলা হয়েছে, "নিশ্চয় ফিরাউন ও হামান এবং তাদের সৈন্য সামন্ত বড় অপরাধী ছিল"।[১৮] মজুদদারও খাদ্য সামগ্রী পুঞ্জীভূত রেখে আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দেয়ার কারণে এরাও কাফির ও আল্লাহ দ্রোহীদের ন্যায় জঘন্য অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে।

রসূলুল্লাহ স. আরো বলেছেন, "বাজারে পণ্য আমদানীকারক রিযিক প্রাপ্ত হয়। আর পণ্য মজুদকারী অভিশপ্ত হয়"।[১৯]

আল্লামা ইউসুফ কারযাভী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, "ব্যবসায়ী দুই ভাবে মুনাফা লাভ করে। একটি হচ্ছে, সে পণ্যদ্রব্য মজুদ করে অধিক মূল্যে বিক্রয় করার আশায় অর্থাৎ পণ্য আটক করে রাখলে বাজারে তার তীব্র অভাব দেখা দেবে তখন যতো চড়া মূল্যই দাবি করা হোক না কেন, তাই দিয়েই লোকেরা তা ক্রয় করতে বাধ্য হবে।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ব্যবসায়ী পণ্য বাজারে নিয়ে আসবে এবং অল্প অল্প মুনাফা নিয়েই তা বিক্রয় করে দেবে। পরে এই মূলধন দিয়ে সে আরো পণ্য নিয়ে আসবে এবং তাতেও সে মুনাফা পাবে। এভাবে তার ব্যবসায় চলতে থাকবে ও পণ্যদ্রব্য বেশি কাটতি ও বিক্রয় হওয়ার ফলে অল্প অল্প করে মুনাফা হতে থাকবে। মুনাফা লাভের এই নীতি ও পদ্ধতিই সমাজ সমষ্টির পক্ষে কল্যাণকর।'[২০]

মজুদদাররা হিংস্র মনোভাব পোষণকারী হয়ে থাকে। এরা সব সময় উচ্চ মূল্যের প্রত্যাশায় থাকে। এরা যদি কখনো শুনতে পায় যে, পণ্যমূল্য কমে গেছে, তাহলে বিষণ্ন হয়ে পড়ে। আর যদি শুনতে পায় মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে উল্লাসিত হয়। এ জন্য অন্য আরেক হাদীসে এসেছে, পণ্য মজুদকারী ব্যক্তির উপর সমস্ত সৃষ্টিকুলের অভিশম্পাত বর্ষিত হয়।

মজুদদারি বিষয়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের ভূমিকা

খোলাফায়ে রাশেদীনও মজুদদারির বিষয়ে কঠোর ছিলেন। খলিফা উমর রা. ব্যবসায়ীদের পণ্য মজুদকরণ সম্পর্কে ঘোষণা করেছিলেন, "আমাদের বাজারে কেউ যেন পণ্য মজুদ করে না রাখে। যাদের হাতে অতিরিক্ত অর্থ আছে তারা যেন বহিরাগত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সমস্ত খাদ্যশস্য কিনে তা মজুদ করে না রাখে। যে ব্যক্তি শীত-গ্রীষ্মের কষ্ট সহ্য করে আমাদের দেশে খাদ্যশস্য নিয়ে আসে সে

---

[১৮]. আল-কুরআন, ২৮:৮ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ

[১৯]. ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায়ঃ আত-তিজারাত, অনুচ্ছেদঃ আল-হুকরাতু ওয়াল জালব, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০, পৃ.২৬০৬ الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون

[২০]. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, অনু. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ৩৫৫

উমরের মেহমান। অতএব সে তার আমদানীর খাদ্যশস্য যে পরিমাণে ইচ্ছা বিক্রি করতে পারবে, আর যে পরিমাণে ইচ্ছা রেখে দিতে পারবে"।[২১]

উসমান রা. তাঁর খিলাফাত কালে পণ্য মজুদ নিষিদ্ধ করেছিলেন। আলী রা. মজুদদারির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর খিলাফাতকালে মজুদকৃত খাদ্যদ্রব্য আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। যেহেতু মজুদদারি জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী তাই ইসলামে তা নিষিদ্ধ। মজুদদারির কারণে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা অচল হয়ে পড়ে। কেননা এমন অনেক প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী রয়েছে যেগুলো পরিহার করে চলা যায় না। তাই ইসলাম নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রয় করার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। আর যে কোন ধরনের মজুদদারিকে জঘন্য ধরনের অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছে। রসূলুল্লাহ স. থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদীনসহ পরবর্তী সাহাবা কিরামগণ মজুদদারির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

মজুদদারির পরিণাম

যারা আল্লাহর সৃষ্টজীবকে কষ্ট দিয়ে অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষে দ্রব্য সামগ্রী মজুদ করে রাখে, তাদের জন্য আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। দুনিয়াতেও তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা কুরআন ও হাদীসে ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ কারুনের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ কারুনকে তার ধন-ভাণ্ডার ও গৃহ-আসবাবসহ যমীনে দাবিয়ে দিয়ে শাস্তি দিলেন। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "যে ব্যক্তি মুসলিম সম্প্রদায়ের খাদ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখবে আল্লাহ তাকে দুরারোগ্য ব্যাধি ও দারিদ্র্য দিয়ে শাস্তি দিবেন"।[২২]

মজুদদারির প্রভাব

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের অর্থব্যবস্থা চালু রয়েছে। অর্থব্যবস্থার ভিন্নতার প্রেক্ষিতে মজুদদারিতেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্র দ্রব্য সামগ্রী মজুদ করে রাখে। আবার পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি পণ্য মজুদ করে থাকে। তবে দুই অর্থব্যবস্থাতেই মজুদদারির পরিণতি ভয়াবহ। এ ছাড়াও আরো কিছু ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

---

[২১]. ইমাম মালিক, *আল-মুয়াত্তা*, আল-কাহেরা: দারু ইবনিল হায়সাম, ২০০৫, পৃ. ২৭৫, হাদীস নং ১৩২৯

لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونها علينا، ولكن أيما جالب على عمود كبده في الشتاء والصيف، فذالك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله

[২২]. ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬০৬

من احتكر علي المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس

১. ব্যক্তি ও রাষ্ট্রসমূহের মাঝে প্রতিযোগিতার মনোভাব নষ্ট হয়ে যায়। কেননা প্রতিযোগিতা না থাকলে ব্যবসায়-বাণিজ্যে গতি সঞ্চার হয় না এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পায় না। ফলে জাতীয় অর্থনীতি মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়।
২. অনেক সময় আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য কমে যাওয়ার আশংকায় আমদানীকৃত পণ্য সামগ্রী ধ্বংস করে দেয়া হয়। কেননা আমদানীকৃত পণ্যের অবাধ প্রবাহের ফলে দ্রব্যমূল্য কমে যায়। মুনাফা স্থিতিশীল রাখতে ব্যবসায়ীরা আগুনে পুড়িয়ে বা সমুদ্রে ফেলে পণ্য ধ্বংস করে। ফলে খাদ্যের মারাত্মক সংকট ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।
৩. মজুদদারি সমাজে লোভ, হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ার কারণ হয়। ফলে সামাজিক মূল্যবোধ হ্রাস পায়। মানুষের মাঝে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এক সময় সমাজের কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়।
৪. সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব বেড়ে যায়। ফলে আইন শৃংখলার মারাত্মক অবনতি ঘটে। আর অর্থনীতিতে চরম মন্দা ও অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করে।

মজুদদারি নিষিদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী

- আল্লামা ইউসুফ কারযাভী বলেন, মজুদদারি দু'টি শর্তে হারাম। যথা-
  ১. এমন এক স্থানে ও এমন সময় পণ্য মজুদ করা হবে যার কারণে জনগণের তীব্র অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে।
  ২. মজুদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে অধিক মূল্য হরণ। যার ফলে মুনাফার পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে।[২৩]
- আল-মুগনী ওয়াশ শারহুল কাবীর আলা মাতানিল মুকনি ফি ফিকহিল ইমাম আহমাদ গ্রন্থকারের মতে তিনটি শর্তে মজুদদারি হারাম। যথা-
  ১. পণ্য ক্রয়কৃত হতে হবে। যদি পণ্য আমদানীকৃত হয় বা নিজস্ব উৎপাদিত হয়, আর তা মজুদ করে রাখে তাহলে ইহতিকার হিসেবে গণ্য হবে না।
  ২. পণ্য একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য হতে হবে। সুতরাং মসলা, হালুয়া, মধু, যায়তুন, গবাদি পশুর শুকনো খাদ্য ইত্যাদি মজুদ করে রাখলে তা হারাম হবে না।
  ৩. পণ্য ক্রয়ে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগে নিপতিত হওয়া। এর আবার দু'টি পর্যায় রয়েছে:
     ক. ছোট শহর যেখানে পণ্য মজুদ করলে মানুষের কষ্ট হবে এবং মূল্য বেড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। এমতাবস্থায় ইহতিকার হারাম।

---

[২৩]. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, অনু. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

খ. পণ্য সামগ্রীর সংকট বা অভাবের সময় যদি কোন বণিকদল দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে শহরে প্রবেশ করে আর ধনী লোকেরা দ্রুত তাদের কাছ থেকে তা কিনে নেয়, ফলে মানুষের মাঝে পণ্যের সংকট দেখা দেয়, তাহলে ইহতিকার হারাম হবে। আর যদি খাদ্য সামগ্রী বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ থাকে এবং কম মূল্যে ক্রয় করা যায়। আর এতে মানুষের কষ্ট না হয় তাহলে ইহতিকার হারাম হবে না।[২৪]

- আল-হিদায়া গ্রন্থকারের মতে, পণ্য মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্য হতে হবে এবং মজুদদারির কারণে মানুষ ও জীব জন্তুর কষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থাকতে হবে। আর যদি কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে ইহতিকার করা নিষিদ্ধ নয়।[২৫]

মজুদদারির বিধান

মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ আলেমের মতে মজুদদারি সম্পূর্ণ হারাম। কিন্তু হানাফী আলিমগণের মতে মজুদদারি মাকরূহ।

রাদ্দুল মুহতার গ্রন্থকার বলেছেন, মানুষ ও পশুর খাদ্যদ্রব্য মজুদ করার কারণে যদি সেখানকার অধিবাসীদের কষ্ট বা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে মজুদ করা মাকরূহ। আর যদি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে মাকরূহ হবে না।[২৬]

ইমাম গাযালী র. এর মতে, মজুদদারি হারাম। তিনি এর কারণ উল্লেখ করে বলেন, এতে আল্লাহর বান্দাগণের কষ্ট ও অনিষ্ট সাধিত হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি সমস্ত শস্য ক্রয়পূর্বক আটক করে রাখলে অবশিষ্ট সকলেই এ থেকে বঞ্চিত থাকবে। এ উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য খরিদ ও মজুদ করে রাখা পাপ।[২৭]

ইহতিকার এর উদ্দেশ্য যদি হয় মাল আটক রেখে মূল্য প্রচুর বৃদ্ধি পেলে তা বিক্রি করা এবং অন্যান্য প্রাণির কষ্ট দুর্ভোগ বিবেচনা না করে সম্পদ আটক রাখা তবে তা শরীয়তে জায়েয নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের উৎপাদিত প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী জমা করে বা দূরবর্তী এলাকা যেখান থেকে সাধারণত সংশ্লিষ্ট এলাকায় খাদ্য সামগ্রী ও জরুরী জিনিসপত্র আসে না, সেখান থেকে ক্রয় করে এনে জমা করে রাখে বা নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও জিনিসপত্র ছাড়া অন্য জিনিসপত্র যা মৌলিক প্রয়োজনে পড়ে না এমন জিনিস জমা রাখে, তাহলে সে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে মজুদদার গণ্য হবে না।

তবে উল্লেখিত অবস্থায় যদি মানুষ কিংবা প্রাণির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে সম্পদ আটক না রেখে ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করা ইসলাম ও মনুষত্বের দাবি।[২৮]

---

[২৪]. মুয়াফ্ফিকুদ্দীন ও শামসুদ্দীন, *আল-মুগনী ওয়াশ শারহুল কাবীর আলা মাতানিল মুকনি ফি ফিকহিল ইমাম আহমদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

[২৫]. বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী, *আল-হিদায়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪

[২৬]. ইমাম ইব্‌নে আবেদীন শামী, *রদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭১

[২৭]. ইমাম গাযালী, অনু. আব্দুল খালেক, *সৌভাগ্যের পরশমনি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

[২৮]. আশ-শায়েখ নিজামুল হিন্দ আল-আলাম, *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, সাহারানপুরঃ মাকতাবায়ে যাকারিয়া, তা. বি, খ. ৩, পৃ. ২১৩-১৪

মজুদদারি নিষিদ্ধকরণে সরকারের কর্তৃত্ব

আলিমগণের সর্বসম্মত মত হলো, যদি সর্বসাধারণের উপর দুর্ভিক্ষের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে বা নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর ঘাটতি দেখা দেয় এবং সর্বসাধারণের মাঝে হাহাকার লেগে যায়, তখন সরকার ন্যায্য মূল্যে খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করতে মজুদদারদের বাধ্য করতে পারবে। বাজারের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে। অতি মুনাফার লোভে খাদ্য সামগ্রী আটক রেখে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির অপরাধে সরকার ব্যবসায়ীকে শাস্তিও প্রদান করতে পারবে।

ইমাম ইবনে আবেদীন র. তাঁর রাদ্দুল মুহতার গ্রন্থে বলেন, মজুদদারির কারণে দেশে খাদ্য শস্যের অভাবে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সরকার মজুদদার শ্রেণিকে তাদের প্রয়োজনীয় খোরাকী রেখে অবশিষ্ট সমস্ত সম্পদ ন্যায্য মূল্যে বাজারজাত করতে নির্দেশ প্রদান করবে। সরকারের নির্দেশ অগ্রাহ্য করলে সরকার শক্তি প্রয়োগ করে দেশের সকল হাট-বাজারে সুলভ মূল্যে তাদের গুদামজাত খাদ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করবে। এমনকি অভাবের কারণে জনগণ নগদ মূল্য পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তাদের সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত মেয়াদ ধার্য করে বাকীতে খাদ্য হস্তান্তর করবে। পরে তাদের হাতে খাদ্য শস্য আসলে সরকার তাদের নিকট থেকে তা উসূল করে দাতার নিকট পৌঁছি দিবে।[২৯]

প্রচলিত আইনে যা বলা হয়েছে

East Bengal Act এর আওতায় অত্যাবশকীয় কিছু পণ্যের সরবরাহ, বিতরণ এবং মজুদ নিয়ন্ত্রেণের জন্য ১৯৫৩ সালে The Essential Articles (Price Control and Anti-Hoarding) Act, ১৯৫৩ শিরোনামে এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের অধীনে অত্যাবশকীয় পণ্য বলতে The Control of Essential Commodities Act, ১৯৫৬ এর ধারা ২ এ উল্লেখিত পণ্যসমূহকে বুঝানো হয়েছে। ধারা ৮ অনুযায়ী কোন ব্যবসায়ী সরকার কর্তৃক দেয় পূর্ব কর্তৃত্ব ছাড়া কোন ব্যক্তির কাছে কোন অত্যাবশকীয় পণ্যের বিক্রি আটকে রাখতে পারবে না বা বিক্রি করতে অস্বীকার করতে পারবে না।[৩০]

The Essential Articles (Price Control and Anti-Hoarding) Act, ১৯৫৩ এর ধারা ৩ অনুযায়ী সরকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সময়ে সময়ে খুচরা, পাইকারি বা অন্য কোন ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রির ক্ষেত্রে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থাভেদে বিভিন্ন এলাকায় আলাদা আলাদা মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে। জনগণের সুবিধার্থে সরকার ব্যবসায়ীদেরকে পণ্যের নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদেশ

---

[২৯]. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭১

[৩০]. *The Essential Articles (Price Control and Anti-Hoarding) Act*, 1953

প্রদান করতে পারবে। ব্যবসায়ীগণ সুবিধাজনক জায়গায় বা নিজেদের দোকান ও গুদামের সামনে পণ্যের সর্বোচ্চ মূল্য তালিকা প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য থাকবে। নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয়ের তারিখ ও মেয়াদও সরকার নির্ধারণ করে দিতে পারবে।[৩১] যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করে তবে সে The Hoarding and Black Market Act, ১৯৪৮ এর ৩ নং ধারার অধীনে শাস্তি যোগ্য অপরাধী বিবেচিত হবে।

The Control of Essential Commodities Act, ১৯৫৬ অনুযায়ী সরকার বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের পণ্যকে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে অতি জরুরী বলে ঘোষণা করতে পারে এবং অন্য যে কোন পণ্যের উৎপাদন, বিপণন,সংরক্ষণ, ব্যবহার এবং ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ আইনের আওতায় কিছু পণ্যের বিপণনের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদান এবং মূল্য নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রির বিধান নিশ্চিত করা হয়েছে।[৩২] ধারা ৬ অনুযায়ী উক্ত আইন ভঙ্গকারীর জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি তিন বছর কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।

মজুদদারির মেয়াদ

কৃত্রিম সংকট তৈরী করে বেশি মুনাফা অর্জন করা বা দুর্ভিক্ষের অপেক্ষায় থেকে পণ্য চড়া মূল্যে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে পণ্য সামগ্রী মজুদ রাখা একেবারেই নিষিদ্ধ। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় অল্প দিনের জন্য মজুদ করা হলে তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। আর যদি বেশি দিন মজুদ করে রাখা হয় তাহলে তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। কোন কোন আলিমের মতে, সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে চল্লিশ দিন। কেননা রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "যে ব্যক্তি চল্লিশ রাত্র খাদ্য শস্য মজুদ করে রাখল, সে আল্লাহ থেকে সম্পর্কহীন হয়ে গেল এবং আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন"।[৩৩] আবার কেউ বলেছেন, এক মাস। কেননা এক মাসের নিচে হলে তা কম হিসেবে ধরা হয়। আর এক মাসের বেশি হলে তা সর্বোচ্চ হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু চল্লিশ দিনের অধিক রাখলে দুনিয়াতে তাকে শাস্তি দিতে হবে। মোটকথা শরীয়তের দৃষ্টিতে খাদ্য সামগ্রী ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আটক রাখা সমীচীন নয়।[৩৪]

কখন মজুদদারি বৈধ

মানুষ ও চতুষ্পদ জীব জন্তুর খাদ্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে কিনে মজুদ করে চড়া মূল্যের অপেক্ষায় বাজারজাত করা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পণ্য মজুদ করে রাখার অনুমতি আছে। যেমন:

---

৩১. *The Essential Articles (Price Control and Anti-Hoarding) Act,* 1953

৩২. *The Control of Essential Commoodities Act,* ১৯৫৬ এর ৩ নং ধারা।

৩৩. ইমাম আহমদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৭ من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى و برئ الله تعالى منه

৩৪. বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী, *আল-হিদায়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫

১. নিজের জমির উৎপাদিত ফসল মজুদ করে রাখা যাবে।[৩৫] অনুরূপভাবে পরিবারের বাৎসরিক ব্যয়ভার বহনের প্রয়োজনীয় পরিমাণ পণ্য মজুদ রাখা যাবে। কেননা উমর রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ স. বনী নযীরের খেজুর গাছ বিক্রি করে দিয়েছিলেন এবং তাদের এক বছরের খাদ্য সামগ্রী তার পরিবারের জন্য মজুদ করে রেখে দিয়েছিলেন"।[৩৬]
২. মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়া অন্য জিনিসপত্র যা মৌলিক প্রয়োজনে পড়ে না, তা মজুদ করা যাবে।
৩. নিজ শহর থেকে নয় বরং দূরবর্তী শহর- যেখান থেকে সাধারণত সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আসে না, সেখান থেকে আমদানী করে মজুদ করে রাখা যাবে।[৩৭]
৪. ভবিষ্যতের সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ এড়াতে অথবা অতিরিক্ত মৌসুমী উৎপাদন অন্য মৌসুমে সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে সরকার প্রয়োজনীয় পরিমাণ পণ্য সামগ্রী মজুদ করতে পারবে।

তবে যে কোন অবস্থায় যদি মানুষ বা পশুর প্রয়োজনে মজুদকৃত পণ্য বিক্রির প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে পণ্য সামগ্রী আটকে না রেখে প্রয়োজন ও মানবিক দিক বিবেচনা করে সুলভ মূল্যে বিক্রি করে দেয়া কর্তব্য।

ইসলামী আইনে বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ

বাজার ও দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক গতিতে চলুক এটাই ইসলামের দাবি। স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা বা মূল্য নির্ধারণ করার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার সরকারের নেই এবং প্রয়োজনও নেই। বাজারে পণ্য সামগ্রীর আমদানী ও তার চাহিদার আলোকে দ্রব্যমূল্যের উত্থান-পতন হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে সরকার দ্রব্যমূল্যে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।[৩৮] ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক চাহিদার ভিত্তিতেই পণ্য দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হবে।

রসূলুল্লাহ্ স. দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ থেকে বিরত থেকেছেন। তাঁর আমলে একবার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে লোকেরা এসে বলল, "হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য

---

৩৫. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২

৩৬. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায়: আন-নাফাকাত, অনুচ্ছেদ: হাবসুর রাজুলি কুতা সানাতিন আলা আহলিহি ওয়া কায়ফা নাফাকাতুল ইয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২
كان يبيع النخيل بني النضير و يحبس لأهله قوت سنتهم

৩৭. মুফতী মাওলানা মানসূরুল হক, *ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

৩৮. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩; বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী, আল-হিদায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫

দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন নবী স. বললেন, "প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণকারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। তিনিই মূল্য বৃদ্ধি করেন। তিনিই সস্তা করেন। রিযিকদাতা তিনিই। আমি তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে চাই এ অবস্থায় যে, কোন রূপ জুলুম, রক্তপাত বা ধন-মালের অপহরণ ইত্যাদির দিক দিয়ে আমার কাছে দাবিদার কেউ থাকবে না"।[৩৯]

সাহাবাদের দাবির প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ স. দ্রব্যমূল্য নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করেননি। কেননা দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের অধিকারী হচ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতা। দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করতে গেলে তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ হবে, যা কোন মতেই সমীচীন নয়। বরং তা আরো জুলুমের শামিল।

তবে ব্যবসায়ীরা যদি স্বেচ্ছাচারী হয়ে মাত্রাতিরিক্ত চড়া মূল্যে পণ্য বিক্রি করে ভোক্তাসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্ভোগ সৃষ্টি করে তাহলে জনগণকে মূল্য বৃদ্ধির শোষণ থেকে মুক্ত করতে এবং তাদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ করতে সরকার বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শক্রমে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিবে এবং ব্যবসায়ীদেরকে তা মানতে বাধ্য করবে।[৪০]
আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন, "গণঅসন্তোষ সত্ত্বেও অন্যায়ভাবে যদি কোন হালাল বস্তুর উচ্চ মূল্য চাপিয়ে দেয়া হয়, তবে তাও হবে হারাম। পক্ষান্তরে লোকদের মধ্যে সুবিচার ও ইনসাফ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে যদি মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয় এবং প্রচলিত দামে (Standard Price) বিক্রয় করতে ব্যবসায়ীদেরকে বাধ্য করা হয় কিংবা প্রচলিত বিনিময় মূল্যের অধিক গ্রহণ থেকে তাদের বিরত রাখা হয় তাহলে তা শুধু জায়েযই নয়, ওয়াজিবও।'[৪১]

বাংলাদেশে মজুদদারি ও মূল্যবৃদ্ধির চিত্র

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী সহজলভ্য ও ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা সরকারের দায়িত্ব এবং ভোক্তা শ্রেণীর অধিকার। কিন্তু আমাদের দেশের বাজার ব্যবস্থাপনা মুজদদার লুটেরাদের হাতে কুক্ষিগত। অতি মুনাফাখোর অসাধু একদল ব্যবসায়ীর যাতাকলে আজ সাধারণ মানুষ নিষ্পেষিত। অসাধু ব্যবসায়ী শ্রেণি সিন্ডিকেট করে

---

[৩৯]. ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, অধ্যায়: আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ: মা জাআ ফিত তাসয়ীর, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ: দারুল সালাম, ২০০০, পৃ. ১৭৮৩-৮৪
إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق و اني لأرجو ان ألقي ربي و ليس احد منكم يطالبني بمظلمة في دم و لا مال

[৪০]. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, *রদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩; বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী, আল-হিদায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬

[৪১]. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, অনু. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩-৫৪

পণ্য গুদামজাত করে রাখে এবং কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে পণ্যের মূল্য নিজেদের ইচ্ছামত নির্ধারণ করে। পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও বাজার তদারকির জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের ভূমিকা ভোক্তা সাধারণ যথেষ্ট মনে করেন না। কখনো অতি মুনাফাখোর ব্যবসায়ী শ্রেণির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কতিপয় অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারীর যোগসাজশ থাকার কথাও গণমাধ্যমে প্রকাশ হতে দেখা যায়। কর্তৃপক্ষের এই দুর্বলতার সুযোগে অসাধু ব্যবসায়ীরা নানা অজুহাতে দফায় দফায় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে। ফলে বাজার অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। আর ক্রেতা সাধারণ আকাশ ছোঁয়া দ্রব্যমূল্যের কারণে হয়ে পড়ে দিশেহারা। বিশেষত রমযান ও ধর্মীয় উৎসবগুলোতে বাজার ব্যবস্থাপনায় শোচনীয় অবস্থা বিরাজ করে। তখন কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্য মজুদ করে রাখে। এতে অস্বাভাবিকভাবে পণ্যের মূল্য হু হু করে বাড়তে থাকে। ভোক্তা শ্রেণি প্রয়োজনের তাগিদে চড়ামূল্যে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করতে বাধ্য হয়। ফলে এ সুযোগে অতি মুনাফাখোর একদল অসাধু ব্যবসায়ী সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। আর সাধারণ মানুষ চড়া মূল্যে পণ্য ক্রয় করে নিঃস্ব থেকে আরো নিঃস্বতর হয়। এ সমস্যা নিয়ে প্রিন্ট মিডিয়ায় অনেক লেখালেখি হয় এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বহু সচিত্র প্রতিবেদন ও প্রচার হয়। বিভিন্ন সময়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে এ সমস্যা নিরসনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং সুপারিশমালা গ্রহণ করা হয়। তখন সরকারি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মজুদদারি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণের নানা কথা বলে থাকেন এবং ব্যবসায়ীরা বহু প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে এ সমস্যার প্রতিকার সামান্যই পরিলক্ষিত হয়।

মজুদদারি প্রতিরোধে কতিপয় সুপারিশ

মজুদারির ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যে অস্থিতিশীল ও অরাজকতাপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা অর্থব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়। আর সামাজিক কর্মকাণ্ডে যে নৈরাজ্যকর ও বিশৃংখল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তা সমাজ ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করে ফেলে। ইসলাম এ ক্ষেত্রে শাশ্বত ও যুগোপযোগী বিধান দিয়েছে। মজুদদারিকে নিষিদ্ধ করেছে এবং এ অবস্থা নিরসনে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ ছাড়াও এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য আরো কিছু পদক্ষেপ রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন:

১. সরকার মজুদদারির কুপ্রভাব সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরবে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী বিধি-নিষেধগুলো প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মজুদদারদেরকে শরয়ী নির্দেশনা পালনে পদক্ষেপ নিবে এবং ভোক্তাদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট থাকবে।

২. দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে সরকার মজুদদারদেরকে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে মজুদকৃত পণ্য সুলভ মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য করবে। মজুদদার শ্রেণি যদি তা অস্বীকার করে, তাহলে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে এবং তাদের স্বার্থ ন্যায়সঙ্গতভাবে রক্ষার উদ্দেশ্যে সরকার মজুদকৃত পণ্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে তা ন্যায্য মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩. সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় সে সকল পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যা মজুদদারির কারণে দুষ্প্রাপ্য এবং দেশের অভ্যন্তরে সব পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালাবে।
৪. সরকার অন্যান্য দেশের সাথে পণ্য বিনিময় করবে বা তাদেরকে ব্যবসায়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। বিশেষত দুষ্প্রাপ্য পণ্য সামগ্রী বাণিজ্যিকীকরণে তাদের উৎসাহিত করবে এবং পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে।
৫. যদি মজুদদারির কারণে পণ্য সামগ্রীর মূল্য বেড়ে যায় এবং বাজার অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে, তাহলে সরকার ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শক্রমে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিবে। আর মজুদদার শ্রেণিকে পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য করবে। কিন্তু বাজার যখন স্থিতিশীল হয়ে যাবে তখন ক্রেতা-বিক্রেতাকে স্বাধীনতা দেয়া হবে, যাতে তাদের চাহিদার আলোকে পণ্য মূল্য নির্ধারিত হয়।
৬. সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি মনিটরিং সেল গঠন করবে। মনিটরিং সেলের অধীনে নিজস্ব জনবল দিয়ে প্রতিনিয়ত বাজার পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যদি পরিদর্শকদলের নিকট কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় তাহলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৭. খাদ্য নিজস্ব উদ্যোগে আমদানীর জন্য সরকার একটি বোর্ড গঠন করতে পারে। এ বোর্ডের মাধ্যমে পণ্য আমদানী করবে বা যারা পণ্য আমদানী করবে এ বোর্ড তাদের মনিটরিং করবে। এতে আমদানীকারকরা বেশি মূল্যে পণ্য বিক্রির সুযোগ নিতে পারবে না।

এ সকল পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্যকর ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে একটি সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করবে এবং ক্রেতা-বিক্রেতার অধিকার সুনিশ্চিত হবে।

উপসংহার

ইসলাম মানব জাতির কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম যুগোপযোগী বিধান দিয়েছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের মত অতীব গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডেও কল্যাণকর নীতি-আদর্শ উপহার দিয়েছে। এ নীতির অন্যতম দিক হলো- মজুদদারি, মুনাফাখোরী, কালোবাজারী ও যে কোন প্রতারণামূলক ব্যবসায়-বাণিজ্যের নিষিদ্ধকরণ। ইসলাম অতি মুনাফার লোভে প্রতারণা করে ও অপকৌশল অবলম্বন করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আটক রাখাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। আধুনিক কালেও যেখানে পৃথিবীর নানা স্থানে মজুদদারির প্রভাবে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্ব গতিতে জনসাধারণ বিপর্যস্ত, সেখানে ইসলাম বহুকাল পূর্বেই এর আইনগত বিধান বর্ণনা করে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের অধিকার নিশ্চিত করেছে। পরিশেষে আমরা বলতে পারি, ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় যদি ব্যবসায়-বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হয় তাহলে শুধু মজুদদারির অপতৎপরতাই নয় ব্যবসায়-বাণিজ্যে কোন ধরনের নৈরাজ্য থাকবে না।

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার নিয়মাবলি

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দুই কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় কিবোর্ড ব্যবহার করে (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2000) টাইপ / ফন্ট Sutonny MJ ব্যবহার করতে হবে। কাগজের সাইজ A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে : উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১.৬৫ ইঞ্চি, বামে ১.৬ ইঞ্চি। প্রবন্ধের সফ্ট কপি সংস্থার ই-মেইল ঠিকানায় পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে লেখকের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর থাকতে হবে।

২. প্রত্যেক প্রবন্ধের সাথে লেখককে/দের এ মর্মে একটি প্রত্যায়নপত্র জমা দিতে হবে-

ক. জমাদানকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/ তাঁরা;

খ. প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো জার্নালে মুদ্রিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য তা অন্য কোনো জার্নালে জমা দেয়া হয়নি। উল্লেখ্য যে, প্রত্যায়নপত্র ছাড়া কোনো প্রবন্ধ গৃহীত হবে না।

গ. প্রবন্ধে প্রকাশিত তথ্য ও তত্ত্বের সকল দায়-দায়িত্ব লেখক/গবেষক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক/গবেষক জার্নালের ২ (দুই) টি কপি এবং ৫ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. প্রবন্ধ বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণে (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান) রচিত হবে। তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

৫. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না। লেখক কোন বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। তথ্যনির্দেশের ক্ষেত্রে শব্দের উপর সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন[১]) সংখ্যা ব্যবহার করাই নিয়ম। তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থ ও জার্নাল থেকে তথ্যসূত্র নিম্নোক্ত ভাবে লিখতে হবে।

যেমন– গ্রন্থ :

ক. কাজী এবাদুল হক, *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ.২৯

খ. ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ইসমু মানিইয যাকাত, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১১০

গ. যিকরা তাহা হুসাইন, *জামহুরিয়াতু মিসর আল-আরাবিয়্যাহ,* ওযারাতুস সাকাফা, আল-কাহেরা : আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯৭৭, পৃ. ১০৩

প্রবন্ধ ঃ

* Dr. Taslima Monsoor, *Dissolution of Marriages on Test A Study of Islamic Family Law and Women, Journal of the Faculty of Law,* University of Dhaka, Volume:15, Number:1, June 2004, p. 26

৬. মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি ৩০ শব্দের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। *গ্রন্থ ও পত্রিকার নাম বাঁকা অক্ষরে (Italic) হবে* যেমন, গ্রন্থ ঃ *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন;* পত্রিকা : *Journal of Islamic law and judiciary.*

৭. আল-কুরআনুল করীম ও হাদীসসমূহের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত অনুবাদ অনুসরণ করে চলতি রীতিতে রূপান্তর করতে হবে, তবে রেফারেন্সদানের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের (আরবি, উর্দু, বাংলা, ইংরেজি যে ভাষায় হোক তা অপরিবর্তিত রেখে) টেক্সট দিতে হবে। Secondary source এর উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য নয়। আল-কুরআনুল করীম ও হাদীসের উদ্ধৃতিতে অবশ্যই হরকত দিতে হবে। **কুরআনের উদ্ধৃতি হবে এভাবে–** আল-কুরআন, ২:১৫। **হাদীসের উদ্ধৃতি হবে এভাবে–** ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায় (ابواب/كتاب): , অনুচ্ছেদ (باب):........, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান:---, প্রকাশকাল---, খ.--, পৃ.--। ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ দিতে হবে।

৮. প্রকাশিত প্রবন্ধের ব্যাপারে কারো ভিন্ন মত থাকলে যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

৯. প্রবন্ধের শুরুতে 'সারসংক্ষেপ' এবং শেষে 'উপসংহার' অবশ্যই দিতে হবে।

১০. কুরআন ও হাদীসের আরবী Text প্রতি পৃষ্ঠার নিচে ফুটনোটে এবং অনুবাদ মূল লেখার সাথে দিতে হবে।

প্রবন্ধ প্রেরণের ঠিকানা
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন :০২-৭১৬০৫২৭, ০১৭১২-০৬১৬২১, ০১৭১৭-২২০৪৯৮
ই-মেইল: islamiclaw_bd@yahoo.com. www.ilrcbd.org

REG : NO : DA-6100, ISLAMI AIN O BICHAR : JULY-SEPTEMBER : 2012

Design : An-Nasr